মহীয়সী শ্যামমোহিনী

সুষমা মৈত্র

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদ

২০/২এ, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড

কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

বিশিষ্ট জনকল্যাণব্রতী
শ্রীশক্তিকুমার সরকারকে
আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ
এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম।

—সুষমা মৈত্র

ভূমিকা

শ্রীমতী সুষমা মৈত্র "মহীয়সী শ্যামমোহিনী" জীবনী হিসাবে প্রকাশ করেছেন কিন্তু বইটি পড়লে এই ধারণাই হয় যে আকারে জীবনী হলেও বাঙালী সমাজের এক বিশেষ যুগের ইতিবৃত্ত, বাঙালী মেয়েদের বিগত যুগ থেকে বর্তমান যুগে উত্তরণের ইতিহাস, আধুনিক বাংলার গোড়ার কথা, নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের মত এক বহুমুখী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের পত্তন, সংগঠন এবং প্রসারের বিচিত্র বর্ণনা। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবীর জীবনকথা এক বিশেষ তাৎপর্য্য নিয়ে ফুটে উঠতে পেরেছে।

সাধারণের কাছে শ্যামমোহিনী দেবী একজন বিশিষ্ট সমাজসেবিকা বিদ্যোৎসাহী মহিলারূপে পরিচিতা। এক বৃহৎ নারী কল্যাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাত্রী এবং পরিচালিকা রূপে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেব কথা সাধারণ মানুষের কমই জানা আছে। তাঁর এই কর্মময় জীবনের প্রস্তুতি কিসের মধ্যে দিয়ে হয়েছে, কোন্ পরিবেশে তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন কেটেছে, কিসের প্রেরণায় তিনি কর্মময় জীবন গ্রহণ করেছেন, কিসের শক্তিতে তিনি আজ সাতাশী বছর বয়সেও পূর্ণোদ্যমে কাজ করে চলেছেন, সে কাহিনী অনেকেরই জানা নেই। "মহীয়সী শ্যামমোহিনী" লেখিকা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোকপাত করে জনসাধারণের বিশেষ করে বাংলার নারীসমাজের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

শ্যামমোহিনী দেবীর জীবনও অনবদ্য। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে উত্তর বাংলার পল্লী পরিবেশে জন্ম এবং সেখানেই লালিত-পালিত। একদিকে প্রতিকূল সমাজব্যবস্থা, অন্যদিকে পরিবারে বিদ্যোৎসাহিনী মা, দানশীল পিতা। মাত্র বারো বছর বয়সে বিবাহ, কিন্তু বিদ্যানুরাগী, স্ত্রীশিক্ষায় আস্থাশীল স্নেহ-পরায়ণ স্বামী ও শ্বশুরালয়। বিবাহের চার বছর পর ষোলো বছর বয়সেই বৈধব্যবরণ। এ সবই ক্রমে ক্রমে শ্যামমোহিনী দেবীকে শিক্ষার প্রতি তীব্র অনুরাগে এবং ব্যথিত বঞ্চিতের প্রতি সুগভীর সমবেদনা আর সহানুভূতিতে ভরিয়ে তোলে।

তখনকার দিনে অবগুণ্ঠনবতী বাঙালী মেয়ের পক্ষে অকাল বৈধব্য নিদারুণ দুর্দৈব বলে গণ্য হোতো, কিন্তু অশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী শ্যামমোহিনী দেবী এ ঝঞ্ঝাঘাতে ভেঙ্গে পড়েন নি। স্বামীর কাছে অতি অল্পকালের মধ্যে যে প্রেরণা উৎসাহ স্নেহ ও বিশ্বাস লাভ করেছিলেন তাই সম্বল করে তিনি

বিরাট কর্ম মহীরুহস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। বছরের পর বছর ধরে কত অসহায় নারী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিতা বয়স্কা কন্যা, শিশু বালিকা সেই মহীরুহের ছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছেন, আলোর সন্ধান পেয়ে জীবনপথে চলতে পারছেন তার সংখ্যা নিরূপণ করা সহজ নয়। বাংলার নারী মুক্তির আন্দোলনে শ্যামমোহিনী দেবী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের নাম তাই স্বীয় মহিমায় উজ্জ্বল।

স্বল্প কথায়, অনাড়ম্বর ভাষায় বিভিন্ন শিরোনামায় ভাগ করা অধ্যায় এবং অনুচ্ছেদে লেখিকা এই জীবনের এক একটি বক্তব্য রেখেছেন, যেন একটি পূর্ণাবয়ব চিত্রের বিভিন্ন অঙ্গসজ্জা। বর্ণিত জীবনের প্রতি লেখিকার সুগভীর শ্রদ্ধা এবং বিষয়বস্তুটির প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠাই এমন একটি অকপট পরিচ্ছন্ন পরিবেশনা সম্ভব করেছে।

শুধুমাত্র জনদরদী সমাজকর্মী নয়, যে কোনো বাঙালী পাঠকের অগাধ বিস্ময় উদ্রেক করবে এই জীবনী একথা নিসংশয়ে বলা যেতে পারে। বাংলার মেয়েদের কাছে শ্যামমোহিনী দেবীর আত্মবিশ্বাস, অক্লান্ত কর্মোদ্যম এবং সৃজনশীল সংগঠন শক্তি বিশেষ প্রেরণা যোগাবে। লেখিকার শুভ প্রচেষ্টা যথার্থ সমাজ-কল্যাণকর হোক এই কামনা।

আমার কথা

এ বৎসর 'আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ' উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ঠিক এই সময়ে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার বিশেষ একটি তাৎপর্য রয়েছে বলে আমি মনে করি। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু মহীয়সী মহিলার কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু এমন অনেক মহিলা আছেন যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে নিতান্তই সাধারণ। সেই সাধারণ মহিলারাই আবার এমন অসাধারণত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন যার কোন ইতিহাস লেখা হয়নি। আমি এই গ্রন্থে তেমনিই এক সাধারণ মহিলার কথা লিখেছি যিনি আত্মত্যাগে, সেবায়, আদর্শে, চরিত্রের দৃঢ়তায়, সংগঠন শক্তির অপূর্ব দক্ষতা গুণে পৃথিবীর যে কোন মহীয়সী মহিলার সাথে তুলনীয়।

সাতাশীবর্ষীয়া এই মহীয়সী মহিলাটি জীবনসায়াহ্নে পৌঁছেও এখনও দেশব্যাপী শিক্ষা প্রসারে নিজকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত রেখেছেন। এখনও এঁর কর্ম প্রয়াস, কর্মনিষ্ঠা এবং অসাধারণ সংগঠনদক্ষতা বিন্দুমাত্র হ্রাস হয়েছে বলে মনে হয় না।

আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি এ রকম একটি অনুপম চরিত্রের কাছাকাছি আসতে পেরেছি এবং পরম স্নেহে তিনি দিনের পর দিন ক্রমাগত দুটি বৎসর (১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫) আমারই কাছে তাঁর মহামূল্য জীবনের অনেক ঘটনাসম্পদ স্মৃতির আধার থেকে বিবৃত করেছেন। রূপকথার মত তা অপরূপ রসমাধুর্যে ভরা। বৈচিত্র্যে ভরা তাঁর সে জীবনকথা সমসাময়িক ঘটনা আমাকে রীতিমত বিস্ময়বিমূঢ় করেছে। নারীজীবনের অন্ধকারময় যুগ থেকে আজকের গৌরবোজ্জ্বল নারীপ্রগতির যুগেও দেশের নারীশিক্ষা বিস্তারের নিরবচ্ছিন্ন ধারাটি তিনি যে সাধনায় মনের মণিকোঠায় আজও সযত্নে লালন করে নিজের মধ্যে সংগুপ্ত করে নিয়ে বাস্তবে রূপদান করে চলেছেন তাঁর সে দীর্ঘ জীবনসাধনাই আমাকে এ দুঃসাহসী কাজে হাত দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বস্তুত মানুষ বিরাটের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়। অন্তহীন আকাশ, সীমাহীন সমুদ্র আর সুউচ্চ পর্বত যেমন আমাদের মনে অপার বিস্ময় উদ্রেক করে—তাদের অসীমত্বের কাছে আপনা থেকে আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়—আমার কাছে তেমনি একটি মহান্ ও উদার চরিত্র এই মহীয়সী শ্যামমোহিনী। আমি জানি না, আমার এই অক্ষম লেখনী এমন অপূর্ব একটি

ত্যাগমাহাত্ম্যে অত্যুজ্জ্বল সুমহান্ চরিত্রকে যথাযথ ভাবে এই গ্রন্থ দর্পণে প্রতিফলিত করতে পারল কি না। তবে আগামী দিনের মানুষের কাছে এই অসাধারণ চরিত্রটি পৌঁছে দেওয়ার অদম্য অভিলাষে এই কাজে আমি ব্রতী হয়েছি। এর দ্বারা যদি কোন পাঠক সত্যি সত্যি অনুপ্রাণিত হন তবেই আমার এই শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

এটি শ্যামমোহিনীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলা চলে না, কারণ দীর্ঘ জীবনে কত বিপুল কাজ করেছেন তিনি, যার সবকিছু তাঁর পক্ষে এখন বলা সম্ভব নয়—তিনি কোন কিছুই লিখে রাখেন নি। তাই তথ্যের কোন হেরফের হলে অনিচ্ছাকৃত সে ত্রুটির জন্য আমি দুঃখিত।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁর কাছ থেকে সব চাইতে বেশী সমর্থন, সহযোগিতা ও সহায়তা পেয়েছি তিনি হলেন প্রবীণ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শরৎ সাহিত্যের সুখ্যাত সমালোচক, 'প্রভাত' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক এবং 'শরৎ-সাহিত্যে নারী', 'মানুষ শরৎচন্দ্র', 'দেশপ্রাণ শাসমল', 'মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক শ্রীপ্রমথনাথ পাল। তিনি আমার এই গ্রন্থ প্রকাশেও নানাদিক থেকে সাহায্য করেছেন। এই গ্রন্থের নামটি তাঁরই দেওয়া। আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এছাড়া নিখিল ভারত নারীশিক্ষা পরিষদের তরফ থেকে পরিষদের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া শুনে এর বাস্তব দিকগুলির সত্যাসত্য নিরূপণ করে দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন, তাঁর প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক ও কবি দক্ষিণারঞ্জন বসু আমার এ গ্রন্থে একটি 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' কবিতা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। এককালে তাঁরই অনুপ্রেরণায় যুগান্তরের 'এ এক মহলে' বহু বিদেশী ও দেশী মহিলার জীবনী লিখি। ১৯৬৬ সালে 'একটি মহীয়সী মহিলা ও একটি মহতী প্রতিষ্ঠান' লিখতে গিয়ে পূতচরিত্র শ্যামমোহিনীর সান্নিধ্যে এসে ধন্য হই। মূলতঃ একটি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসই যে একটি মানুষের ইতিহাস—সেদিন জানতে পারি। তারপর এই জানা পরিপূর্ণ রূপ পায়—স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বর্ষ পালন উপলক্ষে দৈনিক বসুমতীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরাঙ্গনা নারীর জীবনী লিখতে গিয়ে। একাজে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন প্রখ্যাত

সাংবাদিক শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্ধুসম শ্রীমতী দীপালী ধর (বৌ-ঠাকুরাণী)। এঁদের প্রেরণায় দৈনিক বসুমতীতে (১৯৭৩) বীরাঙ্গনা মহিলাদের অবদানের কথা লিখতে গিয়ে আবার আমি এই মহীয়সীর সান্নিধ্যে আসি এবং তাঁর দেশের শিক্ষাবিস্তারে কর্মবহুল জীবন আলেখ্যের রূপরেখাটি তুলে ধরার প্রয়াস পাই। এজন্যে এঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। বান্ধবী সুতপা চক্রবর্তী, সাংবাদিক রমেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও ভ্রাতৃসম দেবাশীষ মিত্রকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এঁরা এই বই লিখতে উৎসাহিত করেছেন।

আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই লেডী অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষা সমিতির কর্তৃপক্ষকে। তাঁরা আমাকে তৎকালীন নারীশিক্ষা ও নারীর উপর অত্যাচারের পরিসংখ্যান দিয়ে প্রভূত উপকার করেছেন।

বিশেষ করে মনে পড়ছে বেথুন কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ৺মৃণালিনী এমার্সনের সহৃদয়তার কথা। তিনি আমাকে পরম স্নেহে বেথুন কলেজের 'শতবার্ষিকী সংখ্যা' দান করে একাজে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা দিয়ে গেছেন। আজ তিনি নেই—সেই মাতৃসম সুমহান্ চরিত্রের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা রইল।

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মী শ্রীমতী কুসুম বসু, শ্রীমতী সুষমা চক্রবর্তী, শ্রীমতী মল্লিকা ভাওয়ালকে। এঁরা আমাকে প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র, ফোটো প্রভৃতি সরবরাহ করে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

সর্বোপরি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে যাঁর নাম স্মরণ করতে হয় তিনি স্বনামধন্যা সমাজ-সেবিকা ও ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনদরদী ডঃ ফুলরেণু গুহ। তিনি তাঁর মহামূল্যবান সময় নষ্ট করে আমার এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বহুদিন থেকে এই নামটি আমার কাছে পরম শ্রদ্ধার।

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত ছবি ও ব্লক দিয়ে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদিগকেও ধন্যবাদ জানাই। এঁদের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ ডঃ রাধাবিনোদ পালের দুর্লভ একখানি ফোটো দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁরই জামাতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজ্ঞ শ্রীদেবী পাল। দেশবন্ধুদৌহিত্রী শ্রীমতী স্বরূপা দাশ তাঁর মাতা সুজাতাদেবীর ফোটো দিয়ে উপকৃত করেছেন। শ্রদ্ধা

জানাই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্রকে তিনিও তাঁর ফোটো দিয়ে সাহায্য করেছেন।

একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সুন্দর হস্তাক্ষরে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি করে দিয়েছে আমার পরম স্নেহাস্পদা কুমারী দীপিকা মৈত্র। তার প্রতি রইল আমার আন্তরিক ভালোবাসা।

১৫/১ডি, রাজা মণীন্দ্র রোড
কলিকাতা-৩৭

সুষমা মৈত্র

সূচীপত্র

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ

অন্য স্বাদ : অন্য রঙ (কবিতা সঞ্চয়ন) তিন টাকা

একে একে এক (গল্প সঞ্চয়ন) পাঁচ টাকা

আমাদের মা (যন্ত্রস্থ)

বাঙলার বীরাঙ্গনা (যন্ত্রস্থ)

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে প্রকাশিতব্য

মার্কিন বিদুষী নারী (যন্ত্রস্থ)

"কোন মহতী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে চাই মনপ্রাণ ঢেলে তা গড়ে তোলার আপ্রাণ প্রয়াস। চাই অসীম ধৈর্য, ঐকান্তিক ইচ্ছা আর নিরলস শ্রম। তবেই হবে তার সার্থক রূপায়ণ। টাকাটাই বড় কথা নয়।"

শ্যামমোহিনী দেবী

মহীয়সী শ্যামমোহিনী

মহীয়সী শ্যামমোহিনী

মহীয়সী শ্যামমোহিনী

প্রথম অধ্যায়

জন্মস্থান

নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা, মহীয়সী শ্যামমোহিনী দেবী ১৮৮৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার সহবৎপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সহবৎপুর ছিল একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। সেখানে অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-জেলে-কুম্ভকার-আদিবাসী-তপশালী-মাটিয়াল-কামার প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একত্র মিলেমিশে বাস করত। গ্রামে একটি মাত্র পাঠশালা ও একটি এম. ই. স্কুল ছিল। গ্রামটি যে বর্দ্ধিষ্ণু ছিল তার প্রমাণ এই দুইটি স্কুল। কারণ সে-যুগে স্বল্পসংখ্যক স্কুলকলেজ যা ছিল সে-সব সহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামাঞ্চলে স্কুল ছিল না বললে অত্যুক্তি হয় না। পাঁচ-ছয়-আট-দশ মাইল দূরে-দূরে একটি মাত্র পাঠশালা বা এম. ই. স্কুল অবস্থিত ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্র এসে সেখানে পড়াশুনা করত। সেইদিক থেকে সহবৎপুর গ্রামটি উন্নত ছিল। প্রত্যেকেরই জমিজমা থাকায় কারো অন্নাভাব ছিল না।

শ্যামমোহিনীর মাতামহ নন্দকুমার বক্সী ময়মনসিংহ জেলায় শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন। ওকালতি করে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। সেকালে আজকালের মত টাকাকড়ি নিরাপদে রাখার কোনো ব্যাঙ্ক ও সেভিং ডিপোজিট স্কীম বা ঐ জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকায় তিনি প্রচুর সোনা কিনে সোনার বাট তৈরী করে বাড়ীতে

আনতেন। পরে এ থেকে অনেক জমিজায়গা খরিদ করেন এবং জমিদার নামে খ্যাত হন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে নন্দকুমার একটিমাত্র কন্যা ও একটিমাত্র পুত্র রেখে যান। কন্যাটি তখন সবে শিশু। জ্ঞানোন্মেষ হবার পূর্বেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতার কথা কন্যাটির মনেই ছিল না। কন্যাটির নাম গোবিন্দময়ী। গোবিন্দময়ী ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র প্রসন্নকুমার বক্সী গোবিন্দময়ীর চাইতে বয়সে সামান্য বড়। নন্দ-কুমারের মৃত্যুকালে তিনিও ছোট ছিলেন। বড় হয়ে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন। গ্রামের জমিদারী ছাড়াও অন্যত্র তাঁর বহু ভূ-সম্পত্তি ছিল। এই সম্পত্তির আয় থেকে তিনি গৃহদেবতা গোপালের পূজা ছাড়াও দোল-দুর্গোৎসব, বাসন্তীপূজা, চড়কপূজা প্রভৃতি মহাসমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। গ্রামের অধিবাসীরা জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করতেন। বার মাসে তের পার্বন-উৎসবে বাড়ীটি মুখর হয়ে থাকত।

গোবিন্দময়ীর মাতা মুক্তাসুন্দরী তাঁর প্রথম সন্তান প্রসন্নকুমারের জন্মের পর সূতিকা রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর কিঞ্চিৎ মাথার গোলমাল হয়। তিনি অনবরত বিড়বিড় করে কি সব বকতেন। ফলে তাঁর মাতা দুর্গাসুন্দরী জামাতার মৃত্যুর পর শক্তহাতে মেয়ের সংসারের হাল ধরেন। তিনি খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। বিষয়-সম্পত্তি পরিচালনা থেকে নাতি-নাতনীর তত্ত্বাবধান পর্যন্ত যাবতীয় ভার নিজ হাতে তুলে নেন। তৎকালে শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তিনি সমাজের সব ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে নাতনীকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করেন। অল্পবয়সেই গোবিন্দময়ী পড়াশুনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু তিনি বেশীদিন স্কুলে পড়াশুনার সুযোগ পান নি। প্রচলিত নিয়মানুসারে মাত্র দশ বৎসর

বয়সে তাঁর বিবাহ হয় পাবনা জেলার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের ছেলে যাদবচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে। যাদবচন্দ্র তখন রাজসাহী জেলায় ওকালতি করতেন। এই যাদবচন্দ্রের ঔরসে গোবিন্দময়ীর গর্ভে মাতৃজাতির মুক্তিযোদ্ধা মাতৃজাতির সেবায় চির-উৎসর্গীকৃতা বরেণ্য মহীয়সী শ্যামমোহিনীর জন্ম হয়।

শ্যামমোহিনীর পিতা যাদবচন্দ্র ও তাঁর পূর্বপুরুষগণ বিভিন্ন সদ্‌গুণের অধিকারী হয়ে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে শ্যামমোহিনীর মধ্যে এই সমস্ত গুণের একত্র সমন্বয় দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি প্রাণোদ্দীপক উক্তি মনে পড়ে—"জন্মেছিস্ তো দাগ রেখে যা।" শ্যামমোহিনীর জীবনে এই উক্তি যে বিশেষভাবে রূপায়িত হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা সেই আলোচনাই করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পিতৃপরিচয়

শ্যামমোহিনীর পূর্বপুরুষ পুরুষানুক্রমিক জমিদার ও জোতদার ছিলেন। পিতামহ স্বনামধন্য গুরুপ্রসাদ চৌধুরী ইংরেজ সরকারের অধীনে পুলিশের পদস্থ কর্মচারী (দারোগা) ছিলেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। অবসর প্রাপ্তির পর তিনি বাড়ী এসে বসেন এবং অকাতরে দানধ্যান আরম্ভ করেন। তাঁর এই দানধ্যানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল দুটি অতিথিশালা স্থাপন। স্বতন্ত্রভাবে একটি বাইরে, অপরটি নিজস্ব বাড়ীতে। দূরদূরান্ত থেকে কার্যব্যপদেশে বিভিন্ন লোক এসে এই অতিথিশালায় আশ্রয়লাভ করতেন। তাঁরা জানতেন সেখানে গেলে খাওয়া ও আশ্রয় উভয়েই মিলবে। যে-সব লোক তাঁদের জন্য স্থাপিত বাইরের অতিথিশালায় উঠতেন, তাঁরা ছাড়াও অনেকে গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়ীর অতিথিশালায় স্থান পেতেন। কেমন করে যেন একথা চাউর হয়ে যায় যে, পাবনা জেলার করঞ্জা গ্রামের চৌধুরী বাড়ী গেলেই আশ্রয় ও খাওয়া পাওয়া যাবে।

যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে—সেই উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যানবাহনের বড়ই অভাব ছিল। মামলা-মোকদ্দমার জন্যে লোককে জেলার সদরে যেতে হত। বিয়ে-সাদির ব্যাপারেও লোককে হাঁটাপথে বা নৌকাযোগে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হ'ত। এই রকম দুটি অতিথিশালা তাঁদের নিকট মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের মত কাজ করত। যাঁরা মামলা-মোকদ্দমা করতে যেতেন তাঁরা, এমন কি, বিয়ের বরযাত্রীরাও একবেলা বিশ্রাম করে রান্নাবান্না করে খেয়ে গন্তব্যস্থলে যাত্রা করতেন। তখনকার সেই সামন্ততন্ত্রের যুগে গ্রামগুলি ছিল দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত। দেশের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল অধিকারগত ক্ষমতা সম্প্রসারণের

প্রয়োজনে। দেশের জমিদার-জোতদারদের আর্থিক-সাংস্কৃতিক-অধিকারগত প্রয়োজনের ভিত্তিতেই সেদিন গ্রামে-গ্রামে উৎসব, আনন্দ, সাহিত্যচর্চা, আচারবিচার অনুষ্ঠিত হ'ত। প্রজাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নানা উৎসব, বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান ও আনন্দ মেলার আয়োজন হত। পাল-পার্বণে, উৎসবে যাত্রাপার্টি আনা হত দেশ-দেশান্তর থেকে। এই যাত্রাপার্টির জন্য ভিন্ন অতিথিশালার ব্যবস্থা ছিল। তাদের চাল-ডাল-মাছ-তরিতরকারী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া হত। তারা ইচ্ছামত রান্নাবান্না করে খেয়ে নিজেদের মত থাকত। তৎকালীন সমাজে এই যাত্রাপার্টিগুলির একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করত। এরাই ছিল তখন গ্রাম্য সংস্কৃতির ধারক-বাহক।

পাবনা জেলার করঞ্জয় গ্রামটি ছিল ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। সেজন্য এত লোকসমাগম হত।

এই অতিথিবাৎসল্য ছাড়াও গুরুপ্রসাদ চৌধুরী বার মাসে তের পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব, বাসন্তীপূজা, কালীপূজা, দান-ধ্যান সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রভৃতি মহাসমারোহে সম্পন্ন করতেন। পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ, পুত্রকন্যাদের বিবাহ, পৈতা, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উপলক্ষে নিজ গ্রামের সর্বজাতি-ধর্মের লোককে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাতেন। দশটি গ্রামের ব্রাহ্মণদেরও নেমন্তন্ন করতেন। এই ব্রাহ্মণদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে চিতল মাছের পেটি, রুইমাছের মুড়ো ও দইয়ের অগ্রভাগ যাকে বলা হত খাসা দইয়ের মাথা—প্রত্যেকের পাতে পরিবেশন করা হত। আর খাওয়ার তালিকায় সকলের জন্যে প্রচুর মৎস্যের সমারোহ থাকত। তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণদের কতখানি প্রাধান্য ছিল এ-থেকে তা বোঝা যায়।

পাবনার এই করঞ্জয় গ্রামে আরো যে দুই বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন তাঁদের একজন তারাচাঁদ মৈত্র। এঁর বাড়ীতে প্রতিদিন ধর্মগ্রন্থ গীতা,

চণ্ডী, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ হত। আর অন্যজন গিরিধর রায়—ইনি আবার নিত্য নতুন দালান দিতে ভালোবাসতেন। যে যাঁর স্বকীয়তায় ভাস্বর ছিলেন।

এ থেকেই প্রতীয়মান হয়—এককালে গ্রামগুলিই ছিল অর্থ-নৈতিক ভিত বা ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন জোতদার, জমিদার, রাজা-রাজড়ারাই। এঁরাই ছিলেন গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এক-কথায় বলতে গেলে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ পর্যন্ত কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে দেশের অর্থ নৈতিক নিয়ামক ক্ষমতাবান রাজা-জমিদার-জোতদারেরাই সংস্কৃতি-সভ্যতার পরিবাহক ছিলেন। তাঁদের আপন-আপন আখ্যায়িকাগুলিই ছিল দেশের ইতিহাস-সভ্যতার কাহিনী ও সংস্কৃতির উৎসধারা।

উপরোক্ত তিন জমিদারের এরূপ একটি আখ্যায়িকা ছিল। জমিদার গিরিধর রায়ের পুত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ও সুসাহিত্যিক শশধর রায় এই তিন জমিদারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে একটা ছড়া রচনা করেন ; ছড়াটি নিম্নরূপ ঃ

তারাচাঁদ পুরাণে
গিরিধর দালানে।
গুরুপ্রসাদ ভোজনে।

এই সব স্বনামধন্য জমিদারের মধ্যে শ্যামমোহিনীর পিতামহ গুরুপ্রসাদের স্ত্রীলোকদের অলঙ্কারাদি, দালান-কোঠা প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্যের প্রতি তাঁর আদৌ লক্ষ্য ছিল না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল লোক খাওয়ানো—অতিথি সৎকার, দোল-দুর্গোৎসব, যাত্রা-থিয়েটার, আমোদ-আহ্লাদ, দানধ্যান প্রভৃতি।

জমিদার গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর জমিদারী ছাড়াও লগ্নির কারবার ছিল। মোটা টাকা এ থেকে আয় হত। কিন্তু আমোদ-আহ্লাদ, অতিথিবাৎসল্য প্রভৃতিতে তিনি এমন মেতে থাকতেন যে, তদ্বির তদারকের অভাবে এ কারবার তাঁর ক্রমান্বয়ে লোকসানের পথে

যেতে বসল। তবু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। এই মহানুভব উদার ব্যক্তিটি কেবল আমোদ-আহ্লাদ, দানধ্যানে বিভোর হয়ে রইলেন।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর চার পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রদের নাম যথাক্রমে যোগেশ্বর, যাদবচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র ও হরিশচন্দ্র।

জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেশ্বর বিষয়-আশয় দেখাশুনা করতেন। কিন্তু পরে বানাইল জমিদার ষ্টেটের ম্যানেজারের পদ নিতে বাধ্য হন। কারণ পিতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর জমিদারী ও লগ্নীর কারবার উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে উপর্যুপরি লোকসান হতে থাকে। এদিকে গুরুপ্রসাদও তাঁর লগ্নীর কারবার এবং জমিদারী পড়ে যাওয়ায় মনের দুঃখে কাশীবাসী হন। সেখানে গিয়ে সাতদিনের মধ্যেই তিনি একরকম স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

মধ্যমপুত্র যাদবচন্দ্র চৌধুরী—শ্যামমোহিনীর পিতা তাহেরপুরের রাজা শিবশেখরেশ্বর রায়ের নাবালক পুত্র কুমার শশীশেখরেশ্বর রায়ের গার্ডিয়ান টিউটর নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি ঐ রাজ ষ্টেটের উকিল হন।

কুমার শশীশেখরেশ্বর চোখে খুব কম দেখতেন। এজন্যে পড়াশুনায় খুবই বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু মুখে-মুখে পড়িয়ে যাদবচন্দ্র তাঁকে বি. এ. পাশ করাতে সক্ষম হন। যাদবচন্দ্র তখন আইনের ছাত্র ছিলেন।

যাদবচন্দ্র সম্বন্ধে রাজা শশীশেখরেশ্বর উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি তাঁর অভিমত শ্যামমোহিনীকে এই কয়েক বৎসর পূর্বে এক সাক্ষাৎ উপলক্ষে বলেছেন:—"আপনার বাবা যাদবচন্দ্র ছিলেন সত্যিকার একজন মহান ব্যক্তি; যেমন ছিল তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তেমনি তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অনেকেই তাঁর কথা শুনত। আত্মভোলা পরোপকারী বিদ্যোৎসাহী এই মানুষটি পড়তে-পড়তে আমাদের বাগানের মধ্যেই কতদিন ঘুমিয়ে পড়েছেন। একবার এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল—তবু তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়নি।"

শ্যামমোহিনীর মধ্যেও উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার এই গুণাবলীর স্ফুরণ আমরা দেখতে পাই। নিখিল ভারত নারীশিক্ষা পরিষদের মত একটি বিরাট বহুমুখী প্রতিষ্ঠানের শত শত ছাত্রী শিক্ষিকা-কর্মচারী-পরিচালক-পরিচালিকাদের মাথার উপরে সর্বেসর্বা তিনি তাঁর অসামান্য হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার ও পরিচালনাদক্ষতাগুণে তাদের প্রত্যেককেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন। প্রত্যেকেই তাঁর কথা বেদবাক্য হিসাবে মেনে নেন—মানতে বাধ্য, যেন না মেনে উপায় নেই। যে যত মতলব নিয়ে আসুক না কেন, তাঁর বিনয়পূর্ণ স্বল্প কথার অটুট সিদ্ধান্তে সব মতলবই মাথা নত করে, শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করে। যাঁরা এই করুণাময়ীর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরা একথা দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করবেন।

কোটী কোটী টাকার নিজস্ব সম্পত্তি শ্যামমোহিনী স্বেচ্ছায় অকাতরে নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদকে দান করে দিয়েছেন। ব্যাঙ্কে বা কোথাও তাঁর নিজস্ব টাকাকড়ি বলে কিছু নেই। পরিষদের যাবতীয় সম্পত্তির অছি তিনি সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছেন। কিসে কেমন করে পরিষদের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি করা যায় তাঁর কেবল এই চিন্তা। নিজের সুখসুবিধের দিকে তাঁর আদৌ ভ্রূক্ষেপ নেই।

নিতান্ত না হলে নয় এমন সাধারণ পোষাকে সামান্য উপাদানে সজ্জিত সাড়ে তিনহাত সামান্য একখানা কাষ্ঠাসনে বসে তিনি তাঁর মহতী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে পুরনো ছোট্ট একটি সুটকেস—যাতে তাঁর যাবতীয় সামগ্রী—পেন, পেন্সিল, খাতা, কলম, বই প্রভৃতি ভর্তি—ঐ কাষ্ঠাসনের উপরেই রাখা। ওখানেই তিনি নিদ্রা যান। যা কিছু গুপ্তধন তাঁর পরিচালনা দক্ষতা কুবেরের ভাণ্ডার বই-পুস্তক-সংবাদপত্র-ম্যাগাজিন থেকেই তিনি সংগ্রহ করেন। সময় পেলেই এগুলি নিয়ে বসেন। একবেলা আহার না হলে তবু চলে কিন্তু এগুলি না হলে আদৌ চলে না।

অবসর সময়ে নিশীথ রাতের গভীরে তিনি পুস্তক থেকেই তাঁর যা কিছু শূন্যতা ভরাট করেন। বই জ্ঞানের ভাণ্ডার, তা থেকে তিনি ক্রমাগত জ্ঞান সঞ্চয় করে করে শিক্ষাবিস্তারে তিলে তিলে ব্যয় করে চলেছেন। তাঁর কথা হল—'যতদিন বাঁচব ততদিন শিখব। আর এই পুস্তকই হচ্ছে আমার প্রেরণার উৎস।'

কৃচ্ছ্রসাধিকা শ্যামমোহিনীর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা দেখে স্বতঃই মনে পড়ে সমারসেট মোমের লেখা সেই বিখ্যাত উক্তিটি—'পৃথিবীতে একটি মানুষের পক্ষে সাড়ে তিন হাত জায়গায়ই যথেষ্ট'; শ্যামমোহিনী তার প্রমাণ দিলেন। এমন নির্লোভ নিঃস্বার্থ ত্যাগ-মাহাত্ম্যে অত্যুজ্জ্বল জীবনের তুলনা হয় না। অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এইখানে তাঁর পর্বতপ্রমাণ পার্থক্য। এইখানে তিনি একক, অনুপম দৃষ্টান্তস্থল।

মাটি ফুঁড়ে কিছু বের হয় না। কিছু করতে গেলে পিতা-মাতা, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, আত্মীয়-পরিজনের ত্যাগ-তিতিক্ষা, আদর্শ, মহানুভবতা, নিত্যকর্মে শুচিতা, দান-ধ্যান, ঔদার্য্য, সদাচার প্রভৃতি গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হতে হয়। অভ্রভেদী মহীরুহ, সে তো কেবলমাত্র সুষ্ঠু বীজ থেকেই উৎপন্ন হয়।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র কৈলাসচন্দ্র একজন গৃহী সন্ন্যাসী ছিলেন। গেরুয়া বসন পরতেন। দীর্ঘদিন দেশ-বিদেশে তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করেন। তারপর ফিরে এসে মাটির তলায় সুড়ঙ্গ করে সেখানে কুঁড়ে ঘর করে নীরবে নিভৃতে সাধনায় একান্ত নিমগ্ন হন। ভাইপো-ভাইঝিদের বিশেষ করে শ্যামমোহিনীর শিশুমনে কাকার এই সুড়ঙ্গ মধ্যে তপস্যা গভীর প্রভাব ফেলে।

মধ্যম পুত্র যাদবচন্দ্রের বয়স যখন সবে চোদ্দ বৎসর তখন স্বগ্রাম-কন্যা শ্রেষ্ঠ-সুন্দরী দুর্গাসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু যাদবচন্দ্রের বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দুর্গাসুন্দরী দেবী দুটি কন্যা রেখে মারা যান, কন্যা দুটির নাম সুরসুন্দরী ও অন্নদাসুন্দরী।

অতঃপর আইন পড়াকালে ১৮৭৮ সালে তিনি গোবিন্দময়ীকে বিবাহ করেন। গোবিন্দময়ী ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার সহবৎপুর গ্রামের জমিদার নন্দকুমার বক্সীর একমাত্র কন্যা। গোবিন্দময়ীর বয়স তখন সবে দশ বৎসর। তিনি পূর্বেই কিছু বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন গ্রাম্য পাঠশালায় ও গৃহশিক্ষকের নিকট। বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী এসে তিনি অন্য দুই জায়ের সঙ্গে অনবরত গৃহকর্ম ও অতিথিদের জন্য রান্নাবান্না করতেন। পূর্বেই বলেছি পাবনার করঞ্জয় একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের একদল যুবক পাশ করে এসে ঠিক করলেন তাঁরা গ্রামে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করবেন। একাজে তাঁদের প্রধান সহায়ক ছিল পাবনা সম্মিলনী সভা।

১৮৬০ সালে পাবনা সম্মিলনী সভা আরম্ভ হয়। এই পাবনা সম্মিলনী সভা তাদের বহু জনহিতকর কার্যের সঙ্গে সঙ্গে একটি শাখা স্থাপন করতেন অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে। এই শাখা গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাতেন। লোক পাঠিয়ে অন্তঃপুরবাসিনীদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতেন। তাঁরা এই শিক্ষার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করতেন। পুঁথিপুস্তকাদি যাবতীয় জিনিষপত্র সম্মিলনী থেকে সরবরাহ করতেন। বৎসরে দু'বার পরীক্ষা নিতেন। বাৎসরিক পরীক্ষায় ছাপানো প্রশ্নপত্র পাঠাতেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে পরীক্ষা নিতেন। কি বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা! যেন একটি মহা উৎসব। পরীক্ষাশেষে ফল অনুযায়ী পারিতোষিক দেওয়া হত। এখানে পাঠ্যসূচী ছিল বাংলা-ইতিহাস-ভূগোল প্রভৃতি। সূচীশিল্পও শিক্ষা দেওয়া হত।

তৃতীয় অধ্যায়

স্ত্রীশিক্ষার গোড়ার কথা

প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীশিক্ষার গোড়ার কথা কিছু না বললে পাবনা সম্মিলনী সভার এই মহতী প্রচেষ্টাকে সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না। আরম্ভেরও একটি আরম্ভ আছে—যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকানো।'

বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা আদৌ ছিল না বললে অত্যুক্তি হয় না। তা শুধুমাত্র অন্তঃপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উন্নত ধনী পরিবারের কিছুসংখ্যক মেয়ে কেবল ঘরে বসে গৃহশিক্ষকের সাহায্যে সে শিক্ষার সুযোগ পেত। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা সে শিক্ষার সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত ছিল। লোকে বিশেষ করে প্রাচীনেরা মনে করতেন যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়। অবশ্য এর পিছনে এক ঐতিহাসিক কারণ ছিল।

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের পর পর্দাপ্রথা প্রবর্তন হওয়ায় ও আরো অনেক কারণে হিন্দু মেয়েরা কূপমণ্ডুক হতে বাধ্য হন। একাদিক্রমে আটশো বছর যাবৎ মুসলমানেরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করে। আর এই মুসলমানধর্মের আধিপত্য ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মকে তাদের নিজেদের জন্মভূমিতে যতই কোণঠাসা করে রেখেছিল ততই হিন্দুধর্ম শূচিতা আর আত্মরক্ষার জন্যে কূপমণ্ডুক হয়ে পড়েছিল। হিন্দুসমাজ সেদিন সতীদাহকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করে সহমরণকে পবিত্র কর্ম বলে গণ্য করত। বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি পঙ্কিলতায় দেশে তখন টালমাতাল অবস্থা।

রাজা রামমোহন ও স্ত্রীশিক্ষা

এই দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা দূরীভূত করতে যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৭৭৪ সালে যুগন্ধর রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। মূলতঃ তাঁর জন্মের পর থেকেই বাঙালী জাতির নবজন্ম সুরু হয়। এমন দিক নেই যেদিকে তাঁর ক্ষুরধার দৃষ্টি পড়েনি। ১৮১৯ সালে সমাজসংস্কারক, ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায় সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন—"আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোকদের প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন। সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বাগ্রে তাদের শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।" যে সময় রাজা রামমোহন রায় এই হুঁসিয়ার-বাণী দেন, ঠিক সেই বৎসরই ১৮১৯ সালে কলকাতায় প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন হয় এবং নারীজাতির জীবনে জ্ঞানের আলো জ্বালাবার প্রথম প্রচেষ্টা সুরু হয়। নারীজাতির প্রতি অসাধারণ মমত্বে রাজা রামমোহন সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রাদি থেকে প্রাচীন হিন্দুনারীর শিক্ষার উন্নতির বহু নজির তুলে ধরে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে 'স্ত্রী-শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তক রচনায় সাহায্য করেন। কিন্তু একথা সর্বজন-গ্রাহ্য, সর্বজনস্বীকৃত যে, এদেশে বহুজনহিতকর কার্যের হোতা হিসাবে এই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের মূলের কৃতিত্ব ও গৌরব একমাত্র মিশনারীদেরই প্রাপ্য। এ ইতিহাস সামান্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করি।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তথা গভর্নমেণ্টের নিকট হতে ১৮১৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে নতুন সনদ লাভ করেন তাতে অনেক বিষয়ের সঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—(১) শিক্ষাখাতে ভারত সরকারের রাজস্ব হতে প্রতি বৎসর একলক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ, (২) ভারতে খৃষ্টান পাদ্রীদের অবাধ গতিবিধি এবং এঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়ই যে ভারতবর্ষে ব্যাপক স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হয় তার প্রমাণ আমরা

পাই গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক পুস্তক থেকে। তিনি লিখেছেন—"কেবল আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরাই লেখাপড়ার 'পদ্ধি' আগে ছিল না, এই জন্য কিছুদিন কেহ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইংরেজী ১৮২০ সালের জুন মাসে শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা এই কলকাতায় নন্দন যুবনাইল পাঠশালা নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এইক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটি স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসর মিশনারীদের চেষ্টায় ভারতবর্ষে অনেক ইংরেজী ও বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন হয়। বিদ্যালয়-গুলির মান বেশ উন্নত ধরণের ছিল। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার জন্যে তাঁরা তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। করেছিলেন তাঁদের মেয়েরা। তাঁরা এটা আন্তরিক মনে করেছিলেন যে, এদেশের মেয়েদের জ্ঞানালোকে আলোকিত করতে না পারলে এদেশবাসীর মঙ্গল করা কিছুতেই সম্ভব নয়। যে কথা সেই কাজ। একাজে সাহায্যের জন্যে বিলাত থেকে অ্যান কুককে আনা হল। স্কুল গড়ে উঠল কিন্তু তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা ছাড়া সে স্কুলে উচ্চবর্ণের মেয়েদের পাঠানো হত না। কারণ হিন্দুধর্ম এমন এক গোঁড়ামীতে সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে, নিম্নবর্ণের মেয়েরা মিশনারীদের চেষ্টায় প্রথম প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশুনা করে জ্ঞানার্জনের সুযোগ লাভ করেছিলেন। হিন্দুজাতির কাছে তাঁদের অচ্ছুৎ প্রমাণিত হওয়ার সুযোগ নিয়ে খৃষ্টান পাদ্রীরা নিম্নশ্রেণীর নারীপুরুষদিগকে খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত করে নিতে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা তাদের মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠাবার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। প্রথমে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় গঠন করে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করেন। ১৮১৯ সালে মিসেস পীয়ার্স ও মিসেস লসনের সাহায্যে ও অন্যান্য মিশনারীদের নিয়ে এই ফিমেল জুভেনাইল

সোসাইটি গঠিত হয়। ব্যাপটিষ্ট মিশনের পাদ্রী ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

মূলতঃ ১৮১৯ সালে সর্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির দুর্দশা মোচনে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে গোঁড়া হিন্দুদের সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। এবার প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠাতে অসম্মত হওয়ায় তাদের কূপমণ্ডুকতা, অন্ধ-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠলেন। হৃদয়ের ঔদার্যে অদম্য আবেগে তিনি জাতিকে ভেঙেচুরে নতুন জীবন দিতে অমোঘশক্তি ধারণ করলেন। নারীজাতিকে বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্যে তিনি আবার লেখনী ধারণ করলেন। ১৮২২ সালে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা-অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে "Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females" নামে একখানা ক্ষুদ্র অথচ অতি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। বলা বাহুল্য, এই পুস্তকখানিই ভারতীয় নারীর প্রথম Charter of Rights. বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নারী আজ যে সর্বক্ষেত্রে তার অধিকার বেটে নিয়েছে তার মূলে নারীহিতৈষী রাজা রামমোহনের অবদান চিরস্মরণীয়। মূলতঃ মহীয়সী জননী শ্যামমোহিনীর কথা বলতে গিয়ে স্ত্রীশিক্ষার গোড়ার কথা সমান্য তুলে ধরছি। সেই মহান ও মহীয়সীদের কিঞ্চিৎ অবদানের কথা তুলে ধরছি যাদের চেষ্টায় ভারতীয় নারী আজ জগৎসভায় শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করেছেন। এর পর এই বৎসরই ১৮২২ সালে সর্বপ্রথম গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি ব্যাপক স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষ সহায়তা করে। রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেবও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

১৮২৩ সালে উক্ত সোসাইটির স্কুলসংখ্যা ছিল আটটি এবং ঐ বৎসর ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার গৌরীবাড়ীতে সোসাইটির স্কুলের ছাত্রীদের একটি সাধারণ পরীক্ষা হয়। অন্তত একশো জনের বেশী হিন্দুমুসলমান ছাত্রী এই পরীক্ষায় যোগদান করে। এর মধ্যে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রীসংখ্যা অধিক। সে-যুগে এই ধরণের পরীক্ষা গ্রহণ

কালে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ও সংবাদপত্রসম্পাদকেরা নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত থাকতেন। এরপর ১৮২৪ সালে লেডিস সোসাইটি, ১৮২৫ সালে ১৪ই জানুয়ারীতে লেডিস এসোসিয়েশন, শ্রীরামপুর মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সব প্রতিষ্ঠান কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরছি।

স্ত্রীশিক্ষায় খৃষ্টান মিশনারীদের অবদান

দেশবিদেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে ব্রিটিশ এ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি নামে একটি সংঘ ছিল। কলকাতা স্কুল সোসাইটিকে সাহায্য করতে এই সোসাইটি ১৮২১ সালের নভেম্বর মাসে কুমারী অ্যান কুককে কলকাতায় পাঠান। কিন্তু এইসব স্কুলে যত না শিক্ষা দেওয়া হত তার চাইতে খৃষ্টধর্ম প্রসারের দিকে তাদের অত্যধিক লক্ষ্য ছিল। এই কারণেই স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এর ফলাফলের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ডক্টর টমাস স্মিথ নামে একজন পাদ্রী স্পষ্টই বলেন, "আমরা একথা কোন মতেই গোপন করতে পারি না যে, আমাদের মনোগত বাসনা হ'ল ভারত সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টধর্মাক্রান্ত হয়। আর স্ত্রীশিক্ষাকে এর একটি প্রকৃষ্ট উপায় বলে ধরে নিয়েছি।" কিন্তু এসব সত্ত্বেও সবদিক বিবেচনা করে দেখলে স্ত্রীশিক্ষার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে তাদের কার্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ায় এর উন্নতি অনেকখানি লক্ষণীয় এবং এই শুভ প্রচেষ্টার জন্যে ভারতবর্ষের প্রতিটি লোক এঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

রাজা রামমোহন ও সতীদাহ

রাজা রামমোহনের সতীদাহ প্রথা রহিত আন্দোলনের ফলে বাস্তবিক-পক্ষে নারীজাতির দুঃখদুর্দ্দশা-অবমাননা-লাঞ্ছনার দিকে

এদেশবাসীর অনেকেরই নজর পড়ে। অবশ্য এই লোমহর্ষক বীভৎস পৈশাচিক বর্বর প্রথা ১৭৮৯ সালে ব্রিটিশ শাসককুলের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু সে তেমন কার্যকরী হয় না। অন্যের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করতে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত হন। কিন্তু ১৮১১ সালে রাজা রামমোহন রায় তাঁর ভ্রাতা জগমোহনের বিধবা পত্নীকে জোর করে সহমরণে দেওয়ায় নিষ্ঠুর, নৃশংস এই প্রথা অবলুপ্তির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এজন্যে তাঁর জীবনসংশয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অদম্য সাহস ও অটুট মনোবল নিয়ে তিনি সঙ্কল্পে অবিচল থাকেন। ১৮১৭ সালে আইনের মাধ্যমে প্রথম সতীদাহ প্রথা রহিত হয়। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুরা নানাভাবে বাধা প্রদান করেন। গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে প্রগতিশীল হিন্দুসমাজ আন্দোলন চালাতে থাকেন।

অবশেষে ১৮১৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহের মত নিকৃষ্টতম প্রথা আইনের মাধ্যমে রহিত করেন তদানীন্তন বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক। Prohibitory Act বলে এই প্রথা রহিত করেন। এই দিনটি ভারতীয় নারীজাতির নিকট অবিস্মরণীয় দিন। এই সব মহান ব্যক্তির প্রচেষ্টায় নারী তার হৃতগৌরব মনুষ্যত্বের অধিকার অর্জন করেন। কিন্তু তখনও রক্ষণশীল হিন্দুরা ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলে তীব্র প্রতিবাদ করেন। বহুজনস্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে পাঠান। সঙ্কল্পে অটল রাজা রামমোহন তখন বিলাতে পাড়ি জমালেন যাতে প্রিভি কাউন্সিলে এইসব স্বার্থান্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধার্মিকদের আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হয়।

পাঁচটি কুসংস্কার

তৎকালে এদেশে পাঁচটি কুসংস্কার সমাজকে একেবারে স্থবির করে দিয়েছিল। এর মধ্যে তিনটিই জনসংখ্যার বৃহৎ একাংশ নারী
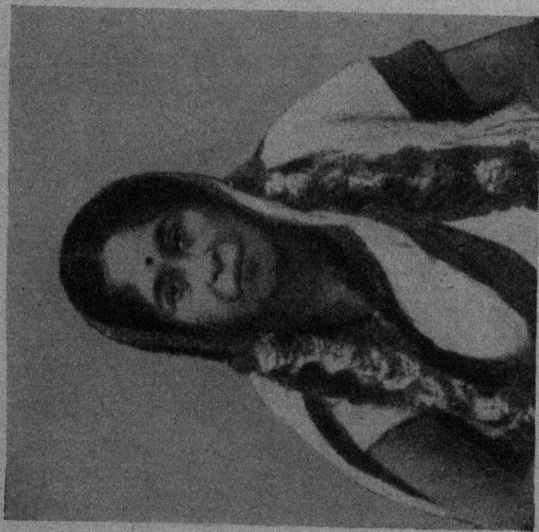
সাহিত্যসম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী
১৯৩৫-৫৮ সাল পর্যন্ত পরিষদের সভানেত্রী

লেডী অবলা বসু (১৯৩৪)

পরিষদ পরিদর্শনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু (১৯৫৩)
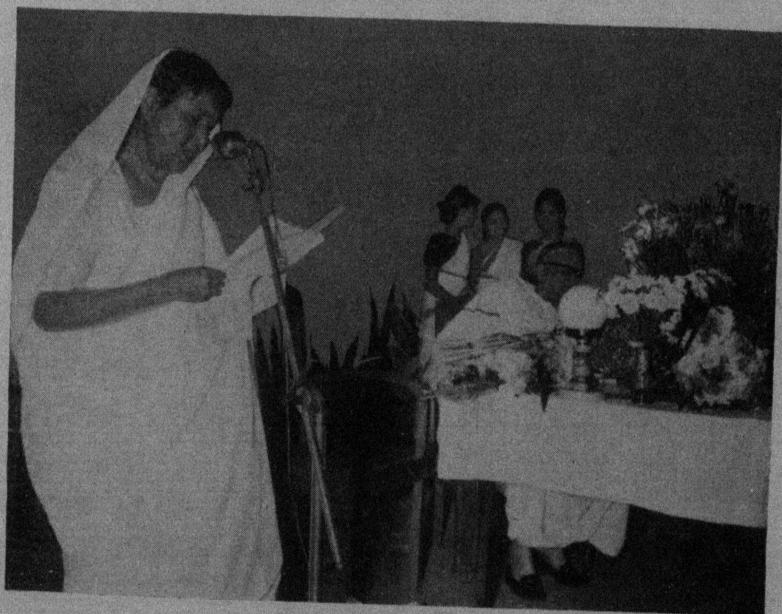
পরিষদ প্রতিষ্ঠা বার্ষিক দিবসে ভাষণদানরতা শ্যামমোহিনী
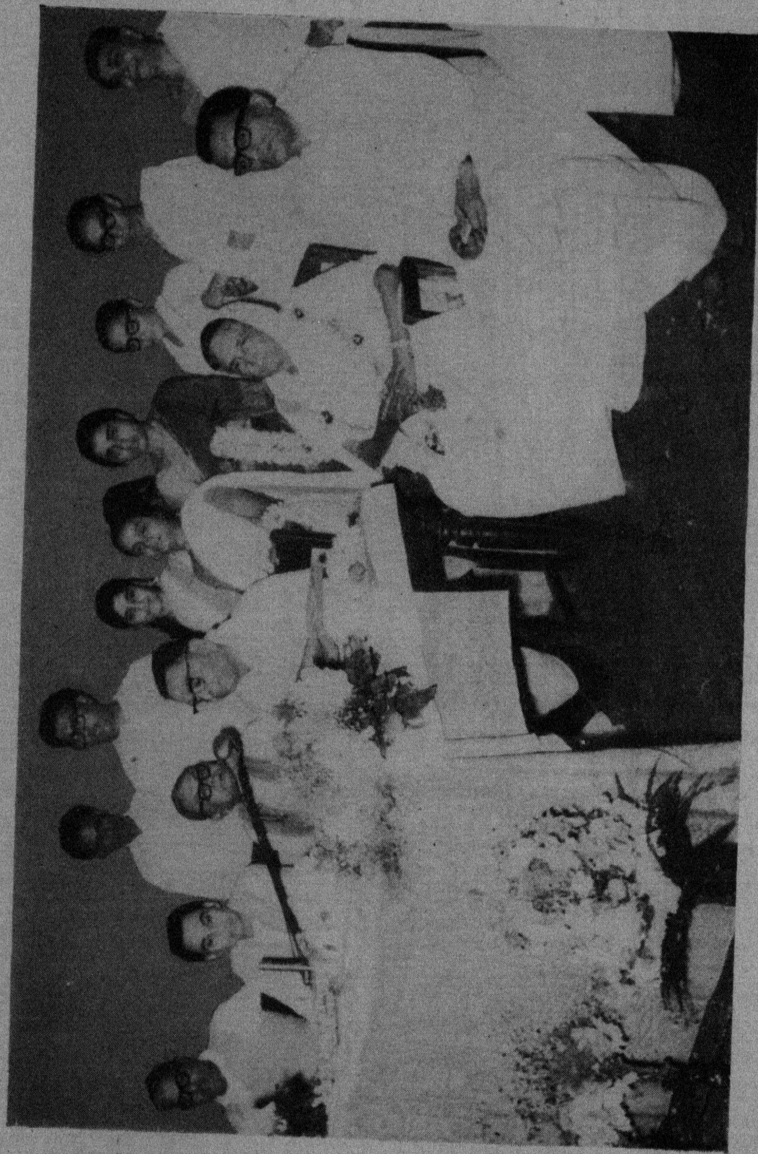
শ্যামমোহিনীর এক জন্মবার্ষিক দিনে ভাষণদানরত সুসাহিত্যিক বনফুল ও তাঁর বামে শ্যামমোহিনী ও শ্রীগণেশপ্রসাদ সরফ (মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটির সদস্য) ; বনফুলের ডাইনে স্বপনবুড়ো (অখিল নিয়োগী)

জাতির সমস্ত অধিকার হরণের দৃষ্টান্তস্বরূপ। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ এই তিনটি নারীর স্বাধিকার হরণের হাতিয়ার। নারীকে শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রহিসাবে গ্রহণ করে তাকে সামাজিক আর সব রকম মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে রাখাও ধর্মের একটি অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠেছিল। আর জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা—সে দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝায় ভারী সমাজ নতুন কোন চিন্তা করতে পারত না। কিন্তু এই সব অজ্ঞানের অন্ধকার ভেদ করে যুগন্ধর রাজা রামমোহন গোঁড়া অন্ধ কূপমণ্ডুক ধার্মিকদের ভাঁওতায় শৃঙ্খলিত নারীজাতির মুক্তি পাছে বিঘ্নিত হয় এজন্যে বিদ্যুৎগতিতে সমস্ত তথ্যসম্বলিত দলিলপত্র নিয়ে বিলাতে হাজির হলেন। সেদিনকার সেই বীভৎস নারকীয় পৈশাচিক সমাজব্যবস্থার কথা ভাবলে প্রাণ আজও আতঙ্কে শিউরে উঠে। সঙ্কীর্ণতায় তদ্‌গতপ্রাণা সমাজপ্রতিভূরা তখন প্রকৃতির যাবতীয় সৃষ্টিকেও যেন তাদের নিষ্ঠুর অনুশাসনে স্তব্ধ করে দিতে বদ্ধপরিকর। এক একজন যেন গল্পের রাজা কেনিউট যিনি সমুদ্রকে তার গর্জন থামিয়ে স্তব্ধ হতে আদেশ করেছিলেন। স্বভাবতঃই রাজা রামমোহনের জীবন নাশেরও কসুর করেনি এরা। কিন্তু মাতৃজাতির প্রতি সুগভীর মমতায় ও অসাধারণ তেজস্বিতায় তিনি এসব গ্রাহ্য করেন নি। তিনি জন্মেছিলেন এক অনন্যসাধারণ শক্তি নিয়ে অন্য উপাদানে গঠিত হয়ে।

১৮৩০ সাল। নারীজাতির শৃঙ্খল মোচন হল বটে কিন্তু মাতৃজাতির প্রতি অসাধারণ করুণার আধার রাজা রামমোহন আর ফিরে এলেন না। ১৮৩৩ সালে ব্রিষ্টল সহরে তিনি দেহত্যাগ করেন। এভাবে সমগ্র জীবনব্যাপী সংগ্রামে লিপ্ত সমাজসংস্কারক যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহনের জীবনাবসান হয়। আজ নারীজাতির সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার ও তার অগ্রগতির কথা ভাবলে স্বতঃই সামনে এসে দাঁড়ান স্ত্রীজাতির মুক্তিপ্রবক্তা চিরকল্যাণকামী চিরহিতাকাঙ্ক্ষী রাজা রামমোহন। বস্তুতপক্ষে একটি পতনোন্মুখ জাতিকে ভেঙেচুরে

নতুন ভাবে গড়ে তুলে সুস্থ সবল সচ্ছন্দ জীবন দানের মূলে তাঁর দান অসামান্য, অভূতপূর্ব, অতুলনীয়। সত্যিই তিনি ভারতপথিক।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার

সতীদাহ প্রথা রহিত আন্দোলনেই প্রকৃতপক্ষে নারীজাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা-অবমাননার দিকে অনেকের নজর পড়ে। বাংলায় পুস্তিকা লিখে রামমোহন তা জনগণের মধ্যে বিতরণ করেন। এরপর হিন্দুকলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণও প্রকাশ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীতার আলোচনা সুরু করেন। ১৮৪২ সালে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেন নব্য বঙ্গের রামগোপাল ঘোষ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক মাইকেল মধুসূদন ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় রৌপ্যপদকে সম্মানিত হন।

এরপর মতিলাল শীল, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাপদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণও স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেন।

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ও বাংলার স্ত্রীশিক্ষা

উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দুই ভাই ১৮৪৫ সালে শিক্ষিত সমাজের নিকট একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের জন্যে আবেদন করলেন, কিন্তু সে চেষ্টা তেমন সফল হল না। তারপর সেই দিনটি এলো। ভারতের নারীদরদী, নারীত্রাতারূপে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বড়লাটের পরিষদের আইনসদস্য হয়ে হাজার হাজার যোজন মাইল দূর থেকে সাতসমুদ্র তের নদী পার এদেশে এলেন। তিনি বিলাতে আইন ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি লাভ

করেন। কবি ও সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি চিরকুমার ছিলেন। স্বদেশে থাকাকালে তিনি ভারতবাসীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। বিভিন্ন পত্র, পুস্তক, পুস্তিকায় ভারতীয় নারীদের ব্যাপক নিরক্ষরতার কথা জানতে পেরে তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয়ে যারপরনাই ব্যথা পান। পরবর্তীকালে বলতে গেলে তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার যুগপ্রবর্ত্তন হয়।

যখনই ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হবে পাশ্চাত্যের এই উজ্জ্বলতম পুরুষ বেথুন সাহেবের নাম সর্বাগ্রে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে। ভাস্বর এই নামটি সর্বাগ্রে সামনে এসে দাঁড়াবে। মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপকারিতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ—"যদি আমরা সৎ হই তবে আমাদিগকে অবশ্যই এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনধারায় আধুনিক সভ্যতা অত্যন্ত জোরালো টনিকের মত শক্তি দান করিয়াছে।"

পাবনা সম্মিলনীর স্ত্রীশিক্ষা প্রসার শাখার উৎস বলতে গিয়ে প্রথমেই স্ত্রীশিক্ষার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করছি। এর ফলশ্রুতি হিসাবে দুঃস্থা, বয়স্কা বিধবা, কুমারী, সমাজে অপাংক্তেয় নারীর জন্যে নিখিলভারত নারীশিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকার জীবনব্যাপী ত্যাগসাধনার উজ্জ্বল নিদর্শন দেখতে পাই। এই নিঃস্বার্থ মহীয়সীর অতুলনীয় অবদানের কথা বলতে গিয়েই এই গৌরচন্দ্রিকা। যাক্ যা বলছিলাম। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে মাত্র একুশটি ছাত্রী নিয়ে জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টায় রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের শিমুলিয়াস্থিত বাড়ীতে বর্তমান বেথুন স্কুল তথা বেথুন কলেজের সূত্রপাত হয়। বেথুন সাহেবের এই বিদ্যালয় গঠন কার্যে সানন্দে সাহায্য করেছিলেন রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এঁরা ছাড়া সাহায্য করেছিলেন তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ২১টি

বালিকা নিয়ে এই বিদ্যালয় সুরু হয়—তার মধ্যে ভুবনমালা ও কুন্দমালা ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারেরই দুই কন্যা।

ছাত্রীদের নিকট হতে কোন মাইনে নেওয়া হত না। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তকও সরবরাহ করা হত। বেথুন সাহেব সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন। তিনি স্বয়ং বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে ছাত্রীদের পড়াশুনার অগ্রগতির দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। তিনি বাঙালীদের বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিগণও এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে এগিয়ে আসেন।

বেথুন বিদ্যালয়ের নির্মাণকার্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর নয় হাজার টাকা মূল্যের ভূমি ও তৎসহ এক হাজার টাকা দান করেন। ১৮৫০ সালে ৬ই নভেম্বর হেদুয়া পুষ্করিণীর (অধুনা আজাদ-হিন্দবাগ) পাশে এই জমির উপর তদানীন্তন বাংলার গভর্নর স্যার জন হান্টার লিটলার বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বেথুন সাহেব বিদেশী হয়েও এদেশের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ বিষয়ে বলেছেন যে, বৈদিকযুগে হিন্দুকন্যারা পরা ও অপরা বিদ্যায় প্রচুর ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল—সমাজে নারীর স্থান ছিল সুউচ্চে—বর্তমানে নারীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করাকে তিনি অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। এজন্যে তিনি এদেশের নব্যশিক্ষিতদের উদাত্ত আহ্বান জানান। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহনের কারণস্বরূপ বলেছেন—তিনি বিদ্যালয়ের ব্যয় বহনের জন্যে ভারত সরকারের নিকট সাহায্য চাইলে বিদ্যালয় স্থাপনে অনেক দেরী হয়ে যেত। এমন কি প্রাচীনপন্থী গোঁড়া সমাজপতিদেরও নিমন্ত্রণ করেন নি, পাছে তাঁদের দিক থেকে কোন বাধা এসে পড়ে। উপরন্তু ইউরোপীয়ানদেরও ডাকেন নি, পাছে সমারোহের বাহুল্য প্রকাশ পায়। এমন ছিল তাঁর সচেতন ও সাধু সঙ্কল্প। কিন্তু বহু রক্ষণশীল ব্যক্তি তাঁর এ কাজে বাধাপ্রদান করলে ছাত্রীসংখ্যা এবুশ

থেকে নেমে সাতে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন ছিল না। ধর্মপ্রচারের পরিবর্তে নিছক বিদ্যাশিক্ষার জন্যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—একথা এদেশের মানুষ বুঝতে পারল। বাধা-বিঘ্ন-আপত্তি অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এলো। ১৮৫১ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীয় কন্যা সৌদামিনীকে এই স্কুলে ভর্তি করে' দিয়ে প্রকাশ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন।

ক্রমে-ক্রমে ছাত্রীসংখ্যা বাড়তে থাকে। সে ইতিবৃত্ত এখানে অনাবশ্যক। কেমন করে সেদিনের স্ত্রীজাতি তার শোচনীয় অবস্থা থেকে হৃতগৌরব ফিরে পায় শুধু তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরতে আমার এ অক্ষম প্রয়াস।

নারীশিক্ষার ইতিহাস বেশীদিনের নয়। ১৮৭৮ সালে প্রথম কাদম্বিনী বসু যথারীতি বেথুন বালিকা বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। পরে এই কাদম্বিনী বসুই প্রথম ভারতীয় মহিলা ডাক্তার হওয়ার সম্মান লাভ করেন। এভাবে ভারতে সর্বসম্মতি-ক্রমে প্রকাশ্যে নারী-জাগরণের সূত্রপাত হয়। কিন্তু সে শিক্ষা তখনও সর্বত্র পৌঁছোয় নি। বলতে গেলে মুষ্টিমেয় সে শিক্ষা কেবল সহরেই কেন্দ্রীভূত ছিল। কারণ মিশনারী ও জমিদারশ্রেণীর বদান্যতায় পল্লীগ্রামে স্ত্রীশিক্ষালয় গঠিত হলেও বাল্যবিবাহ প্রথার জন্যে ছাত্রী পাওয়া যেত না। ফলে সে বিদ্যালয় চালনা কঠিন হয়ে উঠে। তখন নব্যশিক্ষিত এদেশীয় যুবকদের এদিকে দৃষ্টি পড়ে।

ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন ও অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার

যুগন্ধর পুরুষ রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন স্থবির সমাজের সবদিকে একটা বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। স্থবির সমাজে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে তিনি ১৮৩০ সালে ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন

করেন। তাঁর এই নব্যধর্মে দীক্ষিত নব্যশিক্ষিত যুবকগণ উল্কার ন্যায় সমাজের দুরপনেয় কলঙ্করাজি মোচন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর একাজে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের অসামান্য অবদানের কথা বাঙালী কখনও বিস্মৃত হতে পারবে না। ১৮৪৫ সালে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। যোগদান করেই তিনি একাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। পূর্বসূরীদের ন্যায় নারীর প্রতি তাঁর দরদ কোন অংশে ন্যূন নয় বরং বৃহত্তর নারীসমাজকে শিক্ষিত করতে এবং তাদের মানবিক সর্বপ্রকার অধিকার অর্জনের যোগ্য করতে তিনি তাঁর অদম্য হৃদয়াবেগকে কাজে লাগান। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ-যোগ্য যে, ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের মাতা সারদাসুন্দরী তৎকালে (১৮১৯-১৯০৭) একজন সু-সাহিত্যিকা ছিলেন। ১৮৯১ সালে রচিত তাঁর "আত্মকথা" ১৯১৪ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৫৯ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন ব্রাহ্মবিত্থালয় স্থাপন করেন। নারীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ নিয়ে তিনি বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন করেন। প্রার্থনা সভায় মেয়েদের অবাধ আসন গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন যা আগে কখনও ভাবা যেত না। পৈতাধারী ব্রাহ্মই ব্রাহ্মদের আচার্যের কাজ করবেন এটা মানতে তিনি অস্বীকার করেন। পূর্বে ব্রাহ্মরা পৈতা ধারণ করতেন। তিনি এ প্রথাও রহিত করতে চান। কেশব সেনের এই প্রবর্তিত নীতিকে নববিধান বলা হয়। ১৮৬২ সালে কেশব সেন ব্রাহ্মদের আচার্য হন। পরবর্তীকালে আচার্য কেশব সেনের দ্বিতীয় পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র সেন মৃণালিনী দেবী নামে এক বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন। পূর্বে পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সঙ্গে মৃণালিনী দেবীর বিবাহ হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তের বৎসর। বিবাহের দুই বৎসর পরেই তিনি বিধবা হন। বিধবা হবার পর মৃণালিনী দেবী কাব্য চর্চ্চা সুরু করেন। প্রতিধ্বনি, (১৮৯৪) নির্ঝরিণী (১৮৯৫) প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৯০৫ সালে তাঁর পুনরায় বিবাহ হয়। বিবাহের পর মৃণালিনী স্বামী নির্ম্মলচন্দ্র সেনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। নারীমুক্তি আন্দোলনে তৎকালে তাঁর দানও কিছু কম নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ

১৮৬২-৬৩ সালে সর্বপ্রথম বাংলার শিক্ষাবিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে নারীশিক্ষার কথা উল্লিখিত হয়। এই রিপোর্টে বেথুন স্কুল সম্বন্ধেই বিশেষ উল্লেখ থাকে। ১৮৬২ সালের ৩০শে এপ্রিল সরকারের পরিচালনাধীনে বালিকা স্কুল ছিল পনরটি। ১৯৬৩ সালে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়ে দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশটি। ছাত্রীসংখ্যা পাঁচশো ত্রিশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এক হাজার একশো তিরাশী হয়।

বেথুন সাহেবের মৃত্যু হয় ১৮৫১ সালের ১২ই আগষ্ট। কিন্তু জীবিতকালে বেথুন সাহেব বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে উৎসাহী কর্মী পেয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। ১৮৫৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে বিদ্যাসাগর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। অন্যদিকে সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করতে তিনি আপ্রাণ প্রয়াস চালান। ১৮৫৬ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়। একাজে হাত দিয়ে তিনি অল্পবয়সী এক বিধবা কন্যার সঙ্গে স্বীয় পুত্র নারায়ণের বিবাহ দেন। ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই নারীহিতৈষী দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্ত্রীশিক্ষার স্কুলসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির মূলে আচার্য কেশব সেনের দান অনস্বীকার্য। আচার্য কেশব সেন প্রবর্তিত নববিধান ধর্মে দীক্ষিত নব্যশিক্ষিত যুবকগণ উল্কার ন্যায় সমাজগঠনমূলক, শিক্ষামূলক প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কার সাধনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের বিপুল উৎসাহে ও চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়। অতীত আর বর্তমানে সংঘর্ষ, সামাজিক সংস্কারে এমন বিপুল উন্মাদনা আগে কখনও

আর দেখা যায় না। বাঙালী তার জীবনের বহুদিনকার পুঞ্জীভূত জড়ত্ব থেকে জেগে উঠেছিল। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাদের অবদান অন্যতম। কারণ যদিও বেথুন স্কুল ভালভাবেই চলছিল কিন্তু তৎকালীন সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী মাত্র দশ বৎসর বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার প্রথা থাকার ফলে শিক্ষা ব্যাহত হত। সর্বসাকুল্যে মাত্র চার বৎসর মেয়েরা স্কুলে পড়ার সুযোগ পেত এবং অত্যন্ত নগণ্য কারণেও ছাত্রীরা স্কুল কামাই করত, বাড়ীর নানা কাজের অছিলা দেখাতো। আর তখনও খুবই কমসংখ্যক ভদ্রঘরের ও ধনীলোকের মেয়েরা প্রকাশ্য স্কুলে লেখাপড়া শিখতে আসত। এ কারণে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার একান্ত অপরিহার্য মনে করে আচার্য কেশব সেনের তত্ত্বাবধানে বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে নব্যশিক্ষিত যুবকেরা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। কবির ভাষায় 'না জাগিলে সব ভারতললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না।' অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের অগ্রণী হিসাবে পাবনা সম্মিলনী অন্যতম ছিল।

শ্যামমোহিনীর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়—"আমার পিতা রাজসাহীতে ওকালতী করতেন। তিনি তথাকার বড় বড় রাজষ্টেটের যেমন দীঘাপতিয়া, তাহেরপুর, নাটোর, রাজসাহীর পুটিয়া প্রভৃতির উকিল নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালীন করঞ্জা গ্রামে শিক্ষানুরাগী যুবকদের স্থাপিত একটি মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ঐ কেন্দ্রটি পাবনা সম্মিলনী সভার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাবনা সম্মিলনী সভা তখন গ্রামে গ্রামে অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যে এইরূপ কেন্দ্র স্থাপন করতেন। তথায় পাঠ্যপুস্তকাদি পাঠিয়ে দিতেন। গ্রামের যুবকরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে শিক্ষালাভেচ্ছু মেয়েদের পরীক্ষা করে ক্লাশ অনুযায়ী পুস্তকাদি দিয়ে যেতেন। মেয়েরা ঘরে পড়তেন এবং ঐ মহিলা শিক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দিতেন বৎসরে তিনবার। গ্রামের যুবক সমিতি শেষ পরীক্ষার কাগজপত্র পাবনা সম্মিলনী সভায় পাঠিয়ে দিতেন। তাঁরা পরীক্ষা করে পরীক্ষোত্তীর্ণা মেয়েদের নাম পাবনা সম্মিলনী

সভার পুস্তিকায় ছাপাতেন। তাঁরা ঐ পুস্তিকা ও গুণানুসারে পুরস্কার পাঠিয়ে দিতেন। আমি ঐ পুস্তিকা ও মায়ের পাওয়া পুরস্কার —যথা বড় বড় কাঠের বাক্স বোঝাই পুস্তকাদি দেখেছি। মা ও আমার সৎদিদি, জ্যেঠীমা-কাকীমা প্রভৃতির নাম ঐ পুস্তিকায় ছাপার অক্ষরে দেখেছি। আমার মা পর পর সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। আগাগোড়া তিনি কৃতী ছাত্রী ছিলেন।

আমার মা, জ্যেঠীমা, কাকিমা সমস্ত দিন সংসারের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর রাত্রের রান্না-বান্না সেরে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে নিজেরা খেয়ে-দেয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত লেখাপড়া করতেন। পাছে লেখাপড়ার জন্যে সংসারের কাজে ক্ষতি হয় বা শ্বশুরবাড়ী থেকে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয় সেজন্যে তাঁরা রাত জেগে পড়তেন। কি কঠোর শ্রম করতেন তাঁরা। লেখাপড়ার প্রতি কি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল তাঁদের কাজের আছিলা করে—একদিনও পড়াশুনায় অবহেলা করেন নি। কি বিপুল উৎসাহে সংসারের কাজের সঙ্গে লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন, হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোয় বসে পড়েছেন। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে তবু আবার চোখে মুখে জল দিয়ে পুনরায় এসে বসে পড়া তৈরী করেছেন। দুপুরের যৎসামান্য বিশ্রামের সময়টুকুও বিশ্রাম না করে—সকলে একত্রে বসে পড়া তৈরী করেছেন, সূচীশিল্প প্রভৃতি করে কাটিয়েছেন। কি করে পরীক্ষায় সকলের চাইতে ভাল ফল করা যায় আমার মায়ের এই ছিল একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান।”

চতুর্থ অধ্যায়

জন্ম

এইভাবে শিক্ষা আরম্ভ করে শ্যামমোহিনীর মাতা গোবিন্দময়ী স্বামীর কর্মস্থল রাজসাহীতে চলে এলেন। আর এইখানেই তাঁর পড়াশুনার ইতি। বিবাহের সাত বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে ষোল বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু ছেলেটি মারা যায়। দ্বিতীয় কন্যা-সন্তানটি জন্মগ্রহণ করে ১৮৮৭ সালে। সাত বৎসর বয়সে সেও মারা যায়। এরপর ১৮৮৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী মহীয়সী শ্যামমোহিনীর জন্ম হয় বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার সহবৎপুর গ্রামে মাতুলালয়ে। তাঁর জন্মক্ষণটি ছিল সচরাচর মহান্ ব্যক্তিদের জন্মের মতই তাৎপর্যপূর্ণ। তখন তাঁর মায়ের বয়স মাত্র বাইশ বৎসর।

আশ্চর্য সে ঘটনা যার মধ্যে শ্যামমোহিনীর জন্ম হল। আসন্নপ্রসবা মাতা গোবিন্দময়ী পিতৃগৃহে আছেন। তৎকালীন সংস্কার অনুযায়ী আঁতুড়ঘর যথারীতি বাড়ীর বাইরে স্বতন্ত্র স্থানে করা হয়েছে। অস্থায়ী আঁতুড়ঘর বাড়ীর ছোঁয়া বাঁচিয়ে এমনভাবে করা হয় যে, আঁতুড় উঠে গেলে যাতে তৎক্ষণাৎ সে ঘর ভেঙে ফেলা যায়।

সেদিনটায় ছিল শীতের উজ্জ্বল মিষ্টি আমেজ। পরিষ্কার আকাশ, স্বচ্ছ-সুন্দর আবহাওয়া। প্রসবযন্ত্রণায় গোবিন্দময়ী কাতর। সব ব্যবস্থা ঠিক আছে জেনে নিশ্চিন্ত সকলে। কিন্তু অকস্মাৎ কোথা থেকে কালো মেঘে চারিদিক ছেয়ে গেল। প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার সাথে প্রবল বারি বর্ষণ আরম্ভ হল। সমস্ত ছোঁয়া বাঁচিয়ে যে আঁতুড়ঘর এক নিরাপদ স্থানে করা হয়েছিল, প্রলয়ঙ্কর সে ঝড়জলের দাপটে মুহূর্তে তা ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে নিকটস্থ লৌহজঙ্ঘ নদীতে মিশে কোথায় ভেসে চলল কে জানে। থেকে থেকে গুরু গুরু মেঘ গর্জন—

বিদ্যুৎ চমকানো—বজ্রপাত, প্রবল বর্ষণ সমানে চলল। শ্যামমোহিনীকে যে তাঁর জীবনে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বহন করতে হবে তার সূচনা তাঁর জন্মক্ষণেই দেখা গেল। তিনি দরদালানেই জন্মগ্রহণ করলেন। বিধাতা যাঁকে দিয়ে তাঁর মহৎ কার্য করাবেন তাঁকে এভাবেই স্বাগত জানালেন। তাঁকে অবজ্ঞা করবে কে? কে তাঁকে রুখবে সংস্কারের বাঁধনে বেঁধে। এ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তৎকালীন সমাজের বুকে মূলতঃ পাঁচটি কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর চাপা ছিল—যার তিনটি মেয়েদের উপর আরোপিত ছিল—পূর্বেই আলোচনা করেছি। সে কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করতে হবে। সমাজ তথা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ব্রত গ্রহণ করতে হবে শ্যামমোহিনীকে। তাৎপর্যপূর্ণ এই জন্মক্ষণটি যেন তারই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বহন করে।

মাতার নিকট হতে শোনা তাৎপর্যপূর্ণ জন্মদিনটি আজও শ্যামমোহিনীর মনের মুকুরে ভেসে উঠল। "নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের নিশ্চিত কোনো অভিপ্রায় ছিল আমাকে দিয়ে—জন্মমুহূর্তে এ ঘটনা, পরবর্তীকালে স্বামী হারানো প্রভৃতি ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে এ ছিল যেন তারই পূর্বাভাস—কিন্তু আমি কি পরম কারুণিকের সে অভিলাষ পূর্ণ করতে পেরেছি। দীর্ঘজীবন শিক্ষাবিস্তারে বিপুল কর্মানুষ্ঠানে কেটে গেল। এখন ওপারের ডাক এসে গেছে—চলেও যাব সেখানে শীঘ্র হয়তো—জীবনের অনিবার্য পরিণতি বিধির বিধানে—যেখানে আমার স্বামী আমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। কিন্তু আমি কি আমার উপর আরোপিত কর্ম সাধন করতে পেরেছি?" একটু থেমে তিনি পুনরায় বললেন, "তবে হ্যাঁ, চেষ্টার ত্রুটি করি নি। আমৃত্যু সে সাধনা করে যাব। ঈশ্বরের অহেতুক এ অনুগ্রহ বৃথা হয়েছে কিনা কালে তা বিচার করবে। আমার কর্ম করার কর্ম করেছি।" বলেই তিনি, ভবতোষ ভট্টাচার্য নামে পরিষদের এক নিষ্ঠাবান কর্মী আসাতেই পরিষদের কাজে নিমগ্ন হলেন। ভুলে গেলেন তিনি আমার সঙ্গে স্মৃতিচারণের কথা। "আজ আর হবে না"—বলে তিনি

পরিষদের হিসাবপত্র দেখতে থাকলেন। স্বল্পবাক্ এই সাধিকার এটাই অটুট সিদ্ধান্ত। আজ আর হবে না—অতএব কথা না বাড়িয়ে আমিও চলে এলাম। যাক্ যা বলছিলাম—

আঁতুড়ঘর তো ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু মাতা গোবিন্দময়ী যে প্রসববেদনায় অস্থির। এখন উপায়! সমস্ত সংস্কারের জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হলেন দিদিমা-স্থানীয়ারা। অন্দরমহলের শয়নকক্ষেই জন্ম হল শ্যামমোহিনীর। উপায়ান্তর না দেখে শ্যামমোহিনার মাতামহীর মাতা দুর্গাসুন্দরী বললেন, 'রাজেন্দ্রানী এলেন কিনা, তিনি কেন মূলীবাঁশের বেড়ায় ছাওয়া মাটির ঘরে জন্ম নেবেন—তাইতো কোথাও কিছু নেই—ঝড়জল এলো—আঁতুড়ঘর ভাসিয়ে নিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করল—তাই একেবারে অন্দরমহলে অট্টালিকায় ভুবন আলো করে এলেন! নাতনীকে উদ্দেশ করে বললেন, গোবিন্দ, তুই দেখে নিস—এ মেয়ে কিছু একটা হবে তোর; কোন সংস্কার রাখল না যখন। জন্মের এ ব্যতিক্রম, ঈশ্বরের নিশ্চিত কোনো অভিপ্রায় রয়েছে—দেখে নিস্—দুঃখ করিস্ না মেয়ে হল বলে।'

কিন্তু মায়ের মন তবু বিষণ্ণ। শ্যামমোহিনীর জন্মের পূর্বে তাঁর এক দাদা হয়ে মারা যায়। তারপর এক দিদি। আবার কন্যা। কন্যার পর কন্যা, মা দুঃখ করে বললেন, কন্যার পর কন্যা হল আবার—এতে তাঁর বাবা তাঁর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'দেখো এ কন্যা আমাদের অনেক নাম করবে। ভাগ্যবতী হবে। পয়মন্ত কন্যা আমার।'

শ্যামমোহিনীর জন্মের পর তাঁর লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল পিতা পর পর কয়েকটি রাজষ্টেটের উকিল নিযুক্ত হন। এর মধ্যে তাহেরপুর, রাজসাহী জেলার পুটিয়া, নাটোর প্রভৃতি রাজষ্টেটগুলি উল্লেখযোগ্য। অঢেল টাকাপয়সা উপার্জন করতে থাকেন তিনি। এরপর মা গোবিন্দময়ীর আরো দুটি পুত্র-সন্তান হয়। এতে তিনি খুব খুশী হন। এখন আর তাঁর মনে কোন খেদ রইল না। বরং কন্যা খুব সৌভাগ্যবতী বলে তিনি মনে মনে বেশ গৌরব অনুভব করলেন।

এরপর শ্যামমোহিনীর কোষ্ঠি তৈরী করা হল। রাশিচক্র দিনক্ষণ মিলিয়ে কোষ্ঠিতেও উঠল এ কন্যা খুব পরোপকারী ও ভাগ্যবতী হবে। শ্যামমোহিনীর বাবার কাছে খুব নাম-করা জ্যোতিষীরা আসতেন। তারা একমাথা ঝাঁকড়া চুল, নাদুস-নুদুস, বয়স অনুযায়ী অত্যধিক গম্ভীর প্রকৃতির কন্যাটির হাত দেখে বললেন, 'আপনার মেয়ে বড় ভাগ্যবতী। খুব নাম করবে। দেখুন যাদববাবু, আপনার মুখখানা যেন বসান। পিতামুখী জগৎসুখী। নির্ঘাৎ এ মেয়ে খুব সুখী হবে, এর খুব নামযশ হবে।'

পরবর্তীকালে শ্যামমোহিনীকে একথার যথার্থতা ঠিক কিনা জিজ্ঞাসা করায় বললেন তিনি—"নিজের সুখ ছিল না বলে' ঘর-সংসার ছিল না বলেই তো এতবড় কাজ হয়েছে।" এত কাজ করতে পেরেছি।

পরে অনেক শুভার্থী বলেছেন, "তুমি ভাগ্যবতী—তোমার ভাগ্য সংসারের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে অন্যদিকে গেছে। বৃহৎ সংসারের মধ্যে তুমি খুঁজে পেয়েছ তোমার যা কিছু সুখ, যা কিছু আনন্দ।"

কালে এসব ভবিষ্যদ্বাণীর চাইতেও, শ্যামমোহিনীর জীবন মানব-কল্যাণে নারার দুর্দ্দশা-মোচনে সমাজ-সংস্কারে কিভাবে উৎসর্গীকৃত হয়ে সার্থকতায় ভরে উঠেছে সে কথাই আমার বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

মাতার এই মনস্তাপের কারণ—এদেশে তৎকালান সমাজে মেয়েদের আদৌ সমাদর ছিল না। মেয়েরা একটা বোঝাস্বরূপ ছিলেন। ছয় থেকে দশ বৎসরের মধ্যে তাদের বিবাহ অবশ্য কর্তব্য ছিল। না হলে সমাজে পিতামাতার অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হত। কাজেই মেয়েরা সংসারে আদৌ কাম্য ছিল না। সতীদাহ নিবারণ হবার পরও নারীসমাজকে কেন্দ্র করে বহু অবিচার কুবিচার ভারতে বিশেষতঃ বাংলাদেশে জগদ্দল পাথর হয়েই ছিল। নারী ছিল অসূর্য্যম্পশ্যা। নারীর কোন স্বাধিকারের প্রশ্ন তোলার অধিকার ছিল না।

শ্যামমোহিনীর মায়ের এজন্যে খেদ ছিল—ছেলে হলে তো আর পরের ঘরে দিতে হত না। মেয়েদের দিয়ে সংসারে কোন উন্নতি হয় না।

শ্যামমোহিনীর বাবা-মা আদর করে মেয়ের নাম রাখলেন শ্যামমোহিনী। কন্যার গায়ের রঙ শ্যামল বলেই বোধহয় তাঁরা এই নাম রাখেন। শ্যামমোহিনীর পিতাও একজন প্রকৃত সমাজহিতৈষী ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গ্রামে গ্রামে ছেলেদের স্কুলও তেমন ছিল না। পাঁচ-ছ'টি গ্রামের মধ্যে হয়তো একটি গ্রামে একটি স্কুল বা পাঠশালা ছিল। ফলে ব্যাপক শিক্ষার তেমন সুযোগ ছিল না। শ্যামমোহিনীর পিতা এজন্যে তাঁর রাজসাহীর বাসায় বহির্বাটিতে বিরাট চারটি ঘরে ৬০।৭০ জন গরীব ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান দিয়ে তাদের পড়াশুনার সুযোগসুবিধা করে দেন। এছাড়া কিছুসংখ্যক গরীব মসীজীবী ও মুহুরী তাঁর বাড়ীতে আহার ও বাসস্থান পেত। জীবনে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন কিন্তু সবই পরহিতে ব্যয় করেছেন। কিছু সঞ্চয় করেন নি।

অধ্যয়নের নেশা

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল থলথলে চেহারা, মাথায় একরাশ ঘন কালো ঝাঁকড়া চুল, সমস্ত চোখেমুখে প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য এই ছোট্ট মেয়ে শ্যামমোহিনীকে কিন্তু এই সব ছাত্র অত্যন্ত স্নেহ করত। তারপর ধীরে ধীরে মায়ের কাছ থেকে যখন শ্যামমোহিনীর অক্ষর পরিচয় হল, —ছাত্রেরা লাইব্রেরী থেকে বই আনত এবং শ্যামমোহিনীকে দিত—আর সেই থেকে অদম্য জ্ঞানপিপাসু শ্যামমোহিনীর বই পড়ার বাতিক সুরু হয়। অবশ্য এই গুণ তিনি মায়ের নিকট হতে পেয়েছিলেন। আর এই বাতিক তাঁর এই ছিয়াশী বৎসর বয়সেও পুর্ণোদ্যমে চলেছে। হাজার কাজের মধ্যে তিনি গভীর নিশীথে বই ও খবরের কাগজ নিয়ে বসেন। এ তাঁর নিত্যকার রুটিনভুক্ত কাজ। এর ব্যতিক্রম তাঁর জীবনে খুব কম দেখা যায়।

শিক্ষা

বাবার কাছারীতে বহু লোকের সমাগম হোত। শ্যামমোহিনী কাছারী ঘরে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকত। বাবার মক্কেলরা কেউ কেউ ছোট্ট বুদ্ধিদৃপ্ত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়েটিকে আদর করত। কিন্তু ছোট্ট মেয়েটি কৌতূহল নিয়ে দেখত তাদের। পৌষমাসে যখন লাটের খাজনা দিতে দীঘাপতিয়ার রাজষ্টেট থেকে কর্মচারীরা হাতীর পিঠে চড়ে আসত, তখন তা দেখে শ্যামমোহিনীর শিশুমনে কৌতূহলমিশ্রিত যে কি ভাবের উদয় হত তা সেই জানত। বাবা যে তাঁকে খুব ভালোবাসতেন তার প্রমাণ তিনি কন্যাটিকে সঙ্গে করে হাতীর পিঠে চড়িয়ে দীঘাপতিয়া রাজবাড়ীতে নিয়ে যেতেন। আর পুনঃ পুনঃ বলতেন, আমার পয়মন্ত কপালে মেয়ে।

বাবা নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু মার সবসময় লেখাপড়ার প্রতি অদম্য আগ্রহ। তৎকালে তিনি রীতিমত শিক্ষিতা ছিলেন। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। স্বভাবতঃই শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি একদিনও মেয়েটিকে স্কুল কামাই করতে দিতেন না। মেয়ে হয়তো স্কুলে যাবে না, বলল, মা, মাগো, অনেকেই তো কত কামাই করে—মেয়েকে কথা শেষ করতে দেন না। মা বলেন, তুই কেন কামাই করবি, অসুখ করলে কামাই করবি। এমনি ছিল মেয়ের লেখাপড়ার দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি।

১৮৯৩ সালে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে শ্যামমোহিনী স্কুলে ভর্তি হয়। স্কুলটির নাম রাজা প্রমথনাথ বালিকা বিদ্যালয়। ব্যাপক স্ত্রীশিক্ষার তখনও বিশেষ ব্যবস্থা হয় নি। কলকাতাও দু'-একটি বিশেষ সহরে তখনও তা সীমাবদ্ধ ছিল। শ্যামমোহিনী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ—

"১৮৯৩ সাল। আমার বয়স তখন সবে পাঁচ বৎসর। রাজসাহীতে বাবার কাছে থাকি। কিন্তু রাজসাহীতে তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বিশেষ ছিল না। অল্প কিছুদিন পূর্বে সম্ভবতঃ ১৮৮০ সালের

কাছাকাছি তথায় দুটি মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। একটি প্রমথনাথ বালিকা বিদ্যালয়। এখানে ছাত্রবৃত্তি (ষষ্ঠ শ্রেণী) পর্যন্ত পড়ান হত এবং অন্যটি মিশনারী স্কুল। এখানে উচ্চ প্রাইমারী পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা ছিল। কোনটাতেই ৫০।৬০ জনের বেশী ছাত্রী ছিল না। রাজার স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন ব্রহ্মানন্দ চক্রবর্তী মশায়। ইনি একাই দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াতেন এবং শিশু শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াতেন গুরুমা মুক্তাসুন্দরী সাহা। এই স্কুলেই স্থানীয় অভিজাত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকগণের মেয়েরা পড়ত। তখন মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল। ১০।১১ বৎসরের বেশী বয়স হলে আর মেয়েদের রাস্তায় বের হবার নিয়ম ছিল না। মহিলাগণ ঘোড়ার গাড়ী বা পাল্কীতে যাতায়াত করতেন। সর্বসাকুল্যে ২।৩ বৎসর মাত্র মেয়েরা স্কুলে পড়ার সুযোগ পেত। এই জন্যে সহর ছাড়া যত স্কুল স্থাপিত হচ্ছিল মেয়েদের শিক্ষার জন্যে—ছাত্রীর অভাবে তা প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।”

এইদিক থেকে ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক সুদূরপ্রসারী ফল প্রদান করে। এখন আমরা তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীর স্থান সংক্ষেপে আলোচনা করে দেখি।

নবম বর্ষে পদার্পণ করেছে কন্যা তবু বিয়ে হয় নি। বাপ-মা বিশেষ করে পাড়া-পড়শী ও এক শ্রেণীর সমাজপতিদের কাজ ছিল শুধু কুসংস্কারগুলি আঁকড়ে থাকা আর তার কোন ব্যতিক্রম দেখলে প্রবল প্রতাপে তার বিরুদ্ধাচরণ করা। অমুকের নয় বৎসরের কন্যার বিবাহ হয় নি—জাতজন্ম রইল না—সমাজ-সামাজিকতা রসাতলে গেল বলে তাঁরা সিংহগর্জনে সমালোচনা করতেন। আর সেই নবম বৎসরের কন্যা জানালা দিয়ে কখনও বাইরের দিকে তাকিয়ে উন্মুক্ত আকাশ দেখবে—বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে—বাপরে সে এক অমার্জনীয় অপরাধ! মা বা গুরুস্থানীয়া কেউ ঠাস করে এক চড় কষে লাগাল—বাইরে হাঁ করে কি দেখা হচ্ছে শুনি। যমেও নেয় না—বিয়ের পাত্র

মেলে না একে, আবার তলে তলে মেয়ের গুণ বাড়ছে। নবম বৎসরের কন্যাকে বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের পুণ্য লাভ হবে বাপ-মা এই স্বপ্ন দেখতেন। তৎসত্ত্বেও তৎকালে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত যারা তারা মেয়েদের শিক্ষার প্রতি নজর দিতে সুরু করেছেন। শ্যামমোহিনী তাঁর উচ্চশিক্ষিতা মাতার অভিলাষ অচিরেই পূর্ণ করলেন। তিনি কেবল উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন না—পরীক্ষায় গোটা রাজসাহী বিভাগের (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করলেন।

পল্লীতে সে যুগে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষাই ছিল স্ত্রীশিক্ষার সর্বোচ্চ সীমারেখা। এর ব্যতিক্রম ছিল বড় বড় সহরে। শ্যামমোহিনীর পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের খবর চারদিকে রটে যায়।

একে উচ্চ প্রাথমিক পাশ, তদুপরি আবার সমগ্র রাজসাহী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ও বৃত্তিলাভ—এটা সর্বত্র আলোচিত হতে থাকে, ছেলেমেয়ে ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রচুর প্রেরণা দান করে। ছাত্রী অবস্থায় তিনি যেমন প্রেরণার উৎস ছিলেন কর্মক্ষেত্রেও তিনি তেমনি প্রেরণাদাত্রী। কেন, সে কথায় পরে আসছি।

পড়ানোর বাতিক

ছাত্রী অবস্থা থেকে শ্যামমোহিনীর পড়ানোর বাতিক আছে। শ্যামমোহিনীর নিজের কথায় প্রকাশ, "রাজসাহীতে থেকে পড়াশুনা করি তখন। পাশের বাসায় এক বৃদ্ধা আমার মায়ের নিকট রামায়ণ-মহাভারত পড়া শুনতে আসতেন। কখনও কখনও আমাকেও পড়ে শোনাতে বলতেন। তিনি নিজে পড়তে না পারায় আমাকে ধরে বলতেন, 'খুকি, তুমি তো স্কুলে পড়ছ, আমাকে পড়তে শেখাও, যাতে আমি কেবল নিজে রামায়ণ-মহাভারত পড়তে পারি।' রোজ পড়িয়ে পড়িয়ে অল্পদিনের মধ্যেই সেই বৃদ্ধাকে পড়তে শেখাই। তিনি

রামায়ণ-মহাভারত পড়তে পেরে আমার অশেষ সুখ্যাতি করে' আশীর্বাদ করেন।"

শৈশবে খুব সর্দিকাশিতে ভুগতেন শ্যামমোহিনী। রাত জেগে মা তাঁর বুকে পিঠে সেঁক দিতেন আর শরীর সুস্থ রেখে কিভাবে লেখা-পড়া করতে হবে সে-বিষয়ে উপদেশ দিতেন। বলতেন, মনোযোগ দিয়ে বিদ্যাভ্যাস করতে হবে। প্রকৃত বিদ্যার্জনই হচ্ছে জীবনের ভিত্তি গঠনের সহায়ক। তিনি মুখে মুখে অনেক পড়া বলে দিতেন। মেয়েকে কৃতী দেখতে চান মা। এজন্য মেয়েকে ঐকান্তিক চেষ্টার দ্বারা প্রকৃত বিদ্যার্জন করতে হবে। ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, দুঃখবরণ, সচ্চিন্তা, সদ্ভাব, পরোপকার এই সব গুণে মেয়েকে বিভূষিতা করতে চান মা। মাতার এই প্রেরণাকে কৃতজ্ঞচিত্তে আজও স্মরণ করেন শ্যামমোহিনী। "মা, বাবা বিদ্বান হওয়া ভাগ্যের কথা। ঐ সব দেখলে স্বভাবতঃই বড় হবার প্রেরণা জাগে। যখন আমরা ভাইবোনেরা লেখাপড়া শিখি নি তখন মা রামায়ণ-মহাভারত ও আরো অনেক বই পড়ে শোনাতেন। উদ্‌গ্রীব উৎসুক হয়ে থাকতাম আমরা। কিন্তু শেষে আর মন ভরত না—তখন শুধু মনে হত কখন নিজেরা লেখাপড়া শিখব আর পড়তে পারব। রামায়ণ-মহাভারতের বহু চরিত্র মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করত। 'সীতার বনবাস', 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' প্রভৃতি ঘটনা মনে গভীর রেখাপাত করত।"

যদিও শ্যামমোহিনীর পিতা ওকালতী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, কিন্তু সেই বিপুল অর্থ কেবল জনহিতকর কার্যে, পরার্থে ও নানা প্রকার মঙ্গলকার্যে ব্যয় করেছেন।

পিতার কথা মনে হতেই শৈশবের আর একটি অনাবিল স্মৃতি শ্যামমোহিনীর মনে গভীর প্রভাব ফেলে। আজও সেই স্মৃতি মনে ক'রে বিমল আনন্দে তাঁর মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সমস্ত দেহমনে একটি অনির্বচনীয় পুলক অনুভব করলেন তিনি।

"আমার বাবা প্রতি বৎসর গ্রামে দুর্গোৎসব করতেন। এই

উপলক্ষে রাজসাহী থেকে পূজোর ছুটিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনখানি নৌকা ভাড়া করে আমাদের নিয়ে পাবনার করঞ্জা গ্রামের বাড়ীতে আসতেন। এই নৌকা তিনখানিতে ভর্তি থাকত আত্মীয়-স্বজন ও আমাদের বাসার সব ছাত্র ও অন্যান্য লোক।

তিনখানি নৌকার খোল বোঝাই থাকত পূজোর উপকরণ দিয়ে। কোনো নৌকায় চল্লিশ পঞ্চাশ কলসী ভর্তি শুধু কেবল গঙ্গা জল। কোনো নৌকার খোলে পূজোর বলীর জন্য পাঁঠা। কোনো নৌকায় পূজার ভোগের জন্যে রাজসাহীর শালীধানের উৎকৃষ্ট আতপ চাল, উৎকৃষ্ট মুগ, মটর, ছোলা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। দু'তিন টিন ভর্তি গাওয়া ঘি—পাঁচ ছয় টিন খাঁটি সরিষার তেল—কয়েক বস্তা চিনি—নানাবিধ মসলা—প্রতিমা সাজানো ডাকের সাজ ইত্যাদি। নানাবিধ দ্রব্য নিয়ে তিনি পূজোর অভিযান আরম্ভ করতেন। সে যুগে সর্বত্র রেলগাড়ী ছিল না। এ ছাড়া এত জিনিসপত্তর নিয়ে রেলগাড়ীতে না গিয়ে নৌকাতে যাওয়াই ভাল মনে করতেন বাবা। নৌকা চলত পদ্মা, বরল নদী ও চলন বিলের মধ্য দিয়ে। ভাটার জলে বাড়ী পৌঁছাতে তিন দিন লাগত। কিন্তু ফেরার সময় উজান বেয়ে আসতে হত—পাঁচদিন নৌকায় কাটাতে হত। সে যে কী অবর্ণনীয় আনন্দ, কেবল আনন্দ, আজও মনে পড়ে।

প্রকাণ্ড নৌকার ছইয়ের উপরে বসতেন বয়স্ক দাদারা। আমরা ছোটরা উঠতে চাইলে তাঁরা আমাদের তুলে নিতেন। মা-দিদিরা ভয়ে শিউরে উঠতেন, ওরে পড়ে যাবে—নদীতে পড়ে যাবে—নামিয়ে দে, নামিয়ে দে। না, পড়ব না বলে দাদাদের ধরে বসে দেখতাম—কুল-কুল ধ্বনিতে পদ্মা নদী বয়ে চলেছে। মাঝে মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ তুলে ঘূর্ণ তৈরী হত জায়গায় জায়গায়। তখন মাঝিরা অতি সন্তর্পণে সেই ঘূর্ণি এড়িয়ে চলত। ঘূর্ণিতে একবার যার নৌকা পড়বে তার আর রক্ষা নেই। নৌকা-ডুবি হবেই।

পদ্মা নদীর কোনো পাড় হয়ত ভেঙ্গে পড়ল। শুধু জল আর জল।

অদম্য কৌতূহল শিশুমনে। কোন্‌দিক রেখে কোন্‌দিক দেখি। আরো যে সব নৌকা যেত—চিৎকার করে উঠতাম আমরা—ও মাঝি, আমাদের নৌকা আগে নিয়ে চলো। চিক্ চিক্ রোদ নদীর জলে পড়ে সে এক অপূর্ব শোভা হত। ঢেউগুলি ফুলে ফেঁপে উঠে গর্জন করতে থাকত। কোনো নৌকার মাঝি গান ধরত, "ওরে আমার মন, ভাটি বাইয়া পাবা না রে উজান বাইয়া যাও রে আমার মন—জয় জয় রাধার নামে বাদামরে দিয়ে হাত দে বাইয়া যাও রে আমার মন, ওরে আমার ম···ন"—বলে এমন টান দিত যে, মন কেড়ে নিত।

সব চাইতে আনন্দ হত যখন নৌকা থামিয়ে অন্য নৌকার মাঝিদের কাছ থেকে বিরাট বিরাট মাছ কেনা হত। তারপর রান্না হত আমাদের নৌকার মাঝিদের উনুনে।

আমার বাবা ভাল রান্না করতে পারতেন। তিনি নিজ হাতে মাছ রান্না করতেন। তারপর রান্না শেষে মাঝিদের বলা হত একটা পরিষ্কার চর দেখে নৌকা থামাতে।

সব চাইতে আনন্দ হত যখন চরে নামতে পেতাম। কি যে ছোটাছুটি হুটোপুটি করতাম। আজকাল যাকে চড়ুইভাতি বলে তেমনি তিন নৌকা বোঝাই লোকজন মিলে আনন্দ করে খাওয়া, সে এক ভারী মজার ভুরি-ভোজ। কেবল মাছ আর মাছ। কে কত খাবে।

তারপর আবার নৌকায় চড়া। আবার চলল নৌকা। পদ্মা নদী পার হয়ে বরল নদী তারপর চলল বিলের মধ্য দিয়ে। একটা বৈরাগ্য ভাব জাগত মনে। পৃথিবীতে যে তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল, শৈশবে ভূগোল পড়তে গিয়ে আমার কাছে নতুন কিছু মনে হয় নি। আর কেবল মনে হয়েছে। সমুদ্র না-জানি কত বড়—সব নদীই তো সমুদ্রে গিয়ে মিশে। সে সমুদ্র না-জানি কত প্রকাণ্ড। চলন বিল সম্বন্ধে কত কাহিনীই না শুনেছি। বড় বড় পাথর উঠত নাকি এই বিল থেকে।

অবিরাম জলের উপরে চলে যারা তাদের নাকি বিবাগী মন হয়। আধ্যাত্মিক বৈরাগ্যে ভরা মন হয় তাদের। মাঝিদের ভাটিয়ালী সঙ্গীতগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রতি বৎসর বাড়ী আসার সময় তিন দিন, ফেরার সময় পাঁচ দিন লাগত—নৌকোয় গৃহস্থালী পাতা, সে এক গভীর বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনা মনকে যেন উদাস করে দিত। ছইয়ের উপরে কখনও নৌকোর পাটাতনের উপর বসে কখনও মায়ের কোলে, বাবার আদরে সে কী অনাবিল আনন্দ। মাথার উপরে সীমাহীন উন্মুক্ত নীলাকাশ, নিম্নে প্রকাণ্ড অতল কূলকিনারাবিহীন নদী বয়ে চলেছে আর আমরা সেই নদীর উপর ক্ষুদ্র নৌকোয় চড়ে এ আমরা কোথায় অজানা কোন স্বপ্নরাজ্যে চলেছি—কত ভাবনাই যে শিশুমনে মুহূর্তে উদয় হয়ে লয় হ'ত।

তারপর বাড়ী পৌঁছাতে গ্রাম উজাড় করে কত লোকই না আসত। সে কী কর্মচাঞ্চল্য—পূজাপ্যাণ্ডেল বাঁধা, প্রতিমা আনার ব্যবস্থা প্রভৃতি সে এক মহা ধূমধাম লেগে যেত। উৎসবমুখর পূজার দিনগুলি কোথা দিয়ে কেটে যেত। পূজা উপলক্ষে বাবা গ্রামের গরীব মানুষ আর পুরোহিতদের দান-ধ্যান করতেন। সংবৎসরে ব্যয়ের পরে উদ্বৃত্ত সমস্ত টাকা তিনি অকাতরে দান করতেন। আত্মীয় পরিজনে বাড়ী গমগম করত পূজার যে কটা দিন আমরা গ্রামের বাড়ীতে থাকতাম। বিরাট মহোৎসব লেগে থাকত।

এখন আবার ফেরার পালা। আবার সকলে মিলে নৌকোয় রওনা হলাম। উজান বেয়ে ফেরার সময় অন্ততঃ দুদিন বেশী লাগত। পাঁচদিন নৌকোয় ঘর-গৃহস্থালী, স্নান-রান্না-খাওয়া সব কিছু। এভাবে বাবা স্বেচ্ছায় সর্বস্বান্ত হয়ে কর্মস্থলে ফিরে এসে ওকালতী ব্যবসায়ে মন দিতেন। আবার অগাধ টাকা উপার্জন করে তা ছাত্র ও আশ্রিত লোকজন নিয়ে ব্যয় করতেন। ভবিষ্যতের জন্য তেমন কোনো সঞ্চয় করতেন না তিনি। অকস্মাৎ বাবা মারা গেলেন। নাবালক ছেলেমেয়ে আমরা। আমাদের নিয়ে মাকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়।

শ্যামমোহিনীই এখন ভাইবোনদের মধ্যে বড়। যদিও সংখ্যায় ওঁরা ছিলেন সাত ভাইবোন। কিন্তু শ্যামমোহিনীর পূর্বে এক দাদা ছিলেন, তিনি জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। আর এক দিদি সরযূ, তিনিও সাত বৎসর বয়সে মারা যান। জীবিত চার ভাইবোনের মধ্যে শ্যামমোহিনী বড়, তাঁর পরে তিন ভাই—রাজেন, বীরেন ও উপেন। সব চাইতে ছোট্ট হ'ল বোনটি; তার নামকরণ হবার পূর্বেই অর্থাৎ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও মারা যায়।

পিতার মৃত্যু

১৮৯৮ সাল। শ্যামমোহিনীর পিতা যাদবচন্দ্র হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হঠাৎই তাঁর পায়খানা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেল। বিখ্যাত সব চিকিৎসক ডাকা হল। চিকিৎসকের নিকট যাদবচন্দ্রের একটিমাত্র আকুল আবেদন তখন—"ডাক্তারবাবু, আমি কন্যাদায়গ্রস্ত। দশ বৎসরের বিবাহযোগ্যা কন্যা আমার ঘাড়ে—আপনারা আমাকে সারিয়ে তুলুন, যাতে কন্যাটিকে পাত্রস্থ করে যেতে পারি।" কিন্তু চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে মাত্র ছয়-সাতদিন রোগ ভোগের পর যাদবচন্দ্র ঐ বৎসর মারা যান। নিয়তি তাঁর আকুল আবেদন শুনলেন না—তাঁর কন্যাকে পাত্রস্থ করার সুযোগ দিলেন না। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে দশ বৎসরের কন্যা ও নাবালক পুত্রদের নিয়ে গোবিন্দময়ী অত্যন্ত বিচলিতা হয়ে পড়েন। এতদিন রাজসাহীর বাড়ীতে ষাটসত্তর জন ছাত্র, কেরানী, মুহুরী যারা শ্যামমোহিনীর পিতার উপর নির্ভর করে লেখাপড়া ও জীবিকার সংস্থান করছিল তাদেরও নিকট যাদবচন্দ্রের মৃত্যু বিপর্যয়রূপে দেখা দিল। নিরুপায় হয়ে তারা একে একে অন্যত্র চলে গেল। কিন্তু গোবিন্দময়ী এই ভাগ্যবিপর্যয়ের আকস্মিকতায় প্রথমে খুব ভেঙে পড়লেও অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও বৈষয়িক ব্যাপারে জ্ঞানী বলে শক্তহাতে সংসারের হাল ধরলেন।

সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা

অতিথিবৎসল প্রজাপালক শ্যামমোহিনীর পিতা বাড়ীঘর করার দিকে তেমন নজর দিতে পারেন নি। এর কারণ হয়তো এই হতে পারে যে, তৎকালীন সমাজের ধনী জমিদার ও রাজা-মহারাজার ধনদৌলতের বৃহৎ একটি অংশের উপর সাধারণ মানুষের দাবী আছে—একথা তিনি অন্তরে নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিলেন। সেই মত শিক্ষা-সংস্কৃতি, পূজা-পার্বণ, জলসরবরাহ, চিকিৎসা প্রভৃতি সমাজ-সেবামূলক কার্যে তাঁর অর্জিত অর্থ-সম্পদের বৃহৎ অংশ ব্যয় করতেন। ফলে পরিবার-পরিজন, ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তেমন চিন্তা ছিল না তাঁর। কিন্তু পরার্থে আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের যে নিদর্শন রেখে গেছেন তিনি ও তাঁর পূর্বপুরুষগণ—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেই প্রভূত গুণের অধিকারিণী নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা শ্যামমোহিনী আজীবন তাঁদেরই পথ অনুসরণ করে চলেছেন। বরং বলা যায়, পূর্বপুরুষদের চাইতেও কতিপয় ধাপ তিনি ইতোমধ্যে এগিয়ে গেছেন। কারণ নিজের বলতে কিছু রাখেন নি তিনি। স্বীয় সুখের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। কেবল কিসে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের ও কর্মীদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধান করা যায়, প্রতিষ্ঠানটিকে বড় করে তোলা যায় অনবরত এই চিন্তায় ধ্যানস্থ তিনি। কয়েক কোটি টাকা মূল্যের যাবতীয় সম্পত্তি ইতোমধ্যে দানপত্র সম্পাদন করে তিনি পরিষদের নামে লিখে দিয়েছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে কিছু কোথাও রাখেন নি তিনি। শ্যামমোহিনীর এই ত্যাগপূত জীবনের তুলনা হয় না। এইখানে তিনি যথার্থই অতুলনীয়া, অনন্যা।

সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা থেকে শ্যামমোহিনী কদাপি বিচ্যুত হন নি। পিতা-পিতামহ মাতুল-মাতামহ প্রত্যেকেই জমিদার ছিলেন, জমিদার ঘরের বউ তিনি অনায়াসে ভোগবিলাসে নিমগ্ন থাকতে পারতেন, কিন্তু সেদিকে তাঁর আদৌ ভ্রূক্ষেপ নেই। বৈধব্যজীবনের

সুরু থেকে তিনি অতি সাধারণ সাদা থান ধুতি ও সেমিজ পরেই গোটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। বর্তমানে না হয় তাঁর বয়স ছিয়াশী বৎসর, কিন্তু স্বামী হারানোর পর থেকেই অর্থাৎ ১৬ বৎসর বয়স থেকে এভাবে কৈশোর কেটে গেল, যৌবনও কেটে গেল—প্রৌঢ় বয়সও অতিক্রান্ত হয়েছে। আজ এই অশীতিপর বয়স পর্যন্ত ঐ একই সাজে তাঁকে দেখা যায়। এর ব্যতিক্রম কেউ কখনও দেখেনি। ছেলেদের মত মাথার চুল ছোট করে ছেঁটে ফেলেছেন—যাতে চুলের ঝঞ্ঝাটে সময় নষ্ট না হয় সেজন্য তা পরিপাটি করে বাঁধাছাদার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

শোনা যায়, এই রকম পুরুষালী পোষাকপরিচ্ছদ পরা ও ছেলেদের মত (আধুনিক ছেলেদের মত নয়—যাদের মাথার লম্বা চুল দেখে ছেলে কি মেয়ে বোঝা যায় না) ছোট করে চুল ছাঁটা শ্যামমোহিনীকে একবার ভুল করে এক মহিলাই ট্রামের লেডিস সিট ছেড়ে দেবার জন্য বলেছিলেন, "এই যে শুনুন, লেডিস সিট এটা, লেডিস সিট ছেড়ে দিন।" শ্যামমোহিনীর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা তাঁর আহার নিদ্রা শয়ন চলন বলন দেখে স্বতঃই একটি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনীর অনুপম রূপই আমাদের সম্মুখে মূর্ত হয়ে উঠে। হিন্দুঘরের বিধবা তিনি—তার সর্বরকম নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলেন। বিধবা হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কি পোষাক-পরিচ্ছদে কি আহারে কি নিদ্রায় যাবতীয় ব্যাপারে সহজাত স্বকীয়তায় ভাস্বর তিনি স্বেচ্ছায় সানন্দে কৃচ্ছ্রসাধন করে চলেছেন। সামান্য উপাধানে সামান্য কাষ্ঠশয্যায় শয়ন করেন যেমনি, তেমনি একখানা কাষ্ঠনির্মিত ছোট্ট উঁচু পিড়িতে নির্জনে বসে সাত্বিক আহার করেন শ্যামমোহিনী। পোষাক-পরিচ্ছদের মতই আহার অতি সাধারণ আর বাহুল্যবর্জিত। ভারতীয় কৃষ্টিসভ্যতার মত ভারতীয় ভেষজের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি দৈনিক নিয়মিত অনুপানসহ কবিরাজী ওষুধ মকরধ্বজ সেবন করেন।

সতীধর্মের মূর্ত প্রতীক শ্যামমোহিনী

শ্যামমোহিনীর আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রতি তাঁর গভীর আস্থা দেখা যায়। হিন্দু-নারীর আদর্শ সতীধর্ম ত্যাগসহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি ও সতীধর্মের গরিমার দৃষ্টান্ত শ্যামমোহিনীর জীবনের পরতে পরতে পরিস্ফুট।

সতীধর্মের মহত্ত্ব তাঁর চিরন্তন সত্য—যা উপরে উল্লেখ করেছি সেই চিরন্তন সত্যের বীজ শ্যামমোহিনীর জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত আছে যেন। একটু অনুধাবন করলেই ধী-শক্তিসম্পন্না শ্যামমোহিনীর জীবনচর্যার মধ্যে সেই চিরন্তন সত্যের পূর্ণবিকাশ যে কেউ দেখতে পাবেন।

এ কথা সত্য প্রাচীন হিন্দুধর্মের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, কিন্তু তার মধ্যে যে গভীরতা আছে, পূর্ণতাপ্রাপ্তি আছে সে দুর্লভ প্রাপ্তির ক্ষমতাসম্পন্না শ্যামমোহিনীকে কোন বাধাই তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সংকল্পচ্যুত করতে পারে নি। এই আয়ুধে সজ্জিত বলেই না নিখিল ভারত নারী-শিক্ষা পরিষদের মত একটি মহতী প্রতিষ্ঠান গঠন করে অন্ধ কুসংস্কার ও অশিক্ষা দূর করে শত শত নারীকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন তিনি দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল। এ কাজে অকল্পনীয় তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, ত্যাগমাহাত্ম্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার চিরন্তন সত্যের দিকগুলি কেবল নিজের জীবনেই প্রয়োগ করেন নি শ্যামমোহিনী। এর প্রমাণ দিয়েছেন তিনি পরিষদ সংলগ্ন হাতার মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করে সেখানে নিত্য পূজাভোগারতি, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, সদাচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদির মধ্য দিয়ে। এই সব দেবদেবীর বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত জায়গাও রেখেছেন পরিষদ সংলগ্ন হাতার ভিতরে। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ তৈরী করে লোকশিক্ষার জন্য তাতে সমাজসেবামূলক নাটকাদি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। মঞ্চ-

সংলগ্ন মন্দিরে এই সব দেবদেবীর বিগ্রহাদির নিত্য পূজাপাট-হোম-যাগ-ভোগারতি প্রভৃতি তাঁর পরিষদের মেয়েরাই সম্পাদন করেন। এ ব্যাপারে ভারতীয় সংস্কৃতির যে ধারাটি তিনি বহন করে চলেছেন সে কথায় পরে আসছি।

প্রতিষ্ঠান গড়ার উপাদান

শ্যামমোহিনীর ৮৫তম জন্মজয়ন্তী দিনে (১৯৭৩, ১০ই ফেব্রুয়ারী) আমি নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের ন্যায় বিরাট এই প্রতিষ্ঠান গঠনের মূলে তাঁর অবদান জানতে চাইলে তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন ঃ

১। "কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে চাই মনপ্রাণ ঢেলে তা গড়ে তোলার আপ্রাণ প্রয়াস। চাই অসীম ধৈর্য, ঐকান্তিক ইচ্ছা আর নিরলস শ্রম। তবেই হবে তার সার্থক রূপায়ণ। টাকাটাই বড় কথা নয়।

২। ছোট থেকে আগাগোড়া কেবল ভেবেছি যে, যদি বড় প্রতিষ্ঠান করা যায় তা হলেই বড় কিছু করা যাবে। আর ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বাভাবিকভাবেই তা হয়ে গেছে।

৩। আয়ের মধ্যে ব্যয় করা আমার অভ্যাস। অধিকাংশই নিজের টাকা দিয়ে করেছি—কারো কাছ থেকে চাঁদা বা দান তেমন নেই নি।"

আমি প্রশ্ন করলাম—এতবড় বিরাট প্রতিষ্ঠান গঠন করতে গিয়ে কতরকম ঝক্কি-ঝামেলা আপনাকে পোহাতে হয়েছে কিন্তু কখনও কি বিরক্ত হয়ে একাজ ছেড়ে দেবেন ভাবেন নি? এ ছাড়া বিভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের লোকদের নিয়ে কারবার······?

মধুর স্নিগ্ধ হাসিতে শ্যামমোহিনীর মুখখানা উদ্ভাসিত হল। আমার দিকে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "নিজে ইচ্ছা করে যেটা সৃষ্টি করা যায় তাতে কি বিরক্তি আসে, তুইই বল দেখি?" উল্টে আমাকেই প্রশ্ন করলেন তিনি। আমি মৌন থেকে তাঁর দিকে

তাকিয়ে থাকি তাঁর পরবর্তী কথা শোনবার জন্য। তিনি বলতে থাকেন, 'আমার এই প্রতিষ্ঠানে কোনোদিন কারো সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই, কটুকথা নেই। আমি রাগ করলে ওরা রাগ করে না, আবার ওরা রাগ করলে আমিও রাগ করি না।' উপস্থিত কয়েকজন প্রতিষ্ঠান-কর্মীর দিকে তাকিয়ে তিনি এই কথাগুলি বললেন।

"চিরদিন গুরুতর কাজ করেছি। স্বামী খুব বিদ্বান ছিলেন। আমার বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী থেকে প্রথম যখন বাপের বাড়ী যাই সে সময় তিনি বাক্সে বই সাজিয়ে দিলেন। চিঠি লিখতেন, তাতে থাকত প্রশ্ন আর উত্তর। সংসারের হাজার কাজের মধ্যেও লেখাপড়া করতে হত। তারপর স্বামীর মৃত্যুর পর বাপের বাড়ীতে বিপুল বিষয়সম্পত্তি দেখা-শুনা, নিয়মনিষ্ঠা পালন, পূজাপার্বণ সম্পাদন, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষকতা করেছি। নানা কাজই তো করেছি কিন্তু কোনো কাজই তেমন কঠিন বলে মনে হয় নি আমার।"

এতক্ষণ আমি প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিলাম। এখন প্রসঙ্গে ফিরে আসি: শ্যামমোহিনীর পিতা যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর মা দেখলেন যে, স্বামী যাদবচন্দ্র রাজসাহীতে অনেক বাড়ীঘর তৈরী করে গেছেন, কিন্তু সেগুলি সবই কাঁচা বাড়ী—টিন ও টালীর ছাওয়া। কোঠাবাড়ী তিনি করে যেতে পারেন নি। দীঘাপতিয়ার রাজ-ষ্টেটের উকিল ছিলেন যাদবচন্দ্র। বাংলা ১৩০৪ সালে প্রবল ভূমিকম্পে রাজার বহু দালানকোঠা ধ্বংস হয়। রাজা সেই ধ্বংস-প্রাপ্ত বাড়ীর যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম যাদবচন্দ্রকে দিয়ে দেন। রাজার আনুকূল্যে তিনি আরম্ভ করলেন দালান তৈরী, কিন্তু তাঁর আকস্মিক তিরোধানে সে কাজে ছেদ পড়ল।

এখন গোবিন্দময়ীকে অনেকে পরামর্শ দিলেন, 'নাবালক ছেলেমেয়ে আপনার। আপনি মালমসলা দিয়ে ঐ অসমাপ্ত বাড়ী তৈরীর কাজ শেষ করুন, না হলে পরে অসুবিধায় পড়বেন।"

তিনি এই সব হিতৈষীর পরামর্শমত ঐ অসমাপ্ত বাড়ী তৈরীর কাজ পুনরায় আরম্ভ করলেন।

শ্যামমোহিনীর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রস্তুতি

এখন বাড়ী আরম্ভ করলেন বটে কিন্তু দেখাশুনা করবে কে? জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্যামমোহিনীর বয়স মাত্র দশ বৎসর। ছেলে তিনটি নিতান্ত ছেলেমানুষ। সে যুগে নারী ছিল অসূর্যম্পশ্যা। জমিদার ঘরের বৌ তিনি বাইরে বেরিয়ে বাড়ী তৈরীর তদারক করবেন—এ যে কল্পনার অতীত! চতুর্দিক হতে 'মানমর্যাদা রইল না' বলে লোকে নিন্দামুখর হয়ে উঠবে। এখন উপায়? উপায় একটা পেয়েও গেলেন তিনি। ছাত্রবৃত্তি পাশ কন্যা শ্যামমোহিনীর উপর দালান তৈরীর কাজ দেখাশুনা, রাজমিস্ত্রি খাটানো, জানালা-কপাটের যাবতীয় হিসাবের ভার দিলেন। মা যেমন ভার দিলেন আর কন্যাটিও তেমনি সে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার দক্ষতার পরিচয় দিতে থাকে। একটি পয়সার হিসাবও এদিক ওদিক হয় না। ঠিক ঠিক মাকে হিসাব বুঝিয়ে দেয় প্রত্যেকদিন। রাজমিস্ত্রিরা শ্যামমোহিনীর বুদ্ধির তারিফ করে। পড়াশুনায় কৃতী শ্যাম-মোহিনী এখন সংসার-কাজেও তার প্রমাণ দিলেন। এত অল্পবয়সে কন্যার এতটা বৈষয়িক কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে চকিতে মাতার মনে কন্যার জন্মক্ষণটির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে যায় জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী—মা অত্যন্ত গর্ববোধ করেন, মনে মনে তিনি মেয়েকে আশীর্বাদ করেন। বৃহৎ কর্মের মধ্যে মেয়ে যেন কৃতিত্ব দেখাতে পারে। মেয়েকে কর্মের সাথী পেয়ে বাড়ীটি স্বল্পব্যয়ে অচিরেই তৈরী হল।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবাহ

কন্যার বিবাহের জন্য গোবিন্দময়ী ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কন্যা শ্যামমোহিনীর বয়স এখন বারো। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই আর বিবাহ না দিলে নয়। নয় বৎসরের কন্যাকে বিবাহ দিয়ে 'গৌরীদান' করার পুণ্য সঞ্চয়ের মোহ থেকে মা মুক্ত ছিলেন না।

কন্যার বিবাহের জন্যে মা মহাভাবনায় পড়লেন। এ কাজে তিনি তাঁর দাদা প্রসন্নকুমার বক্সীর সাহায্য চাইলেন। ময়মনসিংহ জেলা ছাড়াও অন্যত্র প্রসন্নকুমারের অনেক ভূ-সম্পত্তি ছিল একথা পূর্বেই বলেছি। ঢাকা জেলায়ও তাঁর জমিজমা বাড়ীঘর ছিল। এখন যে পাত্রটির সন্ধান পেলেন সে পাত্রের বাড়ীও ঢাকায়। পাত্রপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে এলেন দিদির রাজসাহীর বাসায় কনে শ্যামমোহিনীকে দেখানোর জন্যে। শ্যামমোহিনীকে দেখতে এলেন শ্যামমোহিনীর জ্যেঠতুতো ভাশুর যাদবচন্দ্র মৈত্র। পাত্র তাঁরই ছোট ভাই ললিতচন্দ্র মৈত্র।

কিন্তু কথায় বলে জন্মমৃত্যুবিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। যেখানে যার সঙ্গে যার বিবাহ হবার তা যেন আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকে। তা না হলে শ্যামমোহিনীর বিবাহের কথা হল একজনের সঙ্গে কিন্তু হল আর একজনের সঙ্গে। পাত্রের দাদা শ্যামমোহিনীকে দেখে এসে মন্তব্য করলেন—মেয়ে কালো কিন্তু মেয়ে খুব লেখাপড়া জানে। পাত্রী কালো শুনে পাত্র ললিত মৈত্র কিছুটা ইতস্তত: করতে থাকেন। কিন্তু মেয়ে খুব লেখাপড়া জানে শুনে আর একজনের মনে তখন সানায়ের মিলন বাঁশী বেজে উঠল। কথাটা শোনার পর থেকে কি করে জ্যেঠতুতো দাদার সঙ্গে এ বিবাহ ভেঙে দেওয়া

যায় এবং ঐ মেয়ের সঙ্গে তাঁর নিজের বিবাহ হয় ক্রমাগত এই মতলবই আঁটতে লাগলেন সুরেন্দ্রনাথ।

অবশেষে এক অভিনব ফন্দি ঠিক করলেন সুরেন্দ্রনাথ। 'ছিঃ, থুঃ, কালো মেয়ের সঙ্গে বিয়ের দরকার নেই দাদা।' এই বিরূপ মন্তব্য বার বার পাত্রের কানে উত্থাপন করে করে সুরেন্দ্রনাথ এ বিবাহ ভেঙে দিলেন। পরবর্তীকালে আসল ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী এসে শ্যামমোহিনী জায়েদের কাছে শুনেছেন এ ঘটনা—আর এ নিয়ে তাঁরা শ্যামমোহিনীকে ঠাট্টাও করেছেন প্রচুর।

বিবাহ ভেঙে যাওয়ায় মা খুব চিন্তিত হলেন। দশ বৎসরে বিবাহ দেবেন কোথায়, তা না, বার বৎসরে পদার্পণ করল মেয়ে, তবু বিবাহ দিতে পারছেন না। এমনি ভাবনাচিন্তায় মা যখন অত্যন্ত আকুলি-বিকুলি করছেন তখন হঠাৎ গোবিন্দ চক্রবর্তীর নিকট হতে একখানা পত্র পেলেন। শ্যামমোহিনীর মামার সেরেস্তার কর্মচারী গোবিন্দ চক্রবর্তী ঢাকা জেলার হাটাইল মধুপুর গ্রামেরই বাসিন্দা। তিনি গ্রামে এলে পুনরায় তাঁকে দিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হল সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামমোহিনীকে বিবাহ দেবার জন্যে। এ ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ নিজেই উদ্যোক্তা। সুরেন্দ্রনাথের অন্তরে শিক্ষিতা মেয়েকে বিবাহ করার প্রবল বাসনা। মাকে ধরলেন, "মা, তুমি ঐ মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দাও—ও মেয়ে লেখাপড়া জানে—উচ্চশিক্ষিতা। সোনার মেডেল পেয়েছে। ছাত্রবৃত্তি পাশ, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও মা তুমি।"

পুত্রের আবদারে মা ভবানীসুন্দরী দেবী গোবিন্দ চক্রবর্তীকে দিয়ে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব দিলে গোবিন্দ চক্রবর্তী শ্যামমোহিনীর মাকে লিখলেন, 'ঐ বাড়ীরই আর এক ছেলে দেখতে পরম সুন্দর, বি. এ. পড়ে, নাম সুরেন্দ্রনাথ—তিনি স্ব-ইচ্ছায় বিবাহ করতে একান্ত ইচ্ছুক, মেয়ে লেখাপড়া জানে বলে। অতএব আপনি চিন্তা

করবেন না। আমরা আপনাদের আনতে যাচ্ছি। আপনারা প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।'

অঘটন-ঘটন-পটিয়সী নেপথ্যে থেকে সুরেন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করলেন। বিবাহ ঠিক করে মামা ভাগিনীকে নিজ গ্রাম সহবৎপুরের বাড়ীতে নিয়ে এলেন।

ইংরেজী ১৯০০ সাল। বাংলা ১৩০৭ সাল, শ্রাবণ মাস। ঢাকা জেলার হাটাইল মধুপুর গ্রামের বিখ্যাত মৈত্রবংশের ছেলে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামমোহিনীর বিবাহ হয়। প্রথম কন্যার বিবাহ, খুব জাঁকজমক করে প্রচুর সোনাদানা-যৌতুক সহ কন্যার বিবাহ দিলেন গোবিন্দময়ী। কন্যার বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হওয়ার পর মা নাবালক পুত্রদের নিয়ে করঞ্জা গ্রামে ফিরে এলেন। রাজসাহীর নবনির্মিত কোঠাবাড়ীটি তিনি আগেই ভাড়া দিয়েছেন। গ্রামে ফিরে এসে তিনি অসাধারণ বিচক্ষণতার সঙ্গে স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করতে থাকেন। কন্যার বিবাহ দিয়ে তিনি এখন নিশ্চিন্ত। তিনি বিষয়-সম্পত্তির দিকে নজর দিলেন এবং বৈধব্যের বিবিধ ব্রত-পূজাপার্বণে মন দিলেন।

বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ এই তিন মাস ১লা থেকে শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ গীতার দশম অধ্যায় পুরোহিত পাঠ করতেন, গোবিন্দময়ী তা পাড়ার ধার্মিকাদের নিয়ে অভিনিবেশ সহকারে শুনতেন। পরমেশ্বরের বিভূতিযোগ যেখানে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন :—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ (৪১)॥

অর্থাৎ যাহা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত বা শ্রীসম্পন্ন বা অতিশয় শক্তি-সম্পন্ন তাহাতেই আমার শক্তির সামান্য প্রকাশ জানিবে এই শ্লোকটি তদ্‌গত-প্রাণা হয়ে গোবিন্দময়ী পুরোহিতের সঙ্গে আওড়াতেন। যাহা কিছু শ্রীসম্পন্ন তাহাই ঈশ্বরের শক্তি। আহা, নিজেকে শ্রীময়ী করে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশে তৎকালীন সমাজের

প্রথানুযায়ী পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তিনি বারমাসের ব্রত নিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে সাবিত্রীব্রত (সাবিত্রী চতুর্দশী), ভাদ্রমাসে অনন্তব্রত, শুক্লা অষ্টমী, দূর্বাষ্টমী, তাল নবমী, দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিনে বীরাষ্টমী এই সব ব্রত পালনে নিজকে শ্রীমণ্ডিত করে তা ঈশ্বরের বিভূতির প্রকাশ বলে মনে করতেন। সংসারের শত কাজের মধ্যে নিজকে শ্রীমণ্ডিত হবার চেষ্টা চলত তাঁর।

শ্রীভগবান নাকি আনন্দসৃষ্টির জন্যে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন— তবে তিনিই বা আনন্দে অবগাহন করে ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করবেন না কেন এমনি মন নিয়ে তিনি এই সব ব্রত করতেন আর সংসারের হাল শক্ত হাতে ধরেন। স্বামী জীবিত থাকতেই তিনি এই সব ব্রত-নিয়ম পালন করতেন। এজন্যে স্বামী তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলতেন, পাঁজিতে যত ব্রত উপবাস আছে সবগুলিরই অনুষ্ঠান করো না—আসলে স্ত্রীর এত ব্রত পালন উচ্চশিক্ষিত সংস্কারমুক্ত স্বামীর ভাল লাগত না, তাঁর মনে হত এই সংস্কারগুলি এত বেশী আঁকড়ে থাকলে আর অন্য কাজে মন দেওয়া যাবে না। কিন্তু এখন গোবিন্দময়ী হিন্দুঘরের বিধবা, নিজেকে এভাবে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখলেন। আর তাতে মানসিক স্বস্তির খোরাক পেলেন তিনি।

এ ছাড়া আশৈশব পূজাপার্বণ গৃহদেবতার ভোগারতি প্রথমে পিত্রালয়ে পরে শ্বশুরালয়ে উভয়স্থানে নিত্য অনুষ্ঠিত হতে দেখেছেন তিনি। নিজেও নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য পালন করেছেন। এখন এসব কাজ তাঁর কাছে কঠিন নয়, নতুন কিছুও নয়। এগুলি না করতে পারলেই বরং মনে খারাপ লাগে। এত ব্রত পূজা উপোস উদ্‌যাপনের মধ্যেও গীতার দশম অধ্যায়ের একচল্লিশ শ্লোকটি তাঁর মনে গভীর দাগ কাটে। সুপুরুষ উচ্চশিক্ষিত জামাই পেয়ে গোবিন্দময়ীর এ ধারণা আরো বদ্ধমূল হয় যে, এসবই ঈশ্বরের বিভূতি। নইলে সুরেন্দ্রনাথের জ্যেঠতুতো দাদার সঙ্গে বিবাহ ঠিক হয়েও মেয়ে কালো

কলকাতা করপোরেশনের মেয়রের বন্যাত্রাণ তহবিলে
অর্থদানরতা শ্যামমোহিনী

(ডাইনে হতে বাম) শ্যামমোহিনী, প্রধান স্কুল পরিদর্শক শ্রীসুধীরকুমার
মুখোপাধ্যায় ও স্কুল পরিদর্শক গোপালচন্দ্র পাত্র

বলে বিবাহ হল না কেন? মা নিশ্চিন্ত—এ নির্ঘাৎ ঈশ্বরের বিভূতির এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন। মা মনে মনে অত্যন্ত খুসী হন। এ-কারণে স্বামীর মৃত্যুশোক অনেকখানি প্রশমিত হল তাঁর। আর শ্যামমোহিনীর মনেও ভয় ছিল নিজে কালো বলে সুদর্শন উচ্চশিক্ষিত স্বামী তাঁকে অবজ্ঞা করবেন কিনা। অচিরে তাঁর সে শঙ্কারও নিরসন হয় যখন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শ্যামমোহিনী জানতে পারলেন তাঁকে বিবাহ করার জন্য স্বামী সুরেন্দ্রনাথ এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এখন শ্যামমোহিনীর শঙ্কার পরিবর্তে গর্ববোধ হতে লাগল।

কথায় বলে কন্যা বরয়তে রূপম্—কন্যা তো বরের রূপই চায়। সেদিক থেকে শ্যামমোহিনীর স্বামী সুরেন্দ্রনাথ অপূর্ব রূপে রূপবান। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর লোকজনদের রূপগুণ সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করেন শ্যামমোহিনী। "আমার স্বামী দেখতে খুব সুপুরুষ ছিলেন। আমার শ্বশুরকুলের সকলেই রূপবান ছিলেন। শ্বশুর দ্বারকানাথ মৈত্র ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল সহরে ওকালতি করতেন। আমার বিবাহের দুই বৎসর পূর্বে তিনি মারা যান। বিবাহের সময় আমার স্বামী কুচবিহারে তাঁর দিদির বাসায় থেকে কুচবিহার কলেজে বি. এ. পড়তেন। শ্বশুরশাশুড়ীর চোদ্দজন ছেলেমেয়ে ছিল। আমার স্বামী ছিলেন তাঁদের পঞ্চম সন্তান। আমার বিবাহের সময় আমার স্বামী মিলে ওঁরা ছয় ভাইবোন জীবিত ছিলেন। ভাইদের নাম ছিল দেবেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও অজিতনাথ। বোন তিনটির নাম শরৎসুন্দরী, গিরিবালা ও স্নেহলতা। ছেলেমেয়েগুলিও পিতামাতার মত রূপবান ছিলেন। শুনেছি—বাড়ীতে দুর্গোৎসব দেখতে এসে লোকে প্রতিমা দেখত আর আমার শাশুড়ী ও তাঁর ছেলেমেয়েকে দেখে বলতো, এঁরাও এক এক প্রতিমা।"

কিন্তু এমন রূপবান সুরেন্দ্রনাথ স্বীয় বিবাহের ব্যাপারে স্ত্রীর রূপের চেয়ে শিক্ষার দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁর স্ত্রী হবেন

প্রকৃত শিক্ষিতা, এই ছিল সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র অভিলাষ। রং কালো কি ফর্সা এ নিয়ে কোনো সমস্যাই ছিল না সুরেন্দ্রনাথের। শ্যামমোহিনীকে বিবাহের মধ্য দিয়ে তিনি তা প্রমাণ করেন। আর এ বিবাহ পরবর্তীকালে জাতির পক্ষে কত শুভপ্রদ হয়েছে একটি ত্যাগপূত মহীয়সীর আবির্ভাব হয়ে সে কথা কারো কাছে আজ আর অবিদিত নয়। বিবাহের পরই বিদ্যোৎসাহী সুরেন্দ্রনাথ স্ত্রীর শিক্ষার ভার আপন হাতে তুলে নিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি কতদূর লেখাপড়া জান?'

উত্তর:—সামান্যই জানি—আপনার তুলনায় কিছুই নয়।

স্বামী বললেন, আরো লেখাপড়া শিখতে হবে। দেশে বড়ই অশিক্ষা; শিক্ষা-আদৌ নেই। স্কুল-কলেজ তেমন নেই। এ বিষয়ে সকলের চেষ্টা করা উচিত। আমিও চেষ্টা করব, তুমিও করবে।

প্রকাণ্ড ঘোমটার মধ্য দিয়ে বার বৎসরের বধূ স্বামীর কথায় সায় দেন মাথা নেড়ে। বাইশ বৎসরের স্বামী উৎসাহিত হয়ে বলতে থাকেন, 'ইংরাজী ভাল করে শিখতে হবে। ইংরাজী রাজভাষা। ওটা জানা একান্ত প্রয়োজন। এতে অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার রয়েছে।'

কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটি ভারী মজার। শ্রাবণ মাসে ওঁদের বিবাহ হয়। শ্যামমোহিনী শ্বশুরবাড়ী এসেছেন আজ চারদিন। আনন্দস্ফুর্তি হচ্ছে খুবই। কিন্তু যাঁদের উপলক্ষ করে এই আনন্দ-উৎসব, সেই নব-দম্পতির পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা এ পর্যন্ত হয় নি। এদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই।

চারদিন পর শ্যামমোহিনীর কুচবিহারের ননদ শরৎসুন্দরী দেবী বললেন, 'হ্যাঁরে সুরু, (সুরেন্দ্রনাথের ডাকনাম সুরু) বৌ-এর সঙ্গে কথা বলেছিস কিছু?'

উত্তর:—কি করে বলব—তোমরা যে ঘরে শুয়ে থাক।

দিদি বললেন, তাতে কি হয়েছে রে! অবশ্য এর পর থেকে ওরা আর ঐ ঘরে থাকত না—চারদিন পর নবদম্পতির কথা হল।

প্রথমেই স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন—কি কতদূর পড়েছ? কি কি বই পড়তে ভালোবাসো?

স্ত্রীর উত্তর হলো—গল্পের বই।

শ্যামমোহিনীর শ্বশুরবাড়ী শিক্ষিত পরিবার। তাঁর স্বামী বললেন, বই আছে প্রচুর লাইব্রেরীতে, যত খুসী নিয়ে পড়বে।

কেবল কথা আর কথা—এত ভালোবাসা, আর এত আদর। বিবাহের আটদিন পর নববধূ শ্যামমোহিনী মামাবাড়ী ফিরে এলেন। এর দু' চারদিন পরই একখানা করে স্বামীর চিঠি আসতে থাকে। মামার কর্মচারীরা সে চিঠি খুলে পড়ে পুনরায় আঠা দিয়ে আটকে শ্যামমোহিনীকে দেয়। মামা-মামীও সে চিঠি পড়তে কসুর করেন না। ওদের মস্ত ভয় ছিল কন্যা তাদের কালো, পাছে জামাইয়ের পছন্দ না হয়ে থাকে।

চিঠি পড়ে তাঁদের সে দুশ্চিন্তা দূর হয়। খুসী হন তাঁরা। কিন্তু মজা পায় মামার কর্মচারীরা। তারা শ্যামমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে—কি, ইতিহাস কতখানি পড়া হোল। দর্শন কতখানি হোল। শ্যামমোহিনী অবাক্! এরা কি বলে? পরে চিঠি পড়ে বুঝতে পারলেন ওদের কথার অর্থ। বাক্স খুলে দেখে সে এক অবাক কাণ্ড, কতরকম পুঁথিপুস্তকে সাজিয়ে দিয়েছেন। আর চিঠিতে সেই সব বইয়ের প্রশ্ন আর উত্তর লিখে পড়া দিয়েছেন। রোজ স্বামীর একখানা করে চিঠি আসত। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত যাবতীয় পাঠ্য-পুস্তক ছাড়াও শাস্ত্র গ্রন্থ ও অন্যান্য শিক্ষামূলক বিষয়ও এই পাঠ্যসূচীর মধ্যে ছিল। চিঠিতে কেবল সেই পড়াশুনার কথা।

এখন যেমন ডাকযোগে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে আজ থেকে ৭৫ বৎসর পূর্বে জ্ঞানপিপাসু সুরেন্দ্রনাথ তেমনি স্ত্রী শ্যামমোহিনীর ডাকযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সেবার সুরেন্দ্রনাথ বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করলেন। অনেকেই মন্তব্য করলেন, "ফেল করবে না তো কি—পড়বে কখন রোজ বৌকে একখানা করে চিঠি লিখলে?"

সে অভিনব পত্রগুচ্ছ থাকলে ওঁদের দাম্পত্যজীবনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যে ভরা দিনগুলি সম্যক্ পরিস্ফুট হত। দেশবিভাগের ফলে চিঠিগুলি খোওয়া যায়। বাক্সবন্দী হয়ে পাবনায় গচ্ছিত ছিল। প্রচারবিমুখ শ্যামমোহিনী কোনকিছুরই চিহ্ন ধরে রাখেন নি—এমন কি, স্বামীর একখানা ফটোও কোথাও নেই তাঁর।

শাশুড়ীর চেষ্টায় হাটাইলে স্কুল গঠন

শ্যামমোহিনীর শ্বশ্রূমাতাও অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পুত্রবধূ শ্যামমোহিনী দ্বিতীয়বার শ্বশুরবাড়ী আসার পূর্বেই তিনি গ্রামের লোকদের বলে রাখলেন, আমার বউ খুব লেখাপড়া জানে, তোমরা ছেলেমেয়ে পাঠাবে, আমার বউ পড়াবে। সে যুগে গ্রামঘরে শ্বশুর-শাশুড়ী পুত্রবধূকে বউ বলে সম্বোধন করতেন। বৌ ফিরে এলে তিনি চণ্ডীমণ্ডপে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা করে দিলেন।

চণ্ডীমণ্ডপে স্কুল বসানোর কারণ হাটাইল মধুপুর গ্রামে তখন কোন স্কুল ছিল না। গ্রামটি ছিল নিতান্ত অজ পাড়াগাঁ। ঐ গ্রামে বা পার্শ্ববর্তী কোন গ্রামে কোন স্কুল, পোষ্টাফিস বা চিকিৎসালয় ছিল না। একটি মাত্র ডাকঘর ও একটি পোষ্টাফিস ৩।৪ মাইল দূরে ছোনকা গ্রামে অবস্থিত ছিল। ঐ গ্রামের জমিদার রসময় বোসের বাড়ীতে একটি ছেলে ডাক্তারী পাশ করে গ্রামে এসে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কেহ গুরুতর রোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে ডাকা হত। নতুবা গ্রামের দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষ সাধারণতঃ টোটকা চিকিৎসা, জলপড়া, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতির উপর নির্ভর করত।

গ্রামটি ছিল মুসলমানপ্রধান। এদের অধিকাংশ কৃষিজীবী এবং জনমজুর বা গৃহভৃত্যের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এরা ছাড়াও গ্রামে ৫।৬ ঘর ব্রাহ্মণ, কর্মকার, নাপিত, মৎস্যজীবী ও বৈশ্য জাতির লোকের বাস ছিল। এরা গ্রামে দোকান দিয়ে গ্রামের লোকের চাহিদা মেটাত এবং নানাস্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য করত।

উপরোক্ত কথার মধ্য দিয়েই তদানীন্তন গ্রামের শিক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থার একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে।

একদিন হঠাৎ শ্যামমোহিনী দেখলেন, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা শ্লেট, পেন্সিল, কেউ বা দোয়াত-পাতা, খাগের কলম, চাটাই নিয়ে হাজির। শাশুড়ী পূর্বে পুত্রবধূকে এ সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে দেননি—এখন ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে বললেন, 'বউ, তুমি এদের পড়াও—আমাদের গ্রামের চারপাশে তো কোন স্কুল নেই যে ওরা লেখাপড়া শিখবে।'

স্বামীর কথা শোনার পর থেকেই মনে মনে এটাই চাইছিলেন শ্যামমোহিনী—"শিক্ষাবিস্তার, স্কুলকলেজ তেমন নেই, এ বিষয়ে সকলের চেষ্টা করা উচিত। আমিও চেষ্টা করব, তুমিও করবে।" এত শীঘ্র সে সুযোগ এসে গেল! শাশুড়ী সে সুযোগ করে দিলেন। তাহলে কি ঈশ্বর অন্তর্যামী! আকুল হয়ে কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করলে তিনি এমনিভাবেই তা পূরণ করে দেন! সানন্দে তিনি প্রকাণ্ড ঘোমটা দিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতে আরম্ভ করলেন।

সেদিন রাজসাহীতে সেই বৃদ্ধাকে রামায়ণ-মহাভারত পড়ানো শিখিয়ে তাঁর যেমন আনন্দ হয়েছিল এখন তার চাইতে অধিক আনন্দে শ্যামমোহিনীর মন নেচে উঠল। পড়াশুনা তাঁর ব্যর্থ হয়নি—শ্বশুর-বাড়ী তার কদর বুঝেছে। খুশীতে মন ভরে উঠে শ্যামমোহিনীর। স্বপ্ন মদিরার মধ্য দিয়ে দিনগুলি কেটে যায় কোথা দিয়ে। স্বামী শুনে কত খুশী হবেন। মনে মনে একথা ভেবে শ্যামমোহিনী বিপুল আনন্দে দ্বিগুণ উৎসাহে ছেলেমেয়েদের পড়াতে থাকেন।

শ্যামমোহিনীর শাশুড়ী অত্যন্ত পরোপকারী, দয়ালু মহিলা ছিলেন। তিনি পুত্রবধূকে দিয়ে গ্রামের দরিদ্র ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা করা ছাড়াও নানাবিধ গাছগাছড়া ও টোটকা ওষুধ ঘরে রাখতেন। সে সব দিয়ে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা করতেন। খেতে বসেছেন, এমন সময় একজন এসে কেঁদে পড়ল, 'কই গো

মা-ঠাকরুণ, আমার ছেলে জ্বরে ভুল বকছে, তায় ভীষণ পেট খারাপ—ওষুধ দিন মাগো।' তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুঘরের বিধবা তিনি, একবার খাওয়া ছেড়ে উঠলে আর খাওয়া নিষিদ্ধ, তবু খাওয়া রেখে তিনি তক্ষুণি ওষুধ দিতেন। আর এজন্যে তাঁর প্রস্তুতির অভাব ছিল না। অনেক ওষুধের গাছ তিনি বাড়ীর চারদিকে লাগিয়ে রাখতেন। গাছগাছড়া থেকে তৈরী মুষ্টিযোগ ওষুধ দিতেন। অভাবগ্রস্ত দরিদ্র গ্রামীন মানুষের প্রতি তাঁর দরদী হৃদয় সর্বদা করুণাঘন থাকত। অল্প সুদে বহু লোককে টাকা ধার দিয়ে তিনি অসময়ে তাদের যথেষ্ট সাহায্য করতেন। এরূপ জনদরদী পরোপকারী শাশুড়ীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-ভালবাসা ও শ্রদ্ধা শ্যামমোহিনীর অন্তরে আজও সমানভাবে রয়েছে। শাশুড়ীর কথা বলতে গিয়ে আজও কৈশোরের কত স্মৃতিই না ভীড় করে আসে শ্যামমোহিনীর মনে ঃ—

"আমার শাশুড়ীর খুব প্রখর স্মরণশক্তি ছিল। তাঁর এমন স্মৃতি-শক্তি ছিল যে, বহু লোকের নিকট টাকা খাটিয়ে তিনি মুখে মুখে তার নির্ভুল হিসাব রাখতেন। বড় বড় গাণিতিকও তাঁর কাছে হার মেনে যেতেন। লেখাপড়া জানতেন না বলে' মনে মনে তাঁর খুব দুঃখ ছিল। গ্রামে স্কুল নেই। অশিক্ষা বিপুল—শিক্ষাবিস্তার একান্ত দরকার কিন্তু আক্ষরিক জ্ঞান না থাকায় নিজে কোন সাহায্য করতে পারতেন না গ্রামের ছেলেমেয়েদের। এখন শিক্ষিত পুত্রবধূ পেয়ে তাঁর আনন্দ থই পায় না। তিনি কালবিলম্ব না করে পুত্র-বধূকে দিয়ে ব্যবস্থাও করে ফেললেন। তাঁর বহুদিনকার সযত্নপোষিত আকাঙ্ক্ষা এভাবে পূরণ হল, শিক্ষিত পুত্রবধূ সে আশা পূরণ করলো।"

যে সময়ের কথা হচ্ছে সেই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৯০০ সালে ব্যাপক আকারে শিক্ষালোক সহর ছেড়ে সুদূর পল্লীতে পল্লীতে পৌছায় নি। আশেপাশে কয়েক গ্রামের মধ্যেও একটি স্কুল খুঁজে পাওয়া যেত না। খৃষ্টান মিশনারী ও ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের অন্তঃপুর শিক্ষাবিস্তার পরিকল্পনার (১৮৬২-৬৩) ফল সুপ্রসারিত হয়।

তৎকালে গ্রামের কেবল সঙ্গতিসম্পন্ন উদারনৈতিক লোকের ছেলেরা সহরে গিয়ে লেখাপড়া করত—যেমন শ্যামমোহিনীর শ্বশুরকুলের ছেলেরা করত।

গরীব মানুষ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। শাশুড়ীর সাহায্যে এ কাজে অগ্রণী হলেন শ্যামমোহিনী।

সে যুগে এইসব মহীয়সী সমাজচিন্তায় নিমগ্না ত্যাগী পরোপকারী মহিলাদের নেপথ্যে অবদানের কথা আজ আর কারো মনে নেই—মনে করার প্রয়োজনও কেউ বোধ করে না। তাঁরা অন্তঃপুরবাসিনী হয়েও প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে কিভাবে আপামর জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অভাব-অভিযোগ দূর করতে নিঃস্বার্থ অবদান রেখে গেছেন সে কথা স্মরণ-মনন একান্ত প্রয়োজন মনে করি।

অসুখ-বিসুখে গ্রামঘরে চিকিৎসার বড়ই অভাব। চিকিৎসার অভাবে গ্রামের দীন-দরিদ্র মানুষের প্রায়ই অকাল মৃত্যু ঘটে। এজন্যে বিনা পয়সায় মুষ্টিযোগ ও গাছ-গাছড়ার ব্যবস্থা করা ছাড়া অভাবে অল্পসুদে টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করেও ভবানীসুন্দরীর মন ভরত না। শিক্ষাই উন্নতির সোপান এবং সে শিক্ষা অপরিহার্য জ্ঞানে শিক্ষিতা পুত্রবধূকে দিয়ে এখন গ্রামের নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের কিছুটা সে সুযোগ করে দিলেন ভবানীসুন্দরী।

আজকের দিনে হয়তো এটা আর তেমন কিছু নয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সেই সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারময় যুগে একাজে যাঁরা ব্রতী ছিলেন তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত ত্যাগমাহাত্ম্যে ভরা জীবন এবং তাঁদের সেই অসামান্য প্রচেষ্টা জাতির ভিত্তিমূল দৃঢ় করেছিল। এঁদের সে ঋণ অপরিশোধ্য। এঁদের সেই নিভৃত নীরব সাধনার ফল আমরা ভোগ করছি। এই ভবানীসুন্দরীর গর্ভজাত পঞ্চম সন্তান সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রও একাধারে সমাজসংস্কারক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

ইংরেজী-শিক্ষিত যুবক সুরেন্দ্রনাথ এদেশের নারীসমাজকে শিক্ষিত করার দিকে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এক বৃন্তে দুটি

ফুল—পুরুষ ও প্রকৃতি। তার একটিকে অজ্ঞানের অন্ধকারে রাখলে অন্যটি সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাঁর এই উপলব্ধি ছিল কেবল কথার কথা নয়—মর্মনিংড়ানো ঐকান্তিকতায় ভরা। শ্যামমোহিনীকে বিবাহ করার মধ্যে তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই।

নারীজাতির উন্নতি না হলে এবং তারা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চলতে না পারলে সমাজ ও জাতির উন্নতি হয় না। এই প্রসঙ্গে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যের গান' কবিতাটি মনে পড়ে ঃ

"সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি—চির কল্যাণকর,
অর্দ্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্দ্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্দ্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্দ্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া যে তোমা করে নারী হেয়জ্ঞান ?
তারে বলো, আদি পাপ নারী নহে, সে যে নর শয়তান।
অথবা পাপ যে—শয়তান যে—নর নহে নারী নহে ;
ক্লীব-সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে তার পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।
যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কতভাবে নারীর স্বাতন্ত্র্য চেয়েছেন—যে নারী তার সমস্ত সত্তা নিয়ে বিকশিত হয়েছে সেই নারীকে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন। এখানে তাঁর দু'একটি উক্তি উদ্ধৃত করলে মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা ?
নত করি মাথা পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহারা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে কণ্ঠ হতে
নির্দ্ধারিত স্রোতে।"

আবার দেখুন রবি কবি নারীকে শুধু নিছক ঘরের ঘরণী করে তোলেন নি—তাকে করেছেন ভাববিপ্লবী, সে ভাব কল্পনাবিলাস নয়। সে একাধারে ষ্টিলের ফ্রেমে বাঁধানো। সে পূর্ণ নারী শুধু নগ্নকামনায় তৈরী নয়। কবি তার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন মানবীসত্তা। এ চিত্রাঙ্গদা দেবী নয়, মানবী। তারই উক্তিতে আমরা জানতে পারি যেখানে চিত্রাঙ্গদা বলেন :

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি
সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়,
সেও আমি
নই, অবহেলা করি
পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি।

যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে,
দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি
অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে
কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।”

কিন্তু নারীর এইরূপ চারিত্রিক দার্ঢ্যে অনুপম এই রূপ অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন যুগে কিভাবে কতিপয় গোঁড়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অঙ্গুলি হেলনে যুগ-যুগ ধরে অবহেলায় অপমানে নৃশংস নির্মম অত্যাচারে ভূলুণ্ঠিতা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সঙ্গে পাঠকপাঠিকাবা আগেই পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল এদেশের যুবকদেব চেষ্টায় ব্যাপক আকাবে নারী যেভাবে মুক্তি পেল, চিত্রাঙ্গদার মুখ থেকে বের হলো—‘আমি চিত্রাঙ্গদা, দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী’—দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সে একথা বলার সাহস পেল তার ইতিহাস আজ আর কারো অবিদিত নয়।

নারীপ্রগতি

এমন এক একটি বিপর্যয় আসে যা জাতির সমাজব্যবস্থা তার রীতি-নীতি, তার সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন সাধন করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পরই সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। ফলে ব্যাপকাকারে জাতির অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। অনন্যোপায় পুরুষ তখন আপন প্রয়োজনে

এদেশের নারীকে গৃহের নিরালা কোণ থেকে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার দেয়। সেদিন নারীকে প্রয়োজনে পুরুষের পাশে এসে অর্থ উপার্জন করে সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল। মূলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই ব্যাপকহারে নারী শিক্ষিত হয়ে যোগ্যতানুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রয়াস পান। শক্তহাতে সংসারের তথা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের হাল ধরে প্রভূত যোগ্যতার পরিচয় দেন। এর পূর্বে মুষ্টিমেয় নারী বিদ্যাশিক্ষা লাভ করে কেবলমাত্র স্কুল-কলেজ-হাসপাতালে চাকরি করতেন। অধিকাংশ নারীই অর্থ উপার্জনের সুযোগ না থাকায় লেখাপড়া শেখা কাম্য মনে করেন নি। অধিকাংশ পিতামাতারও সেদিকে তেমন নজর ছিল না। লেখাপড়া শিখেও সেই হাতা খুন্তি হাঁড়ি ঠেলা আর না শিখেও সেই হাঁড়ি ঠেলা যখন, তখন আর কষ্ট করে টাকাপয়সা খরচ করে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে কি লাভ। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই মেয়েদের শিক্ষার দিকে অনেকেরই আগ্রহের অভাব দেখা যেত। ফলে নারীর দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সামাজিক সে রীতি-নীতি ধ্যানধারণার আমূল পরিবর্তন হল। পুরুষের ন্যায় শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে—সে শিক্ষাকে অর্থকরী পেশায় নিযুক্ত করে নারী ঘরেবাইরে তাদের শক্তির পরিচয় দিতে লাগল। নারী দুর্দশামুক্ত হল। নারীর জীবন কর্মচাঞ্চল্যে ভরে উঠল আর সেই থেকে নারীপ্রগতির সুরু।

নারীর দুর্দ্দশা মোচনে শ্যামমোহিনী

কিন্তু নারীর অবর্ণনীয় সে দুঃখদুর্দ্দশার দিনে একান্ত আপন জন হিসাবে যে কতিপয় হাতে-গোণা মহীয়সী মহিলা প্রতিষ্ঠান গঠন করে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও মেয়েদের শিক্ষিত করে স্ব-নির্ভর করার সাধনায় সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ করেছেন—শ্যামমোহিনী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষা জীবিকার্জনমুখী

না হলে সে-শিক্ষায় মেয়েদের কোন কল্যাণ করা যাবে না—তথা জাতিরও কল্যাণ হবে না। এই সত্য তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন মাত্র ষোল বৎসর বয়সে বিধবা হয়ে—স্বামী হারানোর অপূরণীয় বেদনার চাইতেও ক্ষাহার গলগ্রহ হলেন তিনি এ দুঃসহ যাতনার গ্লানি থেকে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন শ্যামমোহিনী এবং মেয়েদের দুর্গতি মোচন করতে হলে সর্বপ্রথম তাদের শিক্ষাদানকে জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত করতে হবে—এই চরম সত্য তিনি আজ থেকে সত্তর-বাহাত্তর বৎসর পূর্বে উপলব্ধি করেন। যে সত্যকে উপলব্ধি করতে জাতিকে বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় একটি মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হল সে সত্য তিনি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। সেই উপলব্ধিগ্রাহ্য সত্য সাধনার দ্বারা শত শত নারীর জীবন সার্থকতায় ভরে তুলেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত পরিষদের মাধ্যমে। আজও সে সাধনা অব্যাহত চলেছে তাঁর। তাঁর প্রতিজ্ঞা হল যতদিন একটি মেয়েও নিরক্ষরা থাকবেন, স্বাবলম্বী না হবেন—ততদিন তাঁর সে প্রচেষ্টা চলবে। তাঁর মহতী প্রতিষ্ঠানকে তিনি সেইভাবেই গড়ে তুলেছেন।

বর্তমানে দেশ আর এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারী সমস্যায় জর্জরিত দেশ। শিক্ষা জীবিকামুখী না হওয়া এর অন্যতম কারণ বলে ভূয়োদর্শিনী শ্যামমোহিনীর অভিমত।

আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূলেও অন্যান্য কারণের চাইতে সর্বস্তরে ব্যাপক স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের অভাবের ফলে তাদের অজ্ঞতা, কুসংস্কারগুলি আঁকড়ে থাকা, অধিক সন্তান হবার কুফলের সচেতনতার অভাব আর তাদের জীবিকার্জনের সুযোগের অভাবে দারিদ্র্যসীমার নিম্নে বসবাস করে জীবনের মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলা। সর্বাগ্রে তাদের জীবনের মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। আর একাজে সর্বাগ্রে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উপার্জনের ব্যবস্থাও করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়ের মত জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপও যেন সেই

বাস্তবতার দিকে আমাদের অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। গ্রামভিত্তিক ভারতবর্ষের বৃহৎ একাংশ যেখানে নারী সেই নারীর মধ্যে শিক্ষার আলোক এখনও পৌঁছায় নি, বিংশ শতাব্দী 'নারীপ্রগতির যুগ' বলে আমরা যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করি না কেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শিক্ষার জলের কল যেখানে পৌঁছায় নি সেই গ্রামবাংলায় শিক্ষার জলের কল পৌঁছে দেবার সুবন্দোবস্ত করতে হবে। শিক্ষা যে সর্বত্র পৌঁছায়নি বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিই তার প্রমাণ। যুদ্ধকালীন সমস্যার ন্যায় এ সমস্যার দিকে যত নজর দেওয়া হবে ততই দেশের মঙ্গল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

"বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।"

*　　　　*　　　　*

'মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।'

জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিপর্যয় যেন এদের দুঃখদুর্দশার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি তুলে ধরেছে। পরিবার পরিকল্পনার দিকে লক্ষ্য রেখে এদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষা পরিকল্পনার ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে শিক্ষা প্রসারও সম্পূর্ণ জীবিকার্জনমুখী না হওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে। এই দিক থেকে শ্যামমোহিনী একক, অনন্য-সাধারণ, আজও তাঁর ন্যায় নিঃস্বার্থ দূরদৃষ্টিসম্পন্না প্রকৃত সমাজদরদী শিক্ষাবিদ সমাজসেবিকা জাতির মধ্যে বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ আগাগোড়া তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত পরিষদের মেয়েদের শিক্ষা-প্রণালীকে জীবিকার্জনমুখী করার দিকে বিশেষ নজর দিয়ে চলেছেন। ফলে এখানে শিক্ষান্তে মেয়েদের জীবিকা সংস্থানের জন্য তেমন দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় না। এইখানেই শিক্ষাবিস্তারে সার্থক শ্যামমোহিনী, সার্থক তিনি তাঁর আদর্শকে রূপদানে।

পাশ্চাত্য নারীপ্রগতি ও ভোটাধিকার

ভারতবর্ষ ছাড়াও পাশ্চাত্য দেশগুলি বিশ্বযুদ্ধে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জার্মান, ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লক্ষ লক্ষ যুবাপুরুষ কৃষি, কলকারখানা ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র ছেড়ে যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হন। যাতে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত না হয়, দেশপ্রেমে আত্মত্যাগে উৎসর্গীকৃত পুরুষদের কর্মক্ষমতা যাতে হ্রাস না পায় এজন্য দলে দলে মেয়েরা পুরুষের স্থলাভিষিক্তা হয়। নারী তার কর্মদক্ষতার প্রমাণ দেয়। পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য সর্বদেশের নারীর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কি সামাজিক কি অর্থনৈতিক কি রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশ স্বীকৃত হয়। বিপুল সংখ্যায় পাশ্চাত্য নারী তার অসামান্য কর্মদক্ষতার পরিচয় দেয়। পাশ্চাত্য নারীকে ভোটাধিকার অর্জন করতে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় নারীর ভোটাধিকার সহজ স্বাভাবিকভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। নারীর দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকটা উদার হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় নারীর প্রবেশাধিকার তার প্রমাণ দেয়। প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রদূত, শিক্ষাবিদ্, জজ-ব্যারিষ্টার এনজিনিয়র, শ্রমিক নেতা, রাজনীতিজ্ঞ, ব্যবসায়ী ইত্যাদি শ্রেণীর নারী যে কত আছে তার পরিসংখ্যান দেওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন।

শুধু জীবিকা অর্জনই নয়, মাত্র স্বল্প ব্যবধানে ঘরে .বাইরে রাজনীতি থেকে দেশশাসন কোথায় না শক্তিময়ী নারীর প্রবেশ ঘটেছে। বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ ভারতবর্ষের মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার উজ্জ্বল নিদর্শন। সমস্যাবিজড়িত ভারতবর্ষের নেতৃত্ব নিয়েই তিনি একাজে তাঁর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন—বিশেষতঃ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে পাক-ভারতের ১৬ দিনের যুদ্ধে তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে চিরভাস্বর হয়ে রইল। তাঁর এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ "ভারতরত্ন ইন্দিরা" এই নামে দেশবাসী তাঁকে যথার্থ সম্মানে ভূষিত করেছেন।

তাঁর এই অসীম সাহসিকতা দর্শনে বিশ্ববাসী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নতুনভাবে মূল্যায়ন সুরু করেছেন। এ তো গেল ইন্দিরা গান্ধীর বৈদেশিক নীতি, কিন্তু দেশের আপামর জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণে "গরীবী হটাও" শ্লোগান তুলে দেশ থেকে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য দূর করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তিনি ও তাঁর সরকাব এ কাজে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। এক কথায় তাঁকে দূরদর্শিনী-জনদরদী বললে বাড়িয়ে বলা হয় না।

নারীপ্রগতি ও বেকার-সমস্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব পর থেকে সেই যে নারী তার জীবিকা অর্জনের তাগিদে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে সে ধারা অব্যাহত গতিতে চলেছে। জীবিকা অর্জনেব সুযোগ পেযে নাবী নিজেকে যোগত্যা-সম্পন্না ও বিশেষজ্ঞা করতে জ্ঞানবিজ্ঞানেব যত শাখা আছে তা থেকে সম্যক জ্ঞান আহবণ করে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সব যোগ্যতাসম্পন্না নারীও আজ জনসংখ্যাব চাপে ভয়াবহ বেকার সমস্যাব সম্মুখীন। উচ্চতর শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও তাবা আজ বেকাব জীবন যাপন করছে। সর্বস্তরের যোগ্যতাসম্পন্না নারী আজ বেকার সমস্যায় দিশেহারা। ফলে বিপুলসংখ্যক বেকার নারীব মনে হতাশার পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। লেখাপড়া শিখেও তাদের খাওয়া পরার রুজিরোজগারের ব্যবস্থা হচ্ছে না। এটা বললে বোধ হয় আজ আর অযৌক্তিক হবে না যে, পিতামাতা ও সেইসব নারী উভয়েই ভাবতে আরম্ভ করেছেন তাহলে অর্থকড়ি খরচ কবে লেখাপড়া শিখে কি লাভ হল! ডিগ্রির পরিবর্তে চাকরি চাই—এ শ্লোগান আমরা সমাবর্তন উৎসবে ডিগ্রিধারী যুবকযুবতীদের মুখে একাধিকবাব শুনেছি। বেকার সমস্যার এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে কোন কোন পিতামাতা এমনকি প্রগতিশীলা নারীও আজ ভাবতে বসেছেন .বেকার জীবনের চাইতে

অল্পবয়সে বিয়ে-থা করে সংসারধর্ম পালন করাই শ্রেয়ঃ। কি হবে আর উচ্চশিক্ষা লাভ করে, সময়ের অপচয় করে। অবশ্য সকলের কথা বলছি না। অনেক শিক্ষিতা মহিলাকে তো দেখি বেকার সমস্যা না বাড়িয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য নিজেরাই নানা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত আছেন। সেখানেও তাদের আজ প্রচুর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ফলে জীবিকা অর্জনের সুযোগসুবিধা হারিয়ে নারীপ্রগতি যে উল্টোদিকে মোড় নিতে পারে দেখেশুনে এ সংশয় আমাদের মনে উঁকি মারছে। নারীপ্রগতি যেভাবে দ্রুত মোড় নিয়েছিল—গ্রাম কি সহরের সর্বস্তরের নারী-শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল মূলতঃ জীবিকা অর্জনের সুরাহা হবে বলে—বেকার সমস্যার চাপে সে মূল্যবোধ অন্য মোড় নিতে আরম্ভ করেছে। শিক্ষিতা বয়স্কা মেয়েদের যেখানে সেখানে বিবাহ দেওয়া যায় না অথচ তারা বেকার। কি করে সময় কাটে তাদের পিতামাতার গলগ্রহ হয়ে এই সমস্যার সম্মুখীন মেয়েরাও। এজন্যে আবার অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার ও বিবাহ করে সংসারী হওয়ার প্রবণতার দিকে কিছুটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে—এ বাস্তব সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই আজ। এজন্যে নারীপুরুষ সকলেরই শিক্ষা জীবিকার্জনমুখী না হলে সে শিক্ষার অপচয় ঘটবে। এই বাস্তব সত্য স্বীকার করে শ্যামমোহিনী শিক্ষা বিস্তার করে চলেছেন—এইখানেই তিনি ক্রান্তিদর্শী।

যুগে যুগে ভারতীয় নারী

যুগে যুগে ভারতীয় নারীর চিরন্তন স্বরূপ কি ঋষি-যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্মিণী মৈত্রেয়ীর মুখ থেকেই প্রথম আমরা জানতে পারি। সংসারের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ছেড়ে তিনি কেন বনে তপস্যারত স্বামীর অনুগামী হবেন তদুত্তরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যে যুক্তি উপস্থাপন করেন তিনি, সে হল ভারতীয় নারীরই চিরন্তন মর্মকথা।

যেনাহম্ নামৃতস্যাম তেনাহং কিম্ কুর্য্যাম—অর্থাৎ যাহাতে অমৃত

নাই তাহা দিয়া আমি কি করিব।" মৈত্রেয়ীর এ কথার দ্বারা যুগে যুগে ভারতীয় নারীর আসল রূপটি উদঘাটিত হয়েছে। এই অমৃত সাধনার ব্রত নিয়ে আত্মত্যাগের দ্বারা যুগে যুগে ভারতীয় নারী সংসারের যাবতীয় কাজে সদাসর্বদা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। ভোগে নয়, নিঃশেষে আত্মত্যাগেই পরমলাভ, হিন্দুনারীর জীবনের পরম লক্ষ্য। তারই ফলস্বরূপ আমরা খনা, গার্গী, সতী, সাবিত্রী, পার্বতী, দ্রৌপদী, কুন্তী, অহল্যা, অরুন্ধতী দময়ন্তী, গান্ধারী, মন্দোদরী, গোপা, বেহুলা প্রভৃতিকে এই চারিত্রিক মাধুর্যে ভরা রূপে উদ্ভাসিতা দেখি। মোগল সাম্রাজ্যের সময় দেখি বেগম নূরজাহান ও শাজাহান-কন্যা জাহানারার মত অগাধ রাজনীতি-জ্ঞানসম্পন্না ও শৌর্যে-বীর্যে ভুবনবিখ্যাত আত্মসুখত্যাগী নারীকে। বিদূষী জাহানারা কেবল রাজনীতিতেই পারঙ্গম ছিলেন না—তিনি একজন উচ্চস্তরের কবিও ছিলেন। বহু উচ্চমানের কবিতা রচনা করে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আবার বিষ্ণুপ্রিয়া, রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, শ্রীশ্রীসারদামণি প্রত্যেকেই অমৃতের সাধনায় আত্মবলিদান করে ভারতীয় নারীর গৌরব বৃদ্ধি করে গেছেন। ত্যাগ, তিতিক্ষা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণাবলীর দ্বারা ভারতীয় নারী আজও জগৎসভায় শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন "হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।"......"এ দেশ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভার, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখিলাম না।" ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় সুপণ্ডিত পাশ্চাত্য ম্যাক্সমূলার ভারতীয় নারীর সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলেছেন, "ভারতের নারী জাতির উদ্দেশে আমি দূর থেকে প্রণাম করি। তাঁহারা চির-আরাধ্যা—দেবীতুল্যা। তাই বুঝি তাঁদের কোন তুলনা নাই। ভারতীয় নারীর আদর্শ যেদিন

সারা বিশ্বের নারীজাতি অনুসরণ করবে, সেদিন বিশ্বের পক্ষে এক পরম শুভদিন।

"ভারতীয় নারী অনুকরণীয়া। কারণ তাদের মধ্যে যে অজস্র গুণরাজি বর্তমান, তার তুলনা মেলা অসম্ভব।"

ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন: "যে পবিত্র গুণরাজির জন্যে ভারতীয় নারীর কথা চিন্তা করলেই আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে, তা হলো ভারতীয় নারীর ত্যাগ, ক্ষমা, মমতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি অসাধারণ গুণাবলী।"

পাশ্চাত্যের এই মহামনীষীদ্বয়ের কথার দ্বারাই প্রমাণিত হয় বিশ্বে ভারতীয় নারীর ত্যাগ-মাহাত্ম্যের গৌরব। এই ত্যাগ-মাহাত্ম্যে প্রোজ্জ্বল আর একটি নাম শ্যামমোহিনী। বস্তুতঃ শ্যামমোহিনীর ত্যাগ-মাহাত্ম্যে অত্যুজ্জ্বল জীবন-চরিত-কথা কিছু বলতে গেলে ভারতীয় নারীচরিত্রের চিরন্তন রূপটি স্বতঃই মনে পড়ে। আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ আমার এ আলোচনাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করবেন না।

আবার আমরা প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সুরেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক আগ্রহে শ্যামমোহিনী একদিকে নিজে অনবরত পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন—অন্যদিকে শাশুড়ীর নির্দেশে তিনি গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াতে আরম্ভ করেছেন। যতদিন তিনি শ্বশুরবাড়ী থাকেন, ততদিন পড়ান, আবার বাপের বাড়ী গেলে পড়ানো সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের বেশী করে হোম টাস্ক (বাড়ীর কাজ) দিয়ে যেতেন যাতে তাদের অধীত বিদ্যা অনভ্যাসে হ্রাস না পায়। এ ছাড়া শিক্ষানুরাগী শাশুড়ী লেখাপড়া না জানলেও এদের নিয়ে বসতেন। যাদের কিছু অক্ষরপরিচয় হয়েছে, তাদের অন্যদের দেখিয়ে দিতে বলতেন। গ্রামের লোকেরা শ্যামমোহিনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত এবং শাশুড়ীকে বলত আপনার বৌ খুব যত্ন করে লেখাপড়া শেখায়। গরীব-বড়লোক বলে কোনো

বিভেদ নেই, সকলকে সমানভাবে শিক্ষা দেয়। খুব বোকা বলে সকলে যাকে জানে তাকেও কত যত্ন করে শেখায়। বোকা ছেলের মা-ই এসে বলতেন, 'এমন বোকা ছেলে আমার লিখতে-পড়তে পারবে এ কখনও ভাবিনি। কিন্তু আপনার বৌ যেন যাদু জানে—যাদুমন্ত্রে তাকে লিখতে-পড়তে শিখিয়েছে।' একবাক্যে শ্যামমোহিনীর শিক্ষা-প্রণালীকে প্রশংসা করতেন তাঁরা। একথা শুনে শাশুড়ী পুত্রবধূগর্বে গর্বিত হন। এই মেয়েই বিবাহ করব—ছেলের সেদিনকার এই আবদারকে তিনি এখন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

জমিদারী সেরেস্তার খাজনা আদায়

ভাশুরগণ শিক্ষিতা ভ্রাতৃবধূ শ্যামমোহিনীর উপর নিরক্ষর ছেলেমেয়েকে পড়ান ছাড়াও আর একটি কঠিন কাজের ভার দেন। ভাশুরগণ সবাই তখন বাইরে-বাইরে চাকরি করতেন। সুরেন্দ্রনাথ তখনও ছাত্র। কুচবিহারে দিদির বাসায় থেকে পড়াশুনা করেন। এ কারণে জমিদারী দেখাশুনা ও খাজনা আদায়ের বড়ই ব্যাঘাত ঘটত। ভাশুরগণ জমিদারীর কাগজপত্তর সমস্ত কিছু শ্যামমোহিনীকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন—বৌ এখন থেকে জমিদারীর খাজনা আদায় করবে। শ্যামমোহিনী সানন্দে এ কাজেরও ভার নিলেন শাশুড়ীর সহযোগিতায়। শ্যামমোহিনী আমায় বললেন, "আমি ঘোমটা দিয়ে ভিতর-ঘর থেকে খাজনা আদায় করতাম। দাখিলাপত্র লিখে দিতাম। পাশে আমার শাশুড়ী বসে থাকতেন। কথাবার্তা যা কিছু তিনিই বলতেন—জমাখরচের হিসাব আমিই রাখতাম।

"আমার শ্বশুরবাড়ীর প্রচুর জোতজমা ছিল। তার ধান-পাট আদায় করা, হিসাব রাখা এসব আমায় করতে হত। এ ছাড়া আমার শ্বশুরবাড়ীতে হাল, লাঙ্গল, গরু, জনমজুর, চাষ-আবাদের সাজসরঞ্জাম সবকিছুই ছিল। রান্না-বান্না থেকে ধান লওয়া, বাসন মাজা প্রভৃতি যাবতীয় গৃহস্থালীর কাজ বৌদের নিজেদের হাতে করতে হত।

বড়-বড় মাটির ঘর। বেড়া মুলীবাঁশের। ঘর লেপা, কাপড় কাচা, উঠোন ঝাঁট দেওয়া সংসারের এসব কাজও নিজেদের হাতেই করতে হত। নিত্য লক্ষ্মীপূজা, গৃহদেবতার পূজা সে-সবও বৌদের করতে হত। জায়েরা লেখাপড়া জানতেন না। আমাকে দিয়ে পড়ানো, জমিদারীর খাজনা আদায় এইসব করতে দেখে প্রথম-প্রথম আমার জায়েদের হিংসে হত। ঈর্ষান্বিতা তাঁরা বিদ্রূপ করে বলতেন, —'উনি তো এখন সেরেস্তায় বসবেন—এখন তোমরা সব খেটে মরো।'

"একথা শুনে আমি খুব ভোরে উঠতাম। যত শিগ্‌গীর পারি... বাসন মাজা, বিছানা তোলা, ঘর লেপা, উঠোন বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতাম। তারপর হিসাব নিয়ে বসতাম। হিসাবনিকাশ শেষ করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়াতে বসতাম। শাশুড়ী আমার ব্যবহারে অত্যন্ত খুসী। তিনি অন্য বৌদের বলতেন, তোরা তো সব মুখ্যু, সুরুর বৌ লেখাপড়া-জানা মেয়ে, তার ব্যবহার ছাখ্।"

পার্শ্ববর্তী গাঙ্গবিহলী গ্রামের ডাক্তার অভয়চরণ কর নামে এক যুবক ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে এল. এম. এফ. পাশ করে গ্রামে আসেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা হাটাইল মধুপুর গ্রামে ডিসপেন্সারী খুলে বসবেন। তিনি শ্যামমোহিনীর শাশুড়ীকে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বললেন, 'ঠাকুরমা, যদি আপনি আপনার বাড়ীতে আমাকে ডিসপেন্সারী করতে জায়গা দেন, তাহলে আমি এখানে বসে গ্রামের লোকদের চিকিৎসা করতে পারি।' পরমানন্দে রাজী হলেন ঠাকুরমা। কারণ ডাক্তারের অভাবে বিনা চিকিৎসায় গ্রামের কত দরিদ্র মানুষ প্রাণ হারায়। নিত্য ঘরে-ঘরে শোকের করাল ছায়া নেমে আসে। তিনি নিজে টোটকা চিকিৎসা করেন। কিন্তু তিনি এখন এমন একটি সুযোগ পেয়ে তা হাতছাড়া করতে কিছুতেই রাজী নন। তিনি ডাঃ করকে তাঁর বাড়ীতে জায়গা দিলেন। ডাক্তার কর ঐ বাড়ীতে ডিসপেন্সারী দিয়ে আশেপাশের সর্বস্তরের গ্রামের লোকদের চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। ঐ ডাক্তার করই

শ্যামমোহিনীর শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'ঠাকুরমা, তোমার বউ তো এত লেখাপড়া জানে, তোমাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না?' তদুত্তরে তাঁর শাশুড়ী বলতেন, 'না দাদু ভাই, লেখাপড়া-জানা বউ আমার ঝগড়া করতে জানে না।'

এ থেকেই বোঝা যায় শ্বশুরবাড়ীতে শ্যামমোহিনীর ব্যবহার কেমন ছিল। আর কিশোর বয়স থেকে তিনি বহুমুখী কর্ম করার অফুরন্ত শক্তি রাখেন।

শ্যামমোহিনীর স্বামী সুরেন্দ্রনাথ বিবাহের পর মাত্র চার বৎসর জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে দুই বৎসর মাত্র সুস্থ ছিলেন তিনি। শেষ দুই বৎসর অসুস্থতায় কাতর হন। প্রথম দুই বৎসর দিদির কুচবিহারের বাসায় থেকে বি. এ. পড়তেন। তবু স্ত্রীকে শিক্ষিত করে দেশের বিপুল অশিক্ষা স্ত্রীকে দিয়ে দূর করবেন এই ছিল সুরেন্দ্রনাথের মনের একমাত্র ঐকান্তিক অভিলাষ।

স্ত্রীকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার সুতীব্র সে আকাঙ্ক্ষা সুরেন্দ্রনাথ এমনি করেই পূরণ করার ব্রত নিয়েছিলেন। স্বামীগর্বে পরম গৌরবান্বিতা স্ত্রী শ্যামমোহিনী ৭০ বৎসর পরেও সে কথা স্মরণ করে কতই না আনন্দ পান আজ—"যখন বাপের বাড়ী যেতাম, স্বামী বলে দিতেন আমার ছোট ভাই রাজেনের কাছে পড়া দিতে। অনবরত পড়া এগিয়ে যাচ্ছে। পড়া দিচ্ছেন—সেই বই পড়া—প্রশ্নোত্তর লিখে রাখা—চার বৎসরের মধ্যে সর্বসাকুল্যে তিন চার মাস স্বামীর সঙ্গে একত্র বাস করেছি। প্রথম দু'বৎসরই বেশী। কিন্তু এই সময়টুকু আদরে সোহাগে কেবল পড়াশুনার কথা নিয়ে কেটেছে। কি করে দেশের বিপুল অশিক্ষা দূর করা যায়—বার-বার কেবল ঐ এক কথাই বলে' স্বামী আমাকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তারপর আমার স্বামীর অসুখ হ'ল। এরপর স্বামীর কাছে আমার আর যাওয়াও নিষিদ্ধ হল।

আমাদের কালে বৌদের কেবল প্রকাণ্ড ঘোমটা দিয়ে থাকতে

হত। ভাশুর-দেওর তো নয়ই, এমন কি শাশুড়ী, জ্যেঠী-শাশুড়ী, খুড়-শাশুড়ী, পাড়ার-শাশুড়ী কারো সঙ্গে কথা বলার রীতি ছিল না। তবে নিতান্ত ছোট দেওর ও ননদের সঙ্গে কথা বলায় কোনো বাধা ছিল না।

স্বামীর জন্য রান্নাবান্না করছি—খাবার দিচ্ছি তবু দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে না—প্রকাণ্ড ঘোমটা দিয়ে আছি কেবল। আর্ত্ত পীড়িত স্বামীর পার্শ্বে বসে বৌ স্বামীর সেবাশুশ্রূষা করবে সে যুগের অল্পবয়স্কা স্ত্রীরা একথা কল্পনায়ও আনতে পারত না। চিত্রাঙ্গদা নারী তখন নারীর মধ্যে গুমরে মরছিল। সংসারের হাড়ভাঙা খাটা-খাটুনীর পর খেয়েদেয়ে রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত শাশুড়ীর পায়ে তেল মালিশ করে দিতাম। কিন্তু শাশুড়ী ভুলেও কখনও বলতেন না, 'বউ, যাও, গিয়ে শুয়ে পড়ো, অনেক রাত হয়েছে, আর দিতে হবে না।' ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসত। ভয়ে-ভয়ে এগারটা-বারটায় উঠে স্বামীর ঘরে যেতাম। ক্লান্তিতে তখন আর পড়া হতো না, তবু স্বামী-সঙ্গ-সুখে আমার সে নিদারুণ শ্রান্তি-ক্লান্তির অবসাদও দূর হয়ে যেত। কিন্তু সে-ও আমার কপালে বেশীদিন সইল না। কি ছিল বিধাতার মনে—সে সুখ থেকেও তিনি আমাকে চিরতরে বঞ্চিত করলেন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বামীর মৃত্যু

"অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয়
তার বক্ষে বেদনা অপার, অগ্নিসম দেবতার দান
উর্দ্ধমুখে জ্বালি চিত্ত অহরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।"

—রবীন্দ্রনাথ

শ্যামমোহিনীর যখন বিবাহ হয়, তার তিন-চার মাস পরেই ছোট দেওর অজিতনাথ মৈত্র কালাজ্বরে মারা যায়। তাঁর শাশুড়ীর চোদ্দ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে তাঁর বিবাহকালে তিন ছেলে ও তিন মেয়ে জীবিত ছিলেন। এই সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কালাজ্বরের খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। কালাজ্বরেরর ওষুধ তখন আবিষ্কার হয়নি। কোন্‌টা কালাজ্বর, কোন্‌টা ম্যালেরিয়া তা ধরতে পারেন না চিকিৎসকগণ। কালাজ্বরের ওষুধ-আবিষ্কারক ইউ. এন. ব্রহ্মচারী তখনও এই দুর্লভ ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেন নি। ফলে গ্রামে গ্রামে দেশের অসংখ্য মানুষ দুরারোগ্য কালাজ্বরে মারা যেত। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। কত সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেছে এই ব্যাধির কবলে পড়ে তার সীমাসংখ্যা নেই। শ্যামমোহিনীর স্বামী-হারানোর ভাগ্যবিপর্যয়ও হল এই কালব্যাধির প্রকোপে।

শ্যামমোহিনীর ছোট দেওরের মৃত্যুর পর তাঁর ভাশুর দেবেন্দ্রনাথ মৈত্রও কালাজ্বরে আক্রান্ত হলেন। দেড় বৎসরের মাথায় তিনিও মারা গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পাবনা জেলায় ভারেঙ্গা গ্রামে স্কুলমাষ্টারী করতেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তৎকালীন বি. এ. পাশ। মাষ্টারী পাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি শ্যামমোহিনীর মায়ের অনুরোধে করঞ্জা গ্রামে গিয়ে ছ'মাস থেকে তাঁর জমিদারী দেখাশুনা করেন। জমিদারীর কাজকর্মগুলো সুশৃঙ্খল করে দিয়ে আসেন। তারপর স্কুলমাষ্টারী পেয়ে চলে যান। দেবেন্দ্রনাথ দেখতে যেমন

সুপুরুষ ছিলেন স্বভাবটিও ছিল তাঁর তেমনি মিষ্টিমধুর। প্রথমে যখন করঞ্জা গ্রামে যান—করঞ্জা গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল—বাবা, মানুষ এত সুন্দর দেখতে হয়! তিনিও টাঙ্গাইলে মারা গেলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস। দাদার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে টাঙ্গাইল এলেন সুরেন্দ্রনাথ। ফিরে এসে তিনি মাকে জানালেন, মাগো, আমারও জ্বর হয়, পেটে প্লীহা।

সদ্য পুত্রশোকাতুরা মা। একমাত্র পুত্র জীবিত। তারও জ্বর হচ্ছে, পেটে প্লীহা শুনে মুহূর্তে শঙ্কায়-উৎকণ্ঠায় মা চমকে উঠলেন। সেইক্ষণে অজানা আশঙ্কায় তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল। তাহলে কি অবশিষ্ট এ ছেলেকেও ঐ কালব্যাধিতে ধরল! এখন উপায়? মা আর ভাবতে পারেন না। দিশেহারা মা অগত্যা বেয়ান গোবিন্দময়ীকে ব্যাকুল হয়ে সুরেন্দ্রনাথের অসুস্থতার খবর দিয়ে চিঠি লিখলেন। পত্রপাঠ শ্যামমোহিনীর মা গোবিন্দময়ী উৎকণ্ঠা নিয়ে ছুটে এলেন। এসেই তিনি জামাইকে কলকাতায় এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। অখিল মিস্ত্রী লেনে একটি বাসা ভাড়া নিলেন। তৎকালীন নামজাদা ডাক্তার রসিকলাল দত্তের অধীনে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ডাঃ দত্তের চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থও হলেন সুরেন্দ্রনাথ। এখন আর নিত্য জ্বর হয় না। অনেকটা আশান্বিত হলেন সকলে। স্বামীর সঙ্গে শ্যামমোহিনীও এসেছেন। অসুস্থতা-কাতর স্বামীর পাশে থেকে তাঁর সেবা-যত্ন-শুশ্রূষা করে' সারিয়ে তোলা নারীজীবনের এই একান্ত কাম্য কর্ম করার সৌভাগ্য অর্জন করে শ্যামমোহিনী এখন মনেপ্রাণে সেকাজে ব্রতী হলেন।

স্বামীসেবার সুযোগ

দুই বৎসরের উর্দ্ধে বিবাহ হয়েছে শ্যামমোহিনীর, কিন্তু এই প্রথম স্বামীকে মনের মত করে সেবা করার কিছুটা সুযোগ পেলেন। এর আগে বৈশাখ মাসে একসঙ্গে মাত্র কয়েকদিন বাপের বাড়ী ছিলেন স্বামী-স্ত্রী মিলে। স্বামী সঙ্গে করে নিয়েও এসেছিলেন শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম

হাটাইল মধুপুরে। অতঃপর দিন পনের গ্রীষ্মের ছুটির অবকাশ কাটিয়ে কুচবিহারে চলে যান সুরেন্দ্রনাথ। এই কয়েকটি দিন শ্যামমোহিনীর সুস্থ স্বামীর আদরে সোহাগে কেটেছে। কেবল গল্প, কেবল গল্প, কত কথা, কত আদর-সোহাগ—রাতে ঘুম নেই। বিনিদ্র রজনী কেটেছে স্বামীর সোহাগে। অনাবিল স্বামীর ভালবাসায় ভরা সেই কটি দিনের মধুর স্মৃতি শ্যামমোহিনীকে আজ শতকাজের মধ্যেও রাতের অন্ধকারে শুকতারার মত পথ দেখায় এবং তাঁর মনে শক্তি সঞ্চার করে।

"এটা ঠিক যে যদি উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হয় এবং সেই পাত্রের সঙ্গে সত্যিকারের ভালোবাসা জন্মে, আর কিছুদিন তাঁর সঙ্গে আনন্দে ভালোবাসায়, আদরে-সোহাগে বাস করা যায় তাহলে সেই স্মৃতি নিয়ে সারাজীবন কাটানো যায়।" সেই কটি দিনের অবিস্মরণীয় মধুর স্মৃতি শ্যামমোহিনীকে অটুট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। "জ্ঞানালোকের অফুরন্ত ভাণ্ডারের রুদ্ধ দ্বার সেই যে আমার স্বামী খুলে দিয়ে গেছেন, সে বিচিত্র পথ বেয়ে জীবনের চারটি অধ্যায়ই অবলীলায় কাটিয়ে দিলাম আমি। আর স্বতঃই মনে হয় তেমন আর কিছু করতে পারলাম কোথায়। কত কিছু করার ছিল—দিন তো ফুরিয়ে এলো। তার সব করতে পারলাম কোথায়! তবু সান্ত্বনা, পথপ্রদর্শক স্বামী আলোকবর্তিকা হস্তে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন সারাজীবন; আমাকে দিয়ে নিরলস কর্ম করিয়েছেন, হিসাবের খাতা নিয়ে ব্যর্থতার জ্বালায় কর্মবিমুখ করেন নি কখনও। আর এইখানেই আমার যা কিছু সাফল্যের চাবিকাঠি।"

বর্তমান বৎসরে (১৯৭৪) সান্ধ্য বিভাগে বি. এড. কলেজ খুলেছেন শ্যামমোহিনী স্কুলমিসট্রেসদের ট্রেনিং-এর জন্যে। এই সঙ্গে শীঘ্রই কয়েকটি শয্যাবিশিষ্ট একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের কাজও চলছে। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মেয়ে ও কর্মী ছাড়াও স্থানীয় অধিবাসীরা চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।

এভাবে আরও দুটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হল তাঁর পরিষদে। তিনি মন্তব্য করলেন, "শেষদিন পর্যন্ত ঈশ্বর আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন এ যেন তারই নিদর্শন।"

যাক্ যা বলছিলাম। কলকাতায় এখন আবার শ্যামমোহিনী স্বামীসেবার সুযোগ পেলেন। অসুস্থতাকাতর স্বামীর পথ্য রান্না করে দেন, শিয়রে বসে পাখার হাওয়া করেন, কথা বলেন শ্যামমোহিনী। স্বামীও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, ভালোবাসেন। স্ত্রীর সান্নিধ্য-সুখে সাময়িক রোগযন্ত্রণা ভুলে থাকেন সুরেন্দ্রনাথ।

কিছুদিন কলকাতায় চিকিৎসাধীন থেকে সুরেন্দ্রনাথ ঢাকায় চলে গেলেন। আর শ্যামমোহিনী মায়ের সঙ্গে করঞ্জায় বাপের বাড়ী এলেন।

কিন্তু বাড়ীতে ফিরে সুরেন্দ্রনাথের কেবল স্ত্রীর সেবাযত্নের জন্য মন কেমন করে। তিনি ক্রমাগত চিঠি লিখতে থাকেন শ্যামমোহিনীকে; "আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে, তুমি চলে এসো, যতো সত্বর পারো মাকে বলে চলে এসো।"

চিঠির পর চিঠি। শ্যামমোহিনী হাটাইল মধুপুরে শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে এলেন। শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছতে ওঁর বিধবা এক ননদ যিনি বাপের বাড়ীতে থাকেন, বললে, 'বউ, তুমি কলকাতায় সুরুকে কি রান্না করে খাওয়াতে? আমাদের রান্না আর খেতে পারছেন না, তুমি এখন রান্না করে দাও।'

সামাজিক বাধানিষেধ

"রান্না করে দিয়েছি কিন্তু কথা বলার উপায় নেই। কাছে যেতে দেবে না শ্বশুরবাড়ীর লোকে। অসুস্থ স্বামী। ঘোমটা দিয়ে দূরে দূরে থেকেছি কেবল। কিন্তু আমারও খুব ইচ্ছা করে কাছে গিয়ে স্বামীর সেবা করি। স্বামীও আকুলিবিকুলি করেন কথা বলার জন্যে। কিন্তু গুরুজনদের উপস্থিতি সর্বদা সেখানে; সে আর হয় না। এভাবে ছ'মাস অতিক্রান্ত হল।

বিপদের পর বিপদ

"কথায় বলে বিপদ কখনও একা আসে না। হলোও তাই। আমার স্বামীর অসুস্থতা বেড়েই চলল। কোন চিকিৎসায়ই কিছু সুফল হচ্ছে না—তদুপরি অকস্মাৎ আকস্মিক সে দুর্ঘটনা ঘটল। শ্বশুরবাড়ীতে আগুন ধরল। আগুন লেগেছিল পাশের বাড়ীতে। সেই আগুনের লেলিহান শিখার স্ফুলিঙ্গ এসে আমার শ্বশুরবাড়ীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছোনের ছাওয়া ঘর দ্যাখ-দ্যাখ করতে-করতে পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল। কিছু-কিছু জিনিষপত্তর অবশ্য উদ্ধার করা হয়েছিল কিন্তু সে সামান্যই। মজুত যত কিছু ধানচাল আসবাবপত্তর সবই সে আগুনের কবলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। আকস্মিক এ দুর্ঘটনায় শাশুড়ী নিরুপায়। তিনি বৌদের যে-যার সব বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। আর আমার স্বামীকে নিয়ে আমার শাশুড়ী, বিধবা ননদ ও মামাশ্বশুর মধুপুরে চেঞ্জে গেলেন।

স্বামীর সঙ্গে যাওয়া নিষিদ্ধ

"আমার স্বামীর সঙ্গে যাওয়া নিষিদ্ধ কিন্তু এমন একটা ব্যবস্থা কেউ করে দিল না যাতে চেঞ্জে যাওয়ার পূর্বে স্বামীর সঙ্গে দুদণ্ড দেখা করে আমি দুটো কথা বলতে পারি। এমন কোনো উপায় ছিল না। এমনি বিচিত্র ছিল তৎকালীন সামাজিক প্রথা ও তার নিয়মকানুন। অল্পবয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বালাই ছিল না আত্মীয়-স্বজন-গুরুজনদের কাছে। তাঁরা যেমন ব্যবস্থা করবেন তেমন ভাবেই তাদের চলতে হবে, বিশেষ করে বৌদের।

"কি কঠিন যুগের বৌ ছিলাম বলার নয়। কেবল ঘোমটা দিয়ে থেকেছি। চিরজীবন এটা আমার কষ্ট। উনি আমার উপর কত অভিমান নিয়ে চলে গেলেন। মা পাঠালেন না, ডাক্তারের বারণ। কিছু হয় যদি তাহলে বলবে সবাই—বারণ ছিল, তা বউ সে বারণ শুনলে না। কাছে থেকে স্বামীকে সেবা করার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হলাম।

"আমি সঙ্গে না যাওয়ায় উনি অনবরত আমাকে চিঠি লিখতে থাকেন ; তুমি চলে এসো, আমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে। তবু আমি না যাওয়ায় তিনি এরপর আমি যত চিঠি লিখেছি—একটিরও উত্তর দেননি। অভিমান হয়েছিল…আর আমার কেবলই মনে হত—এমন রূপবান স্বামী আমার, মনে মনে ভাবতাম,—আমার কত বড় ভাগ্য, এমন রূপবান বিদ্বান স্বামী পেয়েছি—একি আমার কপালে সইবে ? আমি আমার কয়েকটি গহনা পার্সেল করে পাঠিয়েও দিলাম যাতে চিকিৎসার ত্রুটি না হয় কিন্তু সবই বৃথা হলো। এমনকি মৃত্যুর সময় পর্যন্তও কোন একটা কথা বলা হলো না, কেউ একটু সে ব্যবস্থাও করে দিল না।

"আমার স্বামী আমাদের বিবাহের পর অল্প কয়েকদিন মাত্র বেঁচে ছিলেন, তথাপি আমাকে কি যে ভালোবেসেছেন ! চিঠিপত্রে কত কথা, কেবল কথা। কত সোহাগ-আদর-যত্নের কথা।

"তবু এ মনস্তাপ আমার সারাজীবন ঘুচল না। কেন আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না ? কেন আমি সব বাধা ঠেলে এ সামান্য কাজটাও করতে পারলাম না ? অকারণ অতিশয় লজ্জা অত্যন্ত খারাপ—মেয়েদের নীচু করে রাখে। স্বামী মারা যাচ্ছে, সেই মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর সঙ্গে পাশে বসে দুটো কথা বলো বউ, এ সুযোগটুকুও কেউ করে দিলে না। আর আমি ? আমারও একটু জ্ঞান হলো না, একটু জোর করে স্বামীর কাছে গিয়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। সারাজীবন তার জন্যে নিজেকে কত যে ধিক্কার দিয়েছি, কত যে অনুশোচনা করেছি—কেন এ অসঙ্গত লজ্জা !

"আমার স্বামী অসুখের পর ছয় মাস বাড়ীতে ছিলেন। হয়তো বা ঘাটে গেছি, একটু ফাঁক পেয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন—"সর্বদা সৎ কাজ আর সৎ চিন্তা করবে। কেউ যেন তোমার নিন্দা না করে।

"আবার হয়তো এক ফাঁকে খাবারঘরে পলকমাত্র দেখা হলো—বললেন, দুঃখ করো না, ব্যথা পেও না—দেশের অশিক্ষা বিপুল, শিক্ষা বিস্তারই যেন তোমার লক্ষ্য হয়। সংসারের সংকীর্ণতার গণ্ডীগুলি অতিক্রম করে বৃহত্তম সংসারে খুঁজে নিও তোমার স্থান। আমার অভাবে মুহ্যমান হয়ো না—একা আমি বহুর মধ্যে ও তোমার কর্মের মধ্যে পরিব্যাপ্ত রব—এই অমোঘ সান্ত্বনাই যেন তোমার পাথেয় হয়।"

যে অমোঘ ব্যাধিতে সুরেন্দ্রনাথের ছোট ভাই গেছে, দাদাও গত হয়েছেন—সেই কালরোগ—কালাজ্বর, অবশ্য তখন কালাজ্বর বলে কেউ জানত না—বলতো ম্যালেরিয়া পালাজ্বর, সেই কালাজ্বরে ধরেছে তাঁকে—এ থেকে নিস্তার নেই এ বিশ্বাস বুকে নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ স্ত্রী শ্যামমোহিনীকে তাঁর ভাবী চলার পথ নির্দেশ করতে থাকেন—আত্মীয়স্বজন গুরুস্থানীয়দের কড়া পাহারার ফাঁক দিয়ে।

অবশেষে সেই অমানিশার ঘোর অন্ধকার রাত্রি নেমে এল শ্যামমোহিনীর জীবনে। ইংরেজী ১৯০৪ সাল। বাংলা ১৩১১ সাল। কার্তিক মাস। আগমনীর আগমনে আনন্দে অবগাহন করে বাঙালী সবেমাত্র বিসর্জনের বিষাদ রাগিণী নিয়ে গিরিকন্যা উমাকে বিদায় দিয়েছেন।

সে দিনটি ছিল বিজয়া দশমীর পরের দিন। একাদশী। সুরেন্দ্রনাথের জীবনদীপ চিরতরে নির্বাপিত হল। কিন্তু কি করে এত ত্বরান্বিত হল সে কথাই বলছি। আগেই বলেছি ঢাকার বাড়ী আগুন লেগে পুড়ে গেলে সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে আত্মীয়স্বজন গেলেন স্বাস্থ্যকর স্থান বিহার প্রদেশের মধুপুরে। ফেরার পথে আসছিলেন তাঁরা ষ্টীমারে করে। ষ্টীমারে উঠতে গিয়েই বিপত্তি ঘটল—প্রচণ্ড আঘাত পেলেন সুরেন্দ্রনাথ ষ্টীমারের কাছিতে ডান পায়ের আঙ্গুলে। একে কালাজ্বরে ভুগছেন, রক্তশূন্য হয়ে গেছেন, তদুপরি এই প্রচণ্ড আঘাত। সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। ডাক্তার ডাকা হল—তিনি দেখেই বললেন, 'এখানে কিছু করার নেই,

এক্ষণি ঢাকা সহরে নিয়ে যেতে হবে—পায়ে গ্যাংগ্রিণ হয়েছে। নতুবা সর্বশরীর বিষাক্ত হয়ে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হল। কি মনে করে এবার শ্যামমোহিনীকেও সঙ্গে নিলেন তাঁরা। কিন্তু একমাত্র ঘোমটা দিয়ে কেবল গুরুজনদের সম্মান দেখানো—তাঁদের নির্দেশ মত চলা ছাড়া তাঁর আর যেন কিছু করার নেই। বাজিকরের খেলনা পুতুল যেন শ্যামমোহিনী। যেমন খেলাচ্ছেন তেমনি খেলতে হচ্ছে তাঁকে, স্বীয় অস্তিত্ব বলে যেন কিছু নেই তাঁর।

সব চিকিৎসা ব্যর্থ করে দিয়ে সুরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়েছে। শেষবারের মত চতুর্দিকে তাকিয়ে কাকে খুঁজছেন তিনি। সুরেন্দ্রনাথের অন্তিম ইচ্ছা হয়তো ছিল কিছুক্ষণ স্ত্রী শ্যামমোহিনীর হাতে হাত রাখবেন। শেষবারের মত অশ্রুসজল বিয়োগব্যথা-কাতরা স্ত্রীকে কাছ থেকে দেখবেন। চিরবিরহ-যন্ত্রণার শেষ আশ্বাসবাক্য ভবিষ্যৎ সান্ত্বনার ছুটি কথাও বলে যাবেন—নিজেও শান্তিতে বিদায় নেবেন। যখন আর কোনদিন শ্যামমোহিনীর শত বুকফাটা ক্রন্দনেও অমৃতপথযাত্রী সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না তখন স্বামীর এই মৌন হাতের স্পর্শই সুখস্মৃতি—কত সান্ত্বনাই এনে দেবে বিয়োগ-বিধুরা শ্যামমোহিনীকে। অন্তরের এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়েই হয়তো বা আকুল হয়ে স্ত্রী শ্যামমোহিনীকে খুঁজছিলেন সুরেন্দ্রনাথ।

সুরেন্দ্রনাথের অন্তিম সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল না। লজ্জা, সংস্কার কাটিয়ে তিনিও স্ত্রীকে কাছে ডাকতে পারলেন না। শেষ সময় পুত্রের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে শাশুড়ী কি মনে করে বললেন, বউ, তুমি এখানে এস। শ্যামমোহিনী গেলেনও। অন্তিম ইচ্ছার কোনো কথা হয়তো তখনও বলতে পারতেন তাঁর স্বামী তাঁকে, কিন্তু কেউ একটু উঠেও গেল না—মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর সঙ্গে শেষ একটা কথা বলুক বউ—এ

সুযোগও কেউ শ্যামমোহিনীকে দিলে না। চারিদিকে ঘিরে রইল অনড় শাশুড়ী, ননদ, মামাশ্বশুর ও গুরুস্থানীয় আত্মীয়স্বজনেরা। মানুষ চলে যাক তার শেষ ইচ্ছাটুকু বুকে চেপে, কিন্তু সমাজের অহেতুক অনুশাসন তবু থাক। এই হৃদয়-বিদারক স্মৃতি মনে করে এই ছিয়াশী বৎসর বয়সেও শ্যামমোহিনীর অনুশোচনা ও ক্ষোভের অন্ত নেই। আজও কথাটা মনে পড়লেই তিনি নিজেকে ধিক্কার দেন —কেন এ অহেতুক লজ্জা। স্বামী চিরতরে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তবু কেন আমি একটা কথা ঘোমটা তুলে গুরুজনদের সামনেই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। জোর করে তাঁর কাছে যেতে পারলাম না। এ অহেতুক লজ্জার কথা মনে করে এখনও রাতের গভীর অন্ধকারে দুঃসহ যাতনায় শ্যামমোহিনীর হৃদয়তারে করুণ বেহাগ রাগিণী বাজতে থাকে। অব্যক্ত হৃদয়বেদনায় সমস্ত দেহমনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হয় শ্যামমোহিনীর—সমুদ্রের ঢেউ-এর মত সে আলোড়ন কিছুতেই যেন থামতে চায় না। স্বীয় জীবনের এই নিদারুণ হৃদয়-বিদারক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপলব্ধি নিয়ে সমাজ থেকে মেয়েদের উপর আরোপিত এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর নির্মম বাধানিষেধের শৃঙ্খল মোচন করতে জীবন উৎসর্গ করেছেন শ্যামমোহিনী। সার্থক তাঁর সে জীবনসাধনা আজও নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে।

আজ নারীপ্রগতির যুগ। পরিবর্তনশীল যুগে পরিবর্তনের স্রোতে এই সব মহীয়সীর আত্মত্যাগের দ্বারা আজ আমরা কোথায় এসে ঠেকেছি সে বিচার করবে কাল। তবু পরিবর্তনই জীবনের গতি যদি বলি তবে এ যুগে নারী আজ অনেক প্রগতিশীলা—সামাজিক নিয়ম-নিগড়ের নির্মোক খুলে আধুনিকা। নারা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে সামাজিক অধিকার ভোগদখলের অধিকারিণী—সে কথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

১৯৪৭ সাল। ১৫ই আগষ্ট। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্বাধীনতালাভের পর ভারতীয় নারী তার লুপ্ত সমস্ত অধিকার অর্জন

করেছে ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ও হিন্দুবিবাহ আইন পাশের মধ্য দিয়ে। এই আইনের খসড়া তৈরী করেন স্বাধীন ভারতের তৎকালীন আইনমন্ত্রী বিশ্ববরেণ্য আইনজ্ঞ ও বাগ্মী মানবদরদী ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। অক্লান্ত ক্লেশ ও বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এই মহানুভব মানবদরদী সমাজের নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীর বৃহদংশ নারীর স্বাধিকার আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। বহু-বিবাহ রোধ, পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের সমানাধিকার প্রভৃতি আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যুগ যুগ ধরে পতিত, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, অস্পৃশ্য নামে অভিহিত আর এক মানবগোষ্ঠীকেও তিনি অস্পৃশ্যতা নিবারণ আইন পাশের দ্বারা মানবিক মর্যাদা দান করে গেছেন। কিন্তু মুসলমান নারী ও আরো কতিপয় জাতির নারী সে সুযোগ পায় নি। আইনের বাধানিষেধ এখনও তাদের উপর থেকে দূর হয় নাই। সব বাধা তুলে দিক ভারত সরকার—এই কামনা করি আমরা।

নারীর ক্রীতদাস জীবনের মুক্তিযোদ্ধা

নারীর পূর্বের এই ক্রীতদাস জীবনের দুরপনেয় দুর্দশা মোচনার্থে জীবনব্যাপী নিরলস নিঃস্বার্থ সাধনায় সিদ্ধিলাভে উৎসর্গীকৃতা জীবনের অপর নাম শ্যামমোহিনী। বাঙালী মাত্রই তাঁর সে দেশহিতৈষণা ও উৎসর্গীকৃত জীবনের কাছে অশেষ ঋণী।

কিন্তু দুঃখের সহিত আজ একথা না বলে পারছি না—ভারতীয় নারীর শাশ্বত আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল কল্যাণ রূপ থেকে আজকের মেয়েরা আমরা অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছি। কেবল লাগামহীন ভোগসর্বস্ব আত্মসুখের পিছনে হন্যে হয়ে ছুটে ছুটে ক্রান্তিদর্শী কবির কল্পনার সেই নারীমূর্তি ঃ

"লক্ষ্মী সে কল্যাণী বিশ্বের জননী
তারে জানি স্বর্গের ঈশ্বরী।"

হারিয়ে এ কোথায় চলেছি আমরা। বর্তমানে একথা ভেবে দেখার সময় এসেছে, কিন্তু যে সামাজিক কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর শ্যামমোহিনীকে স্বামী সুরেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যসুখ থেকে বঞ্চিত করে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখল—অন্তিমযাত্রী স্বামীর সঙ্গে শেষ দুটো কথা বলার পর্যন্ত সুযোগ করে দেবার প্রয়োজন মনে করল না, সেই হৃদয়-বিদারক নিষ্ঠুর প্রথা থেকে এখনকার নারী সম্পূর্ণ মুক্ত। এই সব মহীয়সীদের দীর্ঘ আন্দোলনের পর নারী সর্বদিকে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করেছে। তাইতো ভারতের ন্যায় বৃহত্তম গণতন্ত্রী দেশের মহিলা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী (১৯৬৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী) হয়েই ঘোষণা করলেন, "আমি নিজেকে মহিলা হিসাবে দেখি না—আমি কাজের লোক, কাজ নিয়ে থাকতে ভালোবাসি।" তবু বলি, কোথায় যেন নারী আজ বড্ড বেশী বল্গা-হীনা হয়ে পড়েছে। কোথায় যেন তার চলার সঙ্গে একটা উচ্ছৃলতা এসে গেছে বেশী মাত্রায়, বল্গাহীন চলাফেরার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ভয় হয় এই অতিপ্রবণতাকে, কারণ অতি কথাটাই ভাল নয়, মেয়েদের আবার কোথায় নিয়ে ফেলে। ভারতের নারীর শেষ কথা মা, মায়ের ত্রুটি সন্তানে বর্তায়, তথা দেশের উপর তার প্রতিক্রিয়া অবধারিত। কথায় কথায় অনেক কথাই এসে পড়ে, সেসব কথা এখন থাক। কিন্তু যে সাধিকারপূত চরিত্রের কথা কিছু লিখতে বসে আমার এ গৌরচন্দ্রিকা তিনি আধুনিক মেয়েদের সম্বন্ধে কি বলেন তা শুনে দেখি :

"এ যুগে মেয়েদের হয়তো অনেক জায়গায় বাড়াবাড়ি থাকে—সে প্রত্যেক কালে থাকে—কিন্তু আজকের মেয়েদের আনন্দ আমি চোখ ভরে দেখি। মাথায় ঘোমটা ছাড়া চলেছে নব-বিবাহিতা মেয়েরা। আর আমাদের সময়কার অবস্থা মনে করে এদের আনন্দ থেকে আনন্দ পাই।

"এগুলি জীবনের লক্ষণ। আমাদের সময় কেবল ভয়ে ভয়ে থাকা ;

ঘরে থাকা। আমি এতে খুব খুসী। একে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। উন্নতি-স্খলন শরীর থাকলে হবে, কিন্তু ইচ্ছা করলে মানুষ স্খলন সংশোধনও করে নিতে পারে। শিক্ষা পেলে মেয়েরা সাময়িক স্খলন হলেও আবার নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারে।”

“Man lives in deeds not in years”

শ্যামমোহিনীর স্বামী সুরেন্দ্রনাথ মাত্র ছাব্বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। তার মধ্যে মাত্র চার বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করলেও দুটি বৎসর কাটে শুধু অসুস্থতায় কাতর হয়ে। কিন্তু এই স্বল্প কয়েক দিনের দাম্পত্য-জীবনে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখে গেলেন তা জাতির পক্ষে পরম গর্বের বস্তু। মৃত্যুবরণ করে সুরেন্দ্রনাথ জাতিকে অমৃত দান করে গেছেন। সেই অমৃত পান করে যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিতা নিষ্পেষিতা দলে দলে নারী নবজীবন লাভ করে ধন্য হয়েছেন, এখনও হচ্ছেন। স্বীয় আত্মবলিদানের দ্বারা সুরেন্দ্রনাথ স্ত্রী শ্যামমোহিনীকে তাঁর যোগ্য আধার রূপে জাতির সেবায় দান করে যে প্রভূত উপকার করে গেছেন তাঁর সে অসামান্য অবদানের কথা বাঙালী কখনও ভুলতে পারবে না। অমর হয়ে রইল অল্পদিনের অথচ বিরল তাঁদের সে অনাবিল বৈশিষ্ট্যভরা দাম্পত্য প্রেম।

পথপ্রদর্শক সুরেন্দ্রনাথ

“দেশের অশিক্ষা বিপুল, শিক্ষাবিস্তারই যেন তোমার লক্ষ্য হয়। সংসারের সংকীর্ণতার গণ্ডীগুলি অতিক্রম করে বৃহত্তম সংসারে খুঁজে নিও তোমার স্থান। আমার অভাবে মুহ্যমান হয়ো না—একা আমি বহুর মধ্যে ও তোমার কর্মের মধ্যে পরিব্যাপ্ত রব······এই অমোঘ সান্ত্বনাই যেন তোমার জীবনের পাথেয় হয়।”

পুনরুল্লেখ হলেও সুরেন্দ্রনাথের উক্ত উপদেশাবলী যা' শ্যামমোহিনীর' জীবনে ধ্রুবজ্যোতির ন্যায় আজীবন কাজ করেছে অমোঘ শক্তিসম্পন্ন সে বানীকে এখানে উল্লেখ করে আমরা

তার যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করছি মনে করি। মূলতঃ সে পথের নিশানা ধরে শ্যামমোহিনী অতন্দ্র সাধনার দ্বারা স্বামীর অভিলাষ পূর্ণ করেছেন। পথনির্দেশের অভাবে কত মহৎ জীবন বিপথে চালিত হয়ে অঙ্কুরেই বিনাশ হয় এ তো আমরা হামেশাই দেখতে পাই। তবু এ কথা ঠিক, সবেমাত্র ষোল বৎসরের কৈশোর অতিক্রান্ত একটি স্ফুটনোন্মুখ মনের অবস্থা সেদিন কাউকে বুঝাবার মত ছিল না শ্যামমোহিনীর। জীবনসঙ্গী স্বামীকে চিরতরে হারিয়ে নীরবে অশ্রান্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। এক ফুৎকারে কে যেন তাঁর সামনে থেকে সব আলো নিভিয়ে দিলে। চারিদিক কেবলই শূন্যতায় ভরা বলে তাঁর মনে হতে লাগলো।

শাশুড়ীর মন্তব্য

মেজ মেয়ে বিধবা, নিজেও বিধবা, বড় বৌও বিধবা, এখন প্রিয় পুত্রবধূ শ্যামমোহিনীরও একই পরিণতি দেখে ভবানীসুন্দরী দেবী কপালে করাঘাত করে কেঁদে ফেললেন,—হা ভগবান! কেমন করে এই চার-চারটি বিধবাকে পালন করব!

শাশুড়ীর একথা শুনে চমকে উঠলেন শ্যামমোহিনী। মুহূর্তে বাঙালী সমাজে বালবিধবাদের করুণ দুর্দশার ছবি তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর তাঁর কেবলই মনে হতে থাকল—"বিধবা হলাম কিন্তু তার চাইতে আমি যে অপরের গলগ্রহ হলাম—এটাই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ, এমনও ভাবলাম ব্রাহ্মণের মেয়ে, গঙ্গার ধারে বসে গীতাচণ্ডী পাঠ করব—এক-আধটা পয়সা যা পাব তা দিয়ে চলবে অথবা কাশী চলে যাব, তবু কারো গলগ্রহ হব না।" এই রকম কত ভাবনা-অভিমান তাঁর মনে তখন। কারণ তৎকালীন হিন্দুসমাজে বালবিধবাদের যে দুর্বিসহ অভিশপ্ত গ্লানিকর জীবন, তার বহু ভয়াবহ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি; এখন নিজেই সে কবলে পড়ে অত্যন্ত বিহ্বলা-বিমূঢ়া হলেন।

সপ্তম অধ্যায়

পিতৃগৃহে গমন

১৯০৪ সাল। বৈধব্যজীবনের অনেক দুঃখবেদনার অভিসম্পাত শিরোধার্য করে শ্যামমোহিনী বাপের বাড়ী করঞ্জা গ্রামে ফিরে এলেন। এখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বৎসর।

মা গোবিন্দময়ী জীবিত। তিনি নিজেও ছয় বৎসর পূর্বে স্বামী-হারা হয়ে সংসারের বিরাট দায়িত্বে তৎসহ বিবিধ ধর্ম-কর্মে লিপ্ত আছেন। অকস্মাৎ যৌবনের সন্ধিক্ষণে আদরিণী কন্যা শ্যামমোহিনীও যখন বৈধব্যের দুর্বিসহ জ্বালা বুকে নিয়ে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়াল, তখন তিনি আর তাঁর উদ্বেলিত অশ্রুরাশি চেপে রাখতে পারলেন না। আকুল কান্নায় আকাশবাতাস মুখরিত করে তুললেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী মহিলা। অতল মাতৃহৃদয়ের শুভেচ্ছা নিয়ে মেয়েকে নানা ব্রত-উপবাস-ধর্মের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেন। একাধারে যেমন কন্যাকে স্বামীশোক ভুলিয়ে রাখতে সচেষ্ট হলেন, তেমনি আবার অকাল-বৈধব্যের সুতীব্র যাতনা থেকে মুক্ত করে বৃহত্তম কাজের মধ্যে কি করে মেয়েকে নিমগ্না রাখা যায় সে চিন্তায় বিভোর হলেন। প্রথম প্রচেষ্টা-স্বরূপ তিনি অনবরত মেয়ের কানে মন্ত্র দিতে থাকেন "সারা জীবনে কত প্রলোভন আসবে মা, কিন্তু আগুনের মত খাঁটি হবে —আগুনের মত পবিত্র থাকবে—আর চোখের দৃষ্টিতে রাখবে আগুন। তা হলেই কু-লোকের কু-দৃষ্টি তোমার চোখের দৃষ্টিতে ভস্ম হয়ে যাবে। স্তব্ধ হয়ে যাবে।"

মাতার এই উপদেশাবলী শ্যামমোহিনীর জীবনে ধন্বন্তরীরূপে কাজ করেছে বলে শ্যামমোহিনীর অটুট বিশ্বাস:

"আমি সারাজীবন কত পরীক্ষা করেছি। হয়তো গ্রামের পুকুরে কলসী কাঁখে স্নান করতে গেছি, বুঝতে পারছি পেছনে কে যেন আসছে। প্রথম প্রথম কিছু বলিনি। কিন্তু চেনা পরিচিত লোক।

বিড়বিড় করে 'যদি কলসী হতে পারতাম' প্রভৃতি বলতে বলতে পিছু পিছু আসছে। শুনে মাতার কথামত পেছন ফিরে চোখে স্ফুলিঙ্গ তুলে বলেছি—কে—রে···লোকটা তোতলাতে থাকত······ঠাকুরণ··· দি···দি···ছুটে পালিয়েছে। আর পাছে কেউ কিছু বলে তাই মায়ের কথামত অযাচিতভাবে সকলের কাজ করেছি। মায়ের উপদেশের চাক্ষুষ সুফল পেয়েছি।"

তীর্থদর্শন

দ্বিতীয় প্রচেষ্টাস্বরূপ মা মেয়েকে জমিদারী দেখাশোনার যাবতীয় ভার দিলেন। কন্যার সঙ্গে নিজেও একাজে সবিশেষ মনোযোগ দিলেন। কারণ পর পর কয়েকটি শোকে মুহ্যমান হয়েছিলেন তিনিও। ১৮৯৮ সালে বিপুল উপার্জনক্ষম স্বামীর মৃত্যু, তারপর ১৯০৪ সালে একমাত্র জামাই সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু অত্যন্ত কাতর করে তুলেছিল। তিনি মেয়েকে নিয়ে নানা ব্রতনিয়ম পালন করেন। মনের কিছুটা পরিবর্তনের জন্য তিনি ভুবনেশ্বর, পুরী, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান পরিদর্শনে যান মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। পরবর্তীকালে শ্যামমোহিনী চন্দ্রনাথ তীর্থ (চট্টগ্রাম), কামাখ্যা (আসাম), কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, মথুরা, সম্বলপুর, জয়পুর প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করেন। কিন্তু মনে তাঁর শান্তি নেই। অনুক্ষণ তাঁকে পীড়া দেয় কিছু একটা করতে হবে। তাঁর জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? সে কি শুধু প্রচলিত আচারনিষ্ঠা নিয়ে বৈধব্যের করুণ জীবন কাটান, না আরো কিছু, তিনি তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে থাকেন।

প্রেরণার উৎস স্বামী

শ্যামমোহিনীর সদ্য স্বামীহারা হাহাকারে ভরা হৃদয় হলেও এখন কিন্তু তিনি নিজেকে চিনবার অখণ্ড সুযোগ লাভ করলেন। অকাল বৈধব্যের বেদনার অশ্রুরাশির গহন মনের তল থেকে তিনি অনেক

মণিমুক্তা আহরণ করলেন। ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে শ্যামমোহিনী দৃঢ়-প্রত্যয় হলেন। স্বামী সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্দেশে থেকে তাঁকে প্রেরণা দান করতে লাগলেন। তিনি শিক্ষাবিস্তারে মনোনিবেশ করলেন। আর এ কাজে তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছে দুখানি বই। অনেক বই তিনি পড়েছেন।

"ছোটবেলায় শত শত বই পড়েছি। তার মধ্যে 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর' ও 'টম কাকার কুঠি' এই বই দুখানি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এই বই দুখানি পড়ার পর অনুক্ষণ তৎকালীন মেয়েদের নিগ্রোজাতির মত ক্রীতদাস বলে আমার মনে হত। আর অনবরত ভাবতাম—কি করে মেয়েদের জন্য বড়ো প্রতিষ্ঠান করা যায়—তাহলেই বড়ো কিছু করা যাবে।"

'নিগ্রোজাতির কর্মবীর' গ্রন্থ আমেরিকার নিগ্রোজাতির কর্মবীর বুকার টি, ওয়াশিংটনের জীবনকাহিনীর বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেন মহামনীষী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। অধ্যাপক সরকার বহু বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ধনবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর বহু পুস্তক রচনা করেছেন যেমন, তেমনি অন্যান্য পুস্তকাদিও রচনা করেন। 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর' গ্রন্থের অনুবাদ তাদের মধ্যে একটি। গ্রন্থখানিতে আমেরিকার নিগ্রোজাতির অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার কথা—ক্রীতদাস জীবনের ঘৃণ্য বেদনাময় অধ্যায়গুলি বিধৃত আছে। বুকার টি, ওয়াশিংটন নিগ্রোদের অমানুষিক ঘৃণ্য ক্রীতদাস-জীবনের অবসানকল্পে তাদের মানবিক ন্যায্য সর্বপ্রকার অধিকার দিতে আমৃত্যু যে সংগ্রাম করে গেছেন, গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয় তাই। এই গ্রন্থ পাঠ করলে নিগ্রোদের ক্রীতদাস জীবনের সঙ্গে এদেশের সে যুগের মেয়েদের জীবন সমান ছিল একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

'টম কাকার কুঠী' নামক বিখ্যাত উপন্যাসেরও প্রতিপাদ্য বিষয় একই। অবিস্মরণীয় এই উপন্যাসখানির লেখিকা একজন মহিলা।

নাম হ্যারিয়েট বীচার ষ্টোঈ। ১৮৫২ সালে এই অনবদ্য উপন্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি জঘন্য ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং এই কুপ্রথার দিকে সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের মূলে এই বইখানির অতুলনীয় অবদানের কথা বিশ্বে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীর ক্রীতদাস সম জীবন যাপনের দুর্দশা মোচনে বই দু'খানি শ্যামমোহিনীর নিকটে কেবল প্রেরণার উৎসরূপে কাজ করেনি, পথপ্রদর্শনও করেছে তাঁকে। শ্যামমোহিনী মনে মনে নিজেকে বুকার টি, ওয়াশিংটনের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। শ্যামমোহিনীর উপরোক্ত কথা এবং তাঁর আজীবন সাধনা নিঃসন্দেহে সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর অন্তরালে থেকে ঈশ্বরও তাঁকে সে সুযোগ করে দিলেন। স্বামীর অকাল মৃত্যু ঘটিয়ে এমন কি নারীর পূর্ণতা যে মাতৃত্বে, তা থেকেও শ্যামমোহিনীকে বঞ্চিত করে ভগবান তাঁকে বৃহত্তম কর্মক্ষেত্রে একান্তভাবে টেনে আনলেন। স্বামীর ঐকান্তিক ইচ্ছা শিক্ষাবিস্তার—কিন্তু কি করে স্বল্পব্যয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যায়—গ্রামের গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেদের মুখ বন্ধ করে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার দিকে এগিয়ে আনা যায়—এই হল তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। নিগ্রোজাতির কর্মবীর বুকার টি ওয়াশিংটন ভেতর থেকে শ্যামমোহিনীকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি প্রবল ইচ্ছাশক্তি মূলধন করে গ্রামের নিরক্ষরা মেয়েদের নিয়ে স্কুল আরম্ভ করলেন বাড়ীর অন্দরমহলে। তৎকালীন সমাজের মেয়েদের উপর যতকিছু অন্যায়-অবিচার-নির্যাতন ছিল তার মূলোচ্ছেদ করতে শিক্ষা অপরিহার্য বলে' শ্যামমোহিনীর বিদ্রোহী আত্মা দুর্জয় সাহসে ভর করে দৃঢ়তা নিয়ে একাজে ব্রতী হলেন। সমাজের শত ভ্রূকুটি তাঁকে একাজ থেকে বিরত করতে পারেনি।

অষ্টম অধ্যায়

করঞ্জায় অবস্থান

(১৯০৫—১৯১৮)

করঞ্জায় ফিরে এসে শ্যামমোহিনী বৈধব্যের মুখ কাউকে দেখাবেন না বলে এক বৎসর ঘর থেকে বের হননি। কেবল আচার-নিয়মনিষ্ঠা, দেববিগ্রহসেবা ও গৃহকাজ নিয়ে থেকেছেন। নিজেকে মহত্তর কাজের জন্যে প্রস্তুত করেছেন। এখন স্কুল খুললেন। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কালে স্বীয় বহু মূল্যের অলঙ্কারাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ লগ্নি করে তার সুদের টাকায় তিনি স্কুল আরম্ভ করলেন। এজন্যে অন্দরমহলে রান্নাঘরের সম্মুখে প্রকাণ্ড একখানি টিনের ঘর তুললেন, যাতে তিনি রান্না করতে করতেও মেয়েদের পড়াতে পারেন। এ ছাড়া পুরুষ মানুষ যাতে এখানে প্রবেশ করে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্যও এই ব্যবস্থা।

শিক্ষাবিস্তারকল্পে প্রথমে তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন :

১। যে-বস্তুগুলি পড়ার সহায়ক সেই পাঠ্যপুস্তক, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি যাবতীয় শিক্ষার উপকরণ তিনি নিজব্যয়ে কিনে দেন।

২। ছাত্রীদের যে প্রাইজ দিতেন তাতেও থাকত পঠন ও সেলায়ের সরঞ্জাম—যেমন, বই-খাতা-পেন্সিল-কলম, উল কাঁটা, সূঁচ-সুতো, কাপড়-চট প্রভৃতি।

৩। ছাত্রীদের তিনি একাই পড়াতেন, কারণ গ্রামে তখন পড়াবার মত সাক্ষর মহিলা ছিল না।

৪। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পড়াতেন।

৫। দশটা থেকে স্কুল বসত, কিন্তু মেয়েদের বাড়ীতে আপত্তি থাকতে পারে জেনে ছু'টোর মধ্যে যখন খুসী মেয়েরা আসতে পারে

বলে' তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। অপরাহ্ণ চারটে পর্যন্ত স্কুল চলত, এর কোন ব্যতিক্রম ছিল না।

গ্রামের লোকের মন্তব্য

শ্যামমোহিনী সহস্র কাজের মধ্যে নিযুক্ত থেকেও স্কুল খুললেন। সব ব্যয়ভারও আপন স্কন্ধে তুলে নিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও গোঁড়া সমাজপতিরা প্রমাদ গুণলেন—একটি বালবিধবার কাছে তাঁদের পরাজয়! এর কাছে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলতে হবে! প্রাচীনপন্থী অভিভাবকেরা নানারূপ মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে থাকেন। সর্বনাশ! মেয়েদের 'ল্যাকাপড়া'! মানে সংসার, স্বামীভক্তি, রান্নাঘর সব যে রসাতলে যাবে।

······লেখাপড়া শেখাবে, না, ছাই, এসব হচ্ছে টাকা রোজগারের ফন্দী, আর নিত্যনতুন সাজপোষাকের বাহার দেখানো। এইজন্যে স্কুল আরম্ভ করেছে। এই ভেবে তারা আর মেয়েদেরও পাঠাত না। সংসারের কাজ, ছেলেপিলে রাখা, মুড়িভাজা, চিড়ে কোটা, কাপড় কাচা, রান্না করা এইসব কাজের ক্ষতির অজুহাত দেখাত।

পড়ানোর পদ্ধতি

কিন্তু মেয়েদের পড়ার ইচ্ছা, তারা শ্যামমোহিনীকে ধরে বসল, আমরা পড়তে চাই, তবে মায়েরা যে আসতে দেয় না।

তখন শ্যামমোহিনী তাদের বললেন, 'তোরা এক কাজ করিস, তোরা খুব ভোরে উঠবি—উঠে মায়ের যাবতীয় কাজ সেরে আসবি। ভাইবোনদেরও কোলে করে নিয়ে আসবি।'

শ্যামমোহিনীর উপদেশমত মেয়েরা তাই-ই করতে আরম্ভ করল। ফলও ফলল। পিতামাতার মনে চেতনা এল। অবাক হয়ে দেখলেন তাঁরা মেয়েদের মধ্যে কাজকর্মে শৃঙ্খলাবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, পরিচ্ছন্নপ্রিয়তা, সম্ভ্রমবোধ, ভাইবোনের উপর

দরদ পূর্বের চাইতে বেড়ে গেছে। ভারী তাজ্জব ব্যাপার। তাঁদের বৈরীভাব অনেক দমিত হল। তাহলে লেখাপড়া শিক্ষা জিনিসটা নিতান্ত খারাপ নয়। মেয়েরা আর মা-বাবার মুখের উপর কথা বলে না। এসব দেখেশুনে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পিতামাতার তেমন দ্বিধা রইল না। পড়াতেও কোন খরচ লাগে না—সবই শ্যামমোহিনী দেয় যখন, যাক না। সর্বক্ষণ বাড়ী থেকে কেবল ঝগড়া কোন্দল, কাজে অনিচ্ছা, বদ্‌বুদ্ধি। কিন্তু মেয়েরা এখন সেসব কিছু করে না, বরং বিনয়ী নম্র ব্যবহার তাদের এখন।

শ্যামমোহিনী নিজেই এদের পড়ান, সেইসঙ্গে ঘরের সমস্ত কাজকর্মও নিজ হাতে করেন। তাঁকে দেখে মেয়েরা শেখে। বাড়ীতে পড়ার সময় পায় না—পড়া মুখস্থ হয়নি মেয়েটির। কি রে, পড়া হয়নি—পড়া তৈরী করতে সময় পাসনি, তা কি হয়েছে, এখন পড়া করে নে। একটি মেয়েকে বাংলা পড়তে আর একজনকে হাতের লেখা লিখ্‌তে, কাউকে বা অঙ্ক কষতে দিয়ে নিজেই চলে গেলেন ধান নেড়ে দিতে বা পূজার ভোগ রান্না করতে। পড়াতে পড়াতে মধ্যে মধ্যে উঠে গিয়ে এমনি কত কাজই করে এলেন শ্যামমোহিনী।

আষাঢ় মাস—কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, ধান নাড়া আছে উঠোনে—লোক আছে একাজের জন্যে, তবু তারা ঠিকমত নিজের কাজ করছে কিনা—নিজে গিয়েই হাত লাগালেন, অথবা ভাই স্কুলে যাবে, তাকে খেতে দিয়ে এলেন।

"খাটে খাটায় দ্বিগুণ পায়, বসে খাটায় অর্ধেক পায়"—এই প্রবাদ বাক্যের সঙ্গে তাঁর কর্মপদ্ধতির মিল আছে। নিজে খাটতেন বলে তাঁর ছাত্রী থেকে বাড়ীর আশ্রিত কর্মীবৃন্দ কেউ কখনও কাজে ফাঁকি দেবার কথা ভাবেনি, বরং তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। মেয়েরা বাপমায়ের কাছে সুখ্যাতি পেয়েছে। আজও তাঁর নিখিল ভারত নারীশিক্ষা পরিষদের মাথার উপরে নিরলস কর্মী তিনি। তাঁর কর্ম-

প্রেরণায় মুগ্ধ তাঁর প্রতিষ্ঠানের বড় থেকে ছোট বিভিন্ন কর্মী ; কারো কর্মে অবহেলা নেই। তাঁর এই ৮৬ বৎসর বয়সে এত কর্মীর মধ্যে তিনি নিশ্চিন্ত, এখন তিনি নির্ভাবনায় শুয়ে বসে থাকতে পারেন। কিন্তু গীতার সেই নিষ্কাম কর্মের অমোঘ বাণী "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" অর্থাৎ কর্মেই অধিকার আছে, ফলে নয়—তিনি স্বীয় জীবনে সংগুপ্ত করে নিয়েছেন, নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান করে চলেছেন—আশ্রিতজনদের কর্মপ্রেরণায় মাতিয়ে রেখেছেন। কোন কাজকেই তিনি তুচ্ছ মনে করেন না। সব কাজই ঈশ্বরের কাজ বলে করেন। আজও তিনি সময় পেলে আপন হাতে পরিষদের মেয়েদের তরকারী কেটে দেন, কি কি রান্না করতে হবে সেগুলির তালিকা ও পরিমাণ ঠিক করে দেন। চারিদিকে আজকাল যে শ্রমবিমুখতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার তুলনায় শ্যামমোহিনীর নিখিল ভারত নারীশিক্ষা পরিষদের কর্মী থেকে ছাত্রী সকলেরই কর্মে অবিচল নিষ্ঠা প্রশংসার দাবী রাখে, শ্রমের মর্যাদা সেখানে সমাদৃত। এর সব কৃতিত্ব শ্যামমোহিনীর। তাঁর এই শ্রমের মর্যাদার আদর্শ প্রতিটি মানুষে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে, আর সরকারী অফিসেও যদি অনুসৃত হয়, তা হলে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে যে রব উঠেছে তা অনেক পরিমাণে হ্রাস হবে এটা আমাদের সুনিশ্চিত ধারণা।

ধান তোলা বা পূজার ভোগ রান্না করা, ভাইকে খাবার দেওয়া প্রভৃতি সেরে এসেই তিনি মেয়েদের পড়া ধরলেন। দেখতে দেখতে শ্যামমোহিনীর স্কুলটির কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

পাবনা জেলায় বেরা নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে ছেলেদের হাই স্কুল ও মাইনর স্কুল ছিল।

শ্যামমোহিনীর ভাই রাজেন ঐ স্কুলে পড়ত। শ্যামমোহিনী বাড়ীতে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য স্কুল খুলেছেন—এই খবর রাজেনের কাছে শুনে আশেপাশের চার পাঁচমাইল দূরের গ্রাম থেকে মেয়েরা তাদের ভাইদের সঙ্গে স্কুলে আসতে লাগল। ভাইরা স্কুলে

আসার পথে বোনেদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যেত আর ফেরার পথে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেত।

এই সব মেয়ে বই-খাতাপত্তর সব নিজেরা আনতো। কিন্তু গ্রামের মেয়েরা কিছুই আনতো না। শ্যামমোহিনী এদের পড়ার সমস্ত কিছু দিতেন। বয়স্কা মেয়েরা যাদের বিবাহ হচ্ছে না— শ্যামমোহিনী তাদের যাবতীয় সামগ্রী দিয়ে পড়াতেন। যতক্ষণ না পড়া শেষ হচ্ছে কাউকে ছাড়েন নি।

বড় স্কুলের পাঠ্য পুস্তক নিয়মানুযায়ী পড়াতেন। ষাণ্মাষিক, বার্ষিক পরীক্ষাও তদনুরূপ নিতেন। পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধি-কারিণীদের পারিতোষিক দিতেন। আর সে পারিতোষিক দিতেন পাঠ্য পুস্তক, সেলাইয়ের সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি দিয়ে একথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই আর একবার উল্লেখ করছি।

সপ্তাহে দু'দিন সেলাই ক্লাস নিতেন। জামা, প্যাণ্ট, মাফলার যা কিছু মেয়েরা সেলাই করত, পরীক্ষা শেষে বিনামূল্যে সেগুলি মেয়েদের বাড়ী নিয়ে যেতে দিতেন। ছাত্রীদের টিফিনও খেতে দিতেন মুড়ি—চিড়া—ঠাকুরের ভোগ। বাপের বাড়ীতে নারায়ণ ঠাকুরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি প্রতিদিন নারায়ণের ভোগ রান্না করে দিতেন। সেই ভোগের প্রসাদ ছাত্রীদের খেতে দিতেন।

শ্যামমোহিনীর প্রশংসা

১৯০৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে পৈত্রিক গ্রামকে কেন্দ্র করে যে অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন শ্যামমোহিনী, দেখতে দেখতে তার খ্যাতি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচার হতে থাকল। শ্যাম-মোহিনীর সাধু প্রচেষ্টার ফল দেখেশুনে, এতদিন যাঁরা শ্যামমোহিনীর নিন্দায় মুখর ছিলেন তাঁরাই এখন প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। তাঁদের নিন্দার মূল কারণ ছিল জমিদার ঘরের লেখাপড়া-জানা মেয়ে শ্যামমোহিনী, অকাল-বৈধব্যে অতৃপ্ত কামনা-বাসনা পূরণ করতে না

জানি কি রকম সাজপোষাক পরবে—কত না আচার ভাঙবে, কিন্তু যখন তারা দেখল বৈধব্যের প্রতীক সাদামাঠা ধুতি ও সেমিজ ছাড়া গহনাগাটি কিছু পরে না উপরন্তু নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে নানা ব্রত পালন করে, সংসারের কাজকর্ম নিজের হাতে করে, একবেলা রান্না করে খায়, মায়ের সঙ্গে একাদশী করে, হিন্দুঘরের বিধবার কঠিন নিয়মনিষ্ঠার কোনোটা বাদ দেয় না বরং অচল নিষ্ঠা নিয়ে সেগুলিও পালন করে শ্যামমোহিনী, তখন তাদের সে সংশয় ধীরে ধীরে কমতে থাকে। শিক্ষাপ্রসারে শ্যামমোহিনীর অসাধারণ সংগঠনশক্তি, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা দেখে তারা শ্যামমোহিনীর উৎসর্গীকৃত জীবনের অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। মেয়েদের স্কুলে পাঠাতেও তাঁদের আপত্তি বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে আসে।

জাতিবর্ণনির্বিশেষে ছাত্রী ভর্তি

শ্যামমোহিনী তাঁর বিদ্যালয়ে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলকে পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন। করঞ্জা গ্রামের পাশের একটি গ্রামের নাম ছিল বনগ্রাম। সেখানে তাঁর এক মুসলমান ছাত্রী ছিল। নাম ছিল নুরুন্নিসা। কিছুদিন এই স্কুলে পড়ার পর নুরুন্নিসার বিবাহ হয়। বিবাহের পর সে শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের মেয়েদের আনন্দ করে পড়াতে থাকে। এজন্যে শ্বশুরবাড়ীতে নুরুন্নিসা খুব সুখ্যাতি অর্জন করে। এভাবে শ্যামমোহিনী তাঁর বিশেষতঃ তাঁর স্বামীর আদর্শ শিক্ষাবিস্তার ব্যাপকভাবে রূপায়িত হচ্ছে শুনে বিশেষ উল্লসিত হন।

শ্যামমোহিনী তাঁর নিজের স্কুলে জাতিবর্ণনির্বিশেষে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করায় একপ্রকার বিনা চেষ্টায়ই অস্পৃশ্যতা নিবারণের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছিল।

শিক্ষাপদ্ধতি

শ্যামমোহিনী তাঁর ছাত্রীদের জন্য প্রকাণ্ড মাদুর পেতে দিতেন অন্দরমহলের স্কুলঘরে। পুরুষদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। ছাত্রীরা

পড়াশুনা করত। সংসারের নানা কাজের মধ্যে তিনি একাই পড়াতেন। যে মেয়েরা কিছুটা শিখেছে তাদিগকে নিচু ক্লাশের মেয়েদের পড়াতে দিতেন। হাতেকলমে শিক্ষার ফল দেখতে চাইতেন। এমনি ছিল তার শিক্ষার পদ্ধতি। কোন মেয়ে হয়ত বলল, কাল স্কুলে আসতে পারব না—মা আসতে দেবে না—মুড়ি ভাজবে, সাহায্য করতে হবে। শ্যামমোহিনী সেই মেয়েকে বললেন, তুমি বেলা করে এসো, মুড়ি ভাজা শেষ করেই এসো—তবু স্কুল কামাই করবে না। মেয়েরা তাই করত। কাপড় কাচা, ধান ভানা প্রভৃতি গৃহের সমস্ত কাজ সেরে ছোট ভাইবোন কোলে করেই তারা পড়তে আসত।

বাণীপীঠ স্কুলের ভিত্তি

শুধু অন্দরমহলের ছোট স্কুল নিয়ে শ্যামমোহিনীর মন ভরে না। কি করে বড় প্রতিষ্ঠান করা যায়, বিশেষতঃ বিধবা মেয়েদের ও কুমারী মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা যায় সেজন্যে তিনি মনে মনে বিশেষ চিন্তা করতেন। তাঁর এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য চেষ্টাও চলত। ক্রমে এ ব্যাপারে তাঁর কাজ করবার সুযোগ জুটে গেল। দুঃস্থ মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন, সেই প্রত্যক্ষ জানার করুণ স্মৃতিগুলি তাঁকে অতিমাত্রায় পীড়া দিতে থাকে এবং এই পীড়া-ভোগই পরবর্তীকালে তাঁর বাণীপীঠ স্কুল স্থাপনের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে শ্যামমোহিনীর জীবনের দু' একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করছি।

"করঞ্জা গ্রামেরই প্রথম বি. এ. পাশ এক ভদ্রলোক। বেরা স্কুলের হেডমাষ্টার তিনি। তাঁর মেয়ে নলিনী দেবী অল্প বয়সে বিধবা হয়ে একমাত্র নাবালক ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু বাপের বাড়ীতে তাকে অতিশয় অমানুষিক নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করতে হয়। নির্জলা একাদশী। সেই একাদশী পালনের পরদিন সকালে মা পর্যন্ত মেয়েকে জলখাবার দিত না। রান্নাবান্না সবই তাকে

করতে হত। বাবা, মা, ভাইবোনদের খাইয়ে স্নানাদি সেরে জলখাবার খেতে পেত। তারপর পুনরায় রান্নাঘর লেপে-পুছে আমিষের সব ছোঁয়া বাঁচিয়ে আলাদা রান্না করে খেত। মেয়ের প্রতি মায়েরও দরদ ছিল না। সামাজিক কুসংস্কারগুলিই প্রাধান্য পেত তখন। সে যে কী অকথ্য অত্যাচার!

"আর একটি মেয়ে। ছয় বৎসর বয়সে বিবাহ হয়েছিল। আট বৎসর বয়সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ীতে ফিরে আসে। ঐ আট বৎসরের মেয়েকেও নির্জলা একাদশী পালন করতে হত কিন্তু ঐ কচি মেয়েটিকেও মা পর্যন্ত পরদিন জলখাবার দিত না। নিজ হাতে নিরামিষ রান্না করে সেই দুপুরে খাওয়া। আর ছোট্ট মেয়ে—একবেলা খেয়ে থাকতে পারে না—তাই একবার খেয়ে সেই এঁটো পাতে ভাতের উপর হাত রেখে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ত। পরে ঘুম থেকে উঠে পুনরায় সেই পাতের ভাত খেত। কিন্তু একটু বড় হলে যেই —আর সে নিয়ম চলল না। সেই একবেলা খাওয়া। সে কি যে অবজ্ঞা-অবহেলায়-কষ্টে দিন যাপন করা—খেতে দেয় না—তা কেবল খাটায়। তাদের কেউ মানুষ বলেই জ্ঞান করে না।

"স্বামীপরিত্যক্তা মেয়েদের কি নিদারুণ দুঃখময় জীবন। বাপ পর্যন্ত কত অপমান করেছেন। বাবা বিধবা মেয়েদের দিয়ে শ্বশুরবাড়ীর সম্পত্তি বিক্রি করিয়ে আনলেন, কিন্তু সেই টাকা নিজে আত্মসাৎ করে মেয়েকে তাড়িয়ে দিলেন। এই সব দেখে শুনে কেবলই আমার মনে হত মেয়েদের লেখাপড়া না শিখলে উপায় নেই। এক কথায় এদের শিক্ষিত করে স্বাবলম্বী করতে না পারলে সমাজ থেকে এ কলঙ্ক, এ অমানবিক হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুর প্রথা দূর করা যাবে না।

"মেয়েদের প্রতি এ অত্যাচারের মূল কারণ ছিল শিক্ষার অভাব। কিন্তু তখন সমগ্র ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র ৩:৪ জন শিক্ষিত ছিল, এর মধ্যে মেয়েদের অংশ ছিল না বললেই চলে। আর এই

শিক্ষার অভাবেই চিরকাল বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী সর্বত্রই এভাবে মেয়েরা মুখ বুজে নির্যাতন ভোগ করেছে। এদের দুঃখই আমাকে শিক্ষাবিস্তারে জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণা জোগায়। গোটা জীবন এদের সেবায় কেটে গেল। সাফল্যের দায়িত্ব আমার নেই। আমি সারা জীবন যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি, যতদিন জীবিত থাকব ততদিন তাই চালাব।"

এই প্রসঙ্গে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ছোট গল্প 'অভাগীর স্বর্গে' লেখনী ধারণের মূলে তাঁর যে জীবনদর্শন কাজ করেছে মানবদরদী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বীয় মুখনিঃসৃত সে উক্তির সঙ্গে শ্যামমোহিনীর জীবনদর্শনের সাদৃশ্য আছে বলেই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সে উক্তিটি এখানে তুলে ধরার লোভ ত্যাগ করতে পারলাম না :

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কোন হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন ওদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।"

অস্পৃশ্য দুলে ঘরের দীন-দরিদ্র অভাগীর করুণ জীবনের অধ্যায়গুলির পটভূমিকায় শরৎচন্দ্র গ্রামবাংলার হৃদয়হীন নিষ্ঠুর জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে লিখেছেন তাঁর অমর ছোট গল্প 'অভাগীর স্বর্গ', 'মহেশ', 'পল্লীসমাজ' প্রভৃতি।

জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদের মূলে মানবদরদী শরৎচন্দ্রের এই রচনাগুলি যে যুগান্তরকারী প্রভাব ফেলে তার আর তুলনা হয় না। অতুলনীয় অনবদ্য তাঁর সে অবদান জাতিকে উন্নত করেছে।

শরৎচন্দ্রের উক্তির সঙ্গে শ্যামমোহিনীর উক্তির মিল রয়েছে বলেই আমরা মনে করি। এই দুই মানবহিতৈষী নিপীড়িত আত্মার মূর্ত

প্রতীক। তৎকালীন সমাজে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, দুর্বল-বঞ্চিতদের দুঃখে একাত্ম হয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন সমাজ থেকে এই দুষ্ট ক্ষত দূর করে নারীপুরুষনির্বিশেষে মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে। একজন লেখনীর মাধ্যমে আর একজন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে। এঁদের এই মহান প্রচেষ্টা জাতিকে ঐসব দূরপনেয় কলঙ্করাজি থেকে মুক্ত করে মর্যাদা দান করেছে। এইখানেই শ্যামমোহিনীর জীবনের সার্থকতা, এইখানেই শ্যামমোহিনী অসামান্যা গরীয়সী।

ভাই বীরেনের মৃত্যু

দেখতে দেখতে স্কুলটির এক বৎসর অতিক্রান্ত হল। এরই মধ্যে আর একটি শোক নেমে এল শ্যামমোহিনীর জীবনে।

১৯০৬ সাল। ডিসেম্বর মাস। আদুরে ছোট্ট ভাই বীরেন অকস্মাৎ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। মা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। জমিদারী ও ঘরসংসার কিছুই আর তাঁর পক্ষে দেখাশুনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি পর পর কয়েকটি বিয়োগে শোকাভিভূতা হয়ে পড়ে রইলেন।

ভাই রাজেনের বিবাহ

এ অবস্থায় শ্যামমোহিনীর মা গোবিন্দময়ীকে অনেকে ছেলে রাজেনের বিবাহ দিতে পরামর্শ দিলেন। জমিদারীতে অনবরত মামলা-মোকদ্দমা, নানারকম ঝক্কি-ঝামেলা রয়েছে—এসব দেখে শুনে হিতাকাঙ্ক্ষীরা বললেন, তুমি বরং ছেলের বিয়ে দাও, তাহলে এক ঘর অছি হবে। এসব ব্যাপারে সাহায্যও পাবে।

১৯০৭ সাল। এদের পরামর্শমত মা ছেলে রাজেনের বিবাহ দিলেন পাবনা জেলার হাটুরিয়া-জগন্নাথপুরের জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ বাক্‌চির পঞ্চমা কন্যা শরৎবাসিনীর সঙ্গে। বাল্যবিবাহের যুগ তখন। রাজেনের বয়স কেবল চোদ্দ আর কনের এগার। হাটুরিয়া-জগন্নাথপুর

প্রবীণা প্রখ্যাতা লেখিকা গিরিবালা দেবী সরস্বতীর শ্বশুরালয় ও তদীয়া কন্যা কবি-সাহিত্যিক বাণী রায়ের পিতৃভূমি। এটি একটি বর্ধিষ্ণু ও শিক্ষালোকপ্রাপ্ত গ্রাম। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত।]

মাতার মৃত্যু

পুত্র রাজেনের বিবাহের কয়েক মাস পরেই ১৯০৮ সালে মা গোবিন্দময়ী শ্যামমোহিনীর উপর সব দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেন। সংসারের শেষ বন্ধনটুকুও ছিন্ন হল শ্যামমোহিনীর। এখন ছোট ভাই দুটির লেখাপড়া থেকে যাবতীয় তত্ত্বাবধান, জমিদারীর মামলা-মোকদ্দমা চালান, খাজনা আদায়, লগ্নির কারবার দেখাশুনা, রান্নাবান্না করা, নিয়ম-ব্রত পালন তদুপরি প্রাণাধিক মেয়েদের স্কুল পরিচালনা—সব মিলে বিরাট কর্মযজ্ঞের হোতা হলেন তিনি। সে সময় শ্যামমোহিনীর কঠোর শ্রম, সহিষ্ণুতা, কর্মনিষ্ঠা, ত্যাগ যাঁরাই দেখেছেন তাঁরাই বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়েছেন। তাঁর সেই অদ্ভুত পরিচালনাশক্তি ও সাহসিকতার কাহিনী তৎকালে সমগ্র পাবনা জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল, সমগ্র পাবনা জেলায় একটা প্রাণসঞ্চার করে তুলেছিল এবং গোঁড়া-পন্থীরা তাঁর শক্তির পরিচয় পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছিলেন। কন্যাসম একটি মেয়ের কাছে বারংবার তাঁরা পরাভব স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এ পরাভবে কোন মর্মপীড়া ছিল না তাঁদের তখন।

প্রকাশ্য স্থানে স্কুল স্থানান্তরিত

শ্যামমোহিনীর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের এই প্রচেষ্টা মেয়েদের প্রাণে বিশেষভাবে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। দলে দলে মেয়েরা লেখাপড়া শিক্ষার জন্যে তাঁর স্কুলে ভর্তি হতে থাকল। ফলে শ্যাম-মোহিনীর বাড়ীর অন্দরমহলের স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ক্রমান্বয়ে দ্রুত এমন বৃদ্ধি পেতে থাকল যে, সেখানে আর স্থানসংকুলান হয় না।

একে সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে টেনে বের করে কিভাবে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায়—অহরাত্র এই চিন্তাই শ্যামমোহিনীর। মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন—যেমন করেই হোক তিনি বৃহত্তম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেনই এবং যতদিন না তিনি তা করতে পাচ্ছেন ততদিন তিনি সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেনই।

এই দুর্বার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি স্কুলটি বাড়ী থেকে প্রকাশ্য স্থানে স্থানান্তরিত করার মনস্থ করলেন। এজন্যে তিনি এক বিঘা জমিও সঙ্গে সঙ্গে কিনে ফেললেন। এই জমিতে প্রকাণ্ড একখানা টিনের আটচালা ঘরও তুললেন কারো সাহায্য না নিয়ে। তিনি নিজে সমুদয় ব্যয়ভার বহন করলেন।

মাতার নামে স্কুল

শ্যামমোহিনী তাঁর মাতার নামানুসারে স্কুলটির নাম দিলেন করঞ্জা গোবিন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয় এবং বাড়ীর অন্দরমহলের সঙ্কীর্ণ স্থান থেকে প্রকাশ্যস্থানে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করলেন। প্রথমে শ্যামমোহিনী একাই শিক্ষকতা আরম্ভ করলেন। ছাত্রীদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যতে শিক্ষয়িত্রী নেবেন, সেভাবে তাদের তৈরী করতে থাকলেন।

ভবিষ্যতের সংস্থান

কিন্তু শ্যামমোহিনী ভবিষ্যতে টাকাপয়সার অভাবে বা তাঁর অনুপস্থিতিতে ঐ বালিকা বিদ্যালয়টি যাতে কোন প্রকারে বন্ধ হয়ে না যায় সেজন্য চারিদিকে আটঘাট বেঁধেই এ-কাজে নামলেন।

"আমি ভাবতাম, আমি কারো গলগ্রহ হব না। তখনও আমার শাশুড়ী বেঁচে আছেন। শ্বশুরবাড়ীর আমার ভাগের প্রাপ্য সম্পত্তি বিক্রি করে আনা সমীচীন মনে করলাম না। কিন্তু আমাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। অগত্যা গহনা বিক্রির লগ্নীকৃত টাকার সুদে ঐ

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন আরো দুবিঘা জমি কিনলাম। আমি নিজেই শিক্ষকতা করি। কিন্তু আমার অবর্তমানে যাঁরা পড়াবেন অর্থাৎ অন্তত একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষয়িত্রী—তাঁরা এই জমির আয় থেকে তাঁদের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করতে পারবেন। এ হলে বিদ্যালয়টি আর অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে না।

"দেখতে দেখতে ছাত্রীসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকল। আর তাদের দেখে আমারও মনে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিল। দুইজন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে নিযুক্ত করলাম। এদের মধ্যে একজনের নাম মাখন লাল দাস—ইনি তৎকালীন জুনিয়র ট্রেনিং পাশ। অপর-জন বেরা স্কুলের হেডমাষ্টার সতীশ চন্দ্র সান্ন্যালের বিধবা কন্যা নলিনী দেবী। আমারই ছাত্রী। মাখনলাল দাস ও নলিনী দেবীকে প্রথমে পাঁচ টাকা করে মাইনে দিতাম। নিজে বিনা মাহিনায় পড়াতাম। মেয়েদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ দিতাম। উপরন্তু বইপত্তরও কিনে দিতাম।

বিদ্যালয় পরিদর্শন

প্রকাশ্য স্থানে বালিকা বিদ্যালয় চলতে লাগল। শ্যামমোহিনী দেবী জাতির মুক্তির হাতিয়ার শিক্ষাবিস্তারে তৎকালে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা ধীরে ধীরে সমগ্র পাবনা জেলার গৌরব বৃদ্ধি করতে থাকল। তখন করঞ্জা গ্রামের অদূরে মুসলমানদের একটি মাদ্রাসা ছিল। সেখানে বাংলা ও উর্দু পড়ান হত।

"১৯০৮ সালে ঐ মাদ্রাসা পরিদর্শন করতে এলেন পাবনার স্কুল-বোর্ডের সদাশয় পরিদর্শক। তিনি মাদ্রাসার মৌলভীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কি আর কোন পাঠশালা নেই?'

মৌলভী জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আছে আর একটি বালিকা বিদ্যালয়। সেখানে একজন মহিলা পড়ান। তিনি তাঁর মায়ের নামে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পরিদর্শক বললেন, আমাকে ঐ স্কুলটি দেখাতে পারেন ?

হ্যাঁ পারি।

আচ্ছা, চলুন, গিয়ে দেখি।

মৌলভীসহ তিনি আমার স্কুল পরিদর্শন করতে এলেন। এসে আমাকে সস্নেহে বললেন, মা আমি আপনার বালিকা বিদ্যালয় দেখতে এলাম।

তিনি আমার বিদ্যালয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করলেন। পরিদর্শনান্তে তিনি লিখিত এই অভিমত দিলেন ঃ

পাবনা জেলায় খুব কমই পাঠশালা আছে। যে কটি আছে তার মধ্যে শ্যামমোহিনীপ্রতিষ্ঠিত এই গোবিন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয়টি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি খুসী হয়ে মাসিক তিন টাকা সাহায্যও মঞ্জুর করলেন। এভাবে আমার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার পরিকল্পনার প্রসারের সূত্রপাত হয়। এই বিদ্যালয় ছাড়াও আমি পাবনার বিভিন্ন স্থানে আরও সাতটি বালিকা বিদ্যালয় গঠনে সক্রিয় সাহায্য করি।"

অনেকের প্রেরণাদাত্রী শ্যামমোহিনী

শ্যামমোহিনীর বিচিত্র কর্মশক্তি পাবনার ঘরে ঘরে সুখ্যাতি ও মেয়েদের প্রাণে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। আর শ্যামমোহিনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে লেখাপড়া শিখে স্কুলে শিক্ষকতা করবে মনস্থ করে কোন কোন মেয়ে সেইমত শিক্ষা আরম্ভ করল। ১৯০৮ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত শ্যামমোহিনী করঞ্জা গ্রামে থেকে এই বিদ্যালয়ের সর্ববিধ উন্নতি সাধন করেন। তিনি একাধারে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী, সম্পাদিকা, শিক্ষিকা, পরিচালিকা—এককথায় বিদ্যালয়টির প্রাণ-স্বরূপা।

১৯০৮ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ তেতাল্লিশ বৎসর এই বিদ্যালয়টি করঞ্জা গ্রামে অবস্থিত ছিল। এর ফলে গ্রামের বহু নিরক্ষরা সাক্ষরা হবার সুযোগ লাভ করে ধন্য হয়েছেন। করঞ্জায়

অবস্থানকালে বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাবৃত্তি, বাপের বাড়ীর জমিদারী দেখাশুনা, রান্নাবান্না, ঠাকুর সেবা, নিয়মব্রত পালন, ভাইদের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কাজ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন শ্যামমোহনী। এককথায় তিনি যে কঠিন দায়িত্ব আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন—প্রাণশক্তির যে পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে ভবিষ্যতে তিনি যে নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের মত বহুমুখী একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সেই প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন এ যেন তার পূর্বাভাস। নারী যে শক্তিময়ী তাঁর তখনকার ক্রিয়াকাণ্ড দেখে স্বতঃই মনে পড়ে। তিলে তিলে দহনকর নিষ্ঠা নিয়ে কর্ম করলে কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায় একথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ শ্যামমোহিনী। আজও তাঁর কর্মবহুল জীবন আমাদের সকলেরই অনুকরণীয়।

তপস্বিনী শ্যামমোহিনী

শ্যামমোহিনী শুধু শিক্ষকতা করেই কাটালেন না। নিজেও এই সঙ্গে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি তাঁর ভাই রাজেনের উচু ক্লাশের সমুদয় পাঠ্য পুস্তক পড়ে শেষ করলেন। বিধবা হয়ে এলে মা তাঁকে পাড়ওয়ালা শাড়ী ও গহনা পরতে বারংবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, "না, যা গেছে, তা গেছে। আমি জানতাম গ্রামের লোক কেমন নিন্দাপ্রবণ। পাড়ওয়ালা শাড়ী বা গহনা সবই পরিত্যাগ করলাম। মোটা সাধারণ থান ধুতি ও সেমিজ পরতে আরম্ভ করলাম। গীতা পাঠ, পূজা-পার্বণ, রান্নাবান্না, একবেলা স্বপাকে নিরামিষ আহার করেছি। এমন কি চুলও কেটে ফেললাম ছেলেদের মত করে পাছে আঁচড়াতে হয়, লোক যাতে না বলে, দেখ বিধবা মেয়ের সখ এবং এইসবের জন্যে যাতে আমার শিক্ষাবিস্তারে বাধা সৃষ্টি না হয়।"

নবম অধ্যায়

পাবনা গমন ও স্কুলমাষ্টারী গ্রহণ

১৯১৮ সাল। শ্যামমোহিনীর ভাই রাজেন্দ্র চৌধুরী ওকালতি পাশ করে স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ পাবনা জেলার সদরে গিয়ে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি সপরিবারে সেখানে চলে যাওয়ায় শ্যামমোহিনীকেও ভাইয়ের সঙ্গে যেতে হল। পাবনা যাওয়ার পূর্বে শ্যামমোহিনী করঞ্জার বালিকা বিদ্যালয়ের সব ভার মাখন দাস ও নলিনী দেবীর উপর দিয়ে দিলেন।

পাবনায় গিয়ে এখন ভায়ের গলগ্রহ হয়ে বসে থাকা শ্যামমোহিনীর অত্যন্ত কষ্টদায়ক হল। তাঁর মনের ঐকান্তিক কামনা 'আমি কারো গলগ্রহ হব না'। যখন তিনি বিধবা হলেন, তখন তাঁর শাশুড়ীর সেই করুণ বিলাপ আজও তাঁর কানে বাজে—"হা ভগবান! এ কি করলে, এই চারটি বিধবার মুখের অন্ন আমি কিভাবে জোগাব!"

এ ছাড়া শিক্ষাবিস্তার যাঁর ঐকান্তিক কামনা তিনি এভাবে বসে থেকে সময় নষ্ট করতে পারেন না। তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তির কাছে এ বাধা তুচ্ছ হল। তিনি পাবনার উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। যত আলাপ করেন তত তাঁরা মুগ্ধ হন শ্যামমোহিনীর অগাধ জ্ঞানের পরিধি দেখে। তাঁরা বলেন, আপনার তো অগাধ জ্ঞান—আপনি মাষ্টারী করুন না।

হাতে স্বর্গ পেলেন শ্যামমোহিনী। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। ঐ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী নিলেন। মাইনে পঁচিশ টাকা। তৎকালে পাবনা জেলার মধ্যে এই বিদ্যালয়টি ছিল সব চাইতে বড়। দ্বিতীয় স্কুল ছিল মহাকালী পাঠশালা। সেখানে ছেলেমেয়ে উভয়েই পড়াশুনা করত।

ট্রেনিং শিক্ষার প্রস্তুতি

"আমি যে বিদ্যালয়ে চাকুরি নিলাম সেই পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষয়িত্রীই ট্রেনিং পাশ। তখন আমি ভাবলাম আমাকেও অতি অবশ্য ট্রেনিং পরীক্ষায় বসতে হবে, ট্রেনিং পাশ করতে হবে। সেই মত আমি স্কুলে ছাত্রী পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ট্রেনিং পরীক্ষা দেবার জন্য বাড়ীতে পড়ে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

স্কুল পরিদর্শন

এর মধ্যে ঢাকা থেকে ইনস্‌পেকট্রেস মিস আয়রণ এলেন স্কুল পরিদর্শন করতে। পাবনা বালিকা বিদ্যালয়টি ছিল তখন মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়। আমি পড়াতাম প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। হেডমিসট্রেস বাংলা পড়াতেন। মিস আয়রণ তাঁর ক্লাশ পরিদর্শনে গেলেন, হেডমিসট্রেস তাঁর ক্লাশে ছাত্রীদের বাংলা ব্যাকরণ পড়াতে পড়াতে কিছু ভুল করলেন। ইনস্‌পেক্‌ট্রেস বিরক্ত হলেন।

মিস আয়রণ এলেন আমার ক্লাশ পরিদর্শনে। আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীর মেয়েদের ইতিহাস পড়াচ্ছি। বোর্ডে এশিয়ার ম্যাপ এঁকে আর্যদের ভারত আক্রমণ পড়াচ্ছিলাম। আর্যরা কিভাবে এশিয়াখণ্ড থেকে হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্য দিয়ে কারাকোরাম গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তারপর কিভাবে পাঞ্জাবের পঞ্চনদ (ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, বিপাশা ও বিতস্তা)-এর তীরে তীরে বসতি-বিস্তার ও রাজ্যবিস্তার করেছিল তাই পড়াচ্ছিলাম। ছাত্রীরা অভিনিবেশ সহকারে শুনছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পড়া তৈরী হয়ে যাচ্ছিল।

মিস আয়রণ বসে আগাগোড়া আমার পড়ানো দেখলেন। পড়ানো শেষ হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি আর কি পড়ান?

আমি বললাম, আমি চতুর্থ শ্রেণীতে বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল,

তৃতীয় শ্রেণীর অঙ্ক, দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা পড়াই আর হাতের লেখা দেখি।

ইনস্‌পেকট্রেস বললেন, আপনি কি উপরের ক্লাশের ভূগোল ও ইতিহাস পড়াতে পারবেন ?

আমি বললাম, তা, পারব। তখন স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন দুর্গাকান্ত ভট্টাচার্য। মিস আয়রণ ঐ সেক্রেটারীকে ডেকে বললেন, আপনি শ্যামমোহিনী দেবীকে পঞ্চম ও ষষ্ঠশ্রেণীর ইতিহাস ও ভূগোল পড়াতে দেবেন। ইঁনি খুবই ভাল পড়ান। ইতিহাস, ভূগোল এক-জনের কাছেই থাকা ভাল।

পর বৎসর অর্থাৎ ১৯১৯ সালে পুনরায় কলকাতা থেকে পাবনা বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে এলেন পরিদর্শিকা হৃদয়বালা বোস। পরিদর্শনে এসে যথারীতি তিনিও শিক্ষয়িত্রীদের পড়ানোর পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করলেন। এবারও হেডমিসট্রেস বাংলা সমাস পড়াতে পড়াতে কিছু ভুল করলেন। অন্যান্য ক্লাশ পরিদর্শন করে আমার ক্লাশে এলেন হৃদয়বালা বোস।

আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে মাইকেল মধুসূদনের 'সীতা ও সরমা' পড়াচ্ছিলাম। আমি পড়াচ্ছি, পরিদর্শিকা বসে আছেন। তিনি আমার পড়ানো শেষ পর্যন্ত শুনলেন।

পরিদর্শনান্তে তিনি সেক্রেটারীকে গিয়ে বললেন, হেডমিসট্রেস পড়াতে ভুল করলেন কিন্তু শ্যামমোহিনী দেবী সমাস, কারক দিয়ে কি চমৎকার পড়াচ্ছিলেন। ওকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পড়াতে দেবেন। তাতে মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে ভাল হবে।

শ্যামমোহিনী ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ঐ পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এই সময়ের মধ্যে যতগুলি ইনসপেকট্রেস এসেছেন বিদ্যালয় পরিদর্শনে—তাঁরা সকলেই শ্যামমোহিনীর পড়ানোর পদ্ধতি দেখে একবাক্যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

পাবনায় মহিলা সমিতি গঠন

১৯১৮ সাল থেকে শ্যামমোহিনী পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তিনি কেবল নিজেকে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি ওখানকার মেয়েদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রয়াসও চালান। এই সময়ে তিনি সমগ্র পাবনা জেলার প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় পাবনা জেলায় একটি মহিলা সমিতি গঠিত হয়। এর পূর্বে মেয়েরা সমিতি গঠন দূরের কথা, একত্রে মেলামেশা এমন কি স্কুলে এসে আপন আপন মেয়েদের ভর্তি করার কথাও ভাবতে পারতেন না। শ্যামমোহিনীর আগমনে পাবনার মহিলারা যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা অনুভব করেন। তাঁর সান্নিধ্যে তাঁরা অনুপ্রাণিত হন। এর পূর্বে মহিলারা কেবল গণ্ডীবদ্ধ জীবনের সংস্কারগুলি আঁকড়ে ধরে পড়েছিলেন। তিনি তাদের সে গহ্বর থেকে টেনে বের করে তাদের প্রাণে চেতনার বহ্নি জ্বালিয়ে দেন। সে চেতনার বহ্নির পরশে মেয়েরা উদ্বুদ্ধ হতে থাকল এবং সৃষ্টি হল পাবনা মহিলা সমিতি। কি করে এই মহিলা সমিতি গঠিত হল এখানে সে সব কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না।

প্রেরণার আধার শ্যামমোহিনীকে বুঝতে হলে এ ঘটনার উল্লেখ অনিবার্য মনে করি। এবং আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা মহীয়সী শ্যামমোহিনীর মুখেই সে যুগের তাঁর কীর্তির কথা শুনতে পাচ্ছি :

"আমি পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার ঠিক পূর্বে হিন্দুছাত্রীদের বাড়ীর মহিলারা ঐ বিদ্যালয়ে যেতেন না। কিন্তু আমি যাওয়ার পর পাবনার মহিলারা ঐ স্কুলে বেড়াতে আসতে থাকেন। এর আগে পুরুষ অভিভাবকেরা গিয়ে যে যার মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দিতেন। এখন থেকে তাদিগকে ভর্তি করার জন্যে বাড়ীর মহিলারাই তাদের সঙ্গে স্কুলে আসতে আরম্ভ করলেন।

এঁদের মধ্যে শীতলাই-এর জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রের স্ত্রী সরলা দেবী অন্যতমা। সরলা দেবীর কন্যাকে পাবনা স্কুলের একজন

খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী তাঁর বাড়ীতে গিয়ে লেখাপড়া ও তৎসহ সঙ্গীত শেখাতেন। তাঁর নিকট আমার কথা শুনে সরলা দেবী স্কুলে আসতে থাকেন। এই ভাবে প্রথমে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আলাপের পর আমাদের উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা জন্মে।

সরলা দেবী বিদুষী ও শিক্ষানুরাগিনী মহিলা ছিলেন। তাঁর অনেক কাজ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর মনের কথা কারো নিকট এ পর্যন্ত ব্যক্ত করতে পারেননি। এ ছাড়া তাঁর বাসাটিও ছিল সহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে। এজন্যে তিনি ইচ্ছা থাকলেও তেমন কারো সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাননি। উৎসাহী মেয়েদেরও একান্ত অভাব অনুভব করতেন তিনি।

এখন আমাকে স্কুলে পেয়ে তিনি তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করলেন —মেয়েরা আমরা সম্মিলিতভাবে কিছু একটা করতে পারি কিনা সে-বিষয়ে আমার অভিমত জানতে চাইলেন।

আমি তখন সরলা দেবীকে বললাম, আসুন, আমরা মেয়েদের নিয়ে একটা মহিলা সমিতি গঠন করি। মেয়েদের সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করি।

১৯১৮ সাল। যে কথা সেই কাজ। পরদিন রবিবার ছিল। আমরা নিম্নলিখিত মহিলাদের নিয়ে পাবনায় একটি মহিলা সমিতি গঠন করলাম।

সভানেত্রী—নিরুপমা দেবী। ইনি ছিলেন পাবনার তৎকালীন উকিল মোহিনী মোহন লাহিড়ীর স্ত্রী।

যুগ্ম সম্পাদিকা—সরলা দেবী ও আমি। এই সরলা দেবী ছিলেন হুগলী-শ্রীরামপুরের বিখ্যাত কিশোরী মোহন গোস্বামীর কন্যা। দুই তিন জন সদস্যাও নিযুক্ত করা হল।

এই সমিতির কাজ ছিল ঃ

১। মহিলাদের এক জায়গায় সমবেত ক'রে নিজেদের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-অলোচনা করা ও ঘরের বৌদের লেখাপড়া শেখান।

২। মেয়েদিগকে সেলাই শিক্ষা দেওয়া।

৩। মেয়েদের মধ্যে ভাবী শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করা।

৪। তখন স্বদেশী যুগ। কিন্তু তখনও মেয়েদের মধ্যে তেমন সাড়া জাগেনি। মেয়েদের মধ্যে স্বাদেশিকতার বীজ উপ্ত করাও মহিলা সমিতির অন্যতম কাজ ছিল। সে যুগে শ্যামমোহিনী মহিলাদের মধ্যে যে দেশপ্রেমের বীজ বপন করেন, তা ভবিষ্যতে পাবনার মহিলাদের মধ্যে সুদূরপ্রসারী ফল প্রদান করে। দেশের মুক্তি-আন্দোলনে এই মহিলা সমিতির অসামান্য দান কোন অংশে ন্যূন নহে। পরে তার বিশদ বিবরণ আমরা জানতে পারব।

ট্রেনিং-এ ভাশুয়ের আপত্তি

শ্যামমোহিনী একদিকে পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে এবং অন্যদিকে মহিলা সমিতি ও একটার পর একটা অপরাপর বিবিধ কাজের দায়িত্ব নেবার দুর্জয় সাহস নিয়ে অসাধারণ সংগঠনশক্তির পরিচয় দিতে থাকেন। স্বীয় শিক্ষকতাবৃত্তিতে অর্জিত অর্থ দিয়ে তিনি মহিলা সমিতিকে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে উন্নত করতে সক্ষম হলেন। একাজে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তৎকালে শ্যামমোহিনীর অগাধ প্রাণ-প্রাচুর্য, অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও ত্যাগের পরিচয় পেয়ে নারীপুরুষনির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রাণে বিপুল সাড়া জেগে উঠেছিল।

কথায় বলে, শুভ কাজে যত বাধা। হলও তাই। ট্রেনিং পড়তে যেতে প্রথমেই শ্যামমোহিনী বাধা পেলেন। শিক্ষকতায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলেও শ্যামমোহিনী ট্রেনিংপ্রাপ্তা নন। পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষয়িত্রীই ট্রেনিংপ্রাপ্তা। তাঁকে অবশ্য ট্রেনিং নিতে হবে।

স্কুল পরিদর্শনে এসে ঢাকার ইনসপেকট্রেস মিস আয়রণ বলে গেছেন, আপনি এত জানেন অথচ ট্রেনিং নিচ্ছেন না কেন? এখনই

ঢাকায় যান। ঢাকায় গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে আসুন। আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব।

১৯২২ সাল। ইনসপেকট্রেস মিস আয়রণের পরামর্শ মত ঢাকায় ট্রেনিং পড়তে যাবেন শ্যামমোহিনী। সব ঠিকঠাক। তিনি যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, দিনতারিখ ঠিক হয়ে গেছে। এমন সময় জ্যাঠতুতো ভাশুর যাদবচন্দ্র মৈত্র, ইনি তখন টাঙ্গাইলে ওকালতি ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন, কথাটা তাঁর কানে উঠে। তিনি শ্যামমোহিনীর ভাই রাজেন্দ্রকে চিঠি লিখলেন, ভাই রাজেন, বৌমা আপনার বাসায় থেকে পড়াচ্ছেন, তা কি-ই বা করবে, পড়াক, সে আমরা সইছি, কিন্তু এখন বৌমা ঢাকায় গিয়ে পড়বে এ আমরা সহ্য করব না।

ঐ চিঠি পাওয়ার পর আর শ্যামমোহিনীর পক্ষে ঢাকায় গিয়ে ট্রেনিং পড়া সম্ভব হল না। এক বৎসর নষ্ট হল তাঁর।

অবশেষে টেনিং-এ গেলেন

অতঃপর শ্যামমোহিনী ১৯২৩ সালে কলকাতায় এলেন ট্রেনিং পড়তে। কারণ শিক্ষিকাবৃত্তিতে ট্রেনিং অপরিহার্য। ট্রেনিং তাঁকে নিতেই হবে।

সমস্ত শিক্ষয়িত্রীর চাইতে তাঁর শিক্ষাপ্রণালী উৎকৃষ্ট, অথচ তাঁর ট্রেনিং নেই। তিনি ট্রেনিং নিতে যাবেন কিন্তু সময়কালে তাঁর ভাশুর বাধা দিলেন। ঢাকায় গিয়ে সে বৎসর তাঁর আর ট্রেনিং পড়া সম্ভব হল না। এক বৎসর নষ্ট হল। কিন্তু অদম্য জ্ঞানপিপাসু শ্যামমোহিনীর দৃঢ়চিত্তের কাছে এ বাধা, এ প্রতিবন্ধকতা কোথায় ভেসে গেল। পর বৎসর তিনি কলকাতায় ট্রেনিং পড়তে গেলেন। কিন্তু সেকথা গোপন রাখলেন। ব্যবস্থাদি যা কিছু পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী-গণই করে দিলেন। যাবার পূর্বে তিনি তাঁর ভাশুরকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন, আমার ভাই রাজেনের দুটি মেয়ে কলকাতায় এনট্রান্স পড়তে যাচ্ছে, আমিও ওদের সঙ্গে যাচ্ছি, বাসা ভাড়া করে ওদেরই

সঙ্গে সেখানে থাকবো। এতে তাঁর ভাশুর যাদবচন্দ্র ও শ্বশুরবাড়ীর লোকের আর তেমন আপত্তি থাকল না। কলকাতায় গিয়ে শ্যামমোহিনীর ট্রেনিং পড়তে বাধা রইল না।

কিন্তু শ্যামমোহিনী বাধার সম্মুখীন হয়ে সে বাধা জয় করলেন—এই জয় করার কৌশল প্রয়োগের সাহসিকতা শ্যামমোহিনীর জীবনকে একটার পর একটা সাফল্যে ভরে দিয়েছে। ইতিমধ্যে তার অনেক প্রমাণও আমরা পেয়েছি।

আপত্তির কারণ

শ্যামমোহিনীর ঢাকায় গিয়ে ট্রেনিং পড়তে তাঁর ভাশুরের আপত্তির কারণ ওখানকার ট্রেনিং স্কুল ছিল খৃষ্টানদের পরিচালিত। ওটাতেই যত আপত্তি কলকাতায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীদের সঙ্গে যাচ্ছে এটা ততটা নয়।

দশম অধ্যায়

কলকাতা আগমন

১৯২৩ সাল। জানুয়ারী মাস। শ্যামমোহিনী তাঁর ভ্রাতা রাজেনের দুই কন্যা সুষমা ও সুরমাকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। তিনি এসে প্রথমে উঠলেন তাঁর বৈমাত্রেয়ী বড়দি সুরসুন্দরীর বাসায়। বাসাটি ছিল ধর্মতলার সন্নিকটে হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ারে। শ্বশুর-বাড়ী জানল, বউ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীদের সঙ্গে কলকাতায় গেছেন। এ নিয়ে আর তাঁরা কোনোরূপ বিরূপ সমালোচনা করেন নি। ঐ মাসে দিদির বাসায় থাকা কালে ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হলেন শ্যামমেহিনী। ভ্রাতুষ্পুত্রী দুটিকেও তিনি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যেই তখন ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুল ছিল।

শ্যামমোহিনীর ভ্রাতা রাজেন্দ্রকুমারও অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। শ্যামমোহিনী কলকাতায় ট্রেনিং নিতে আসার পর তিনি পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। তাঁর সেক্রেটারী থাকাকালে ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তৎকালে স্বীয় কন্যাদের কলকাতার হোস্টেলে রেখে পড়ানোর মধ্য দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ নিঃসন্দেহে প্রকাশ পায়।

বাসা ভাড়া

শ্যামমোহিনী দেখলেন যে, দিদির বাসা থেকে স্কুল বেশ কিছুটা দূর। এজন্যে ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয়ের ও তাঁর নিজেরও যাতায়াতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। এ ছাড়া তিনজন মিলে দিদির বাসায় কতদিন আর থাকা যায়—বেশীদিন থাকা ঠিক নয়। তিনি দিদিকে না জানিয়ে গোপনে বাসা খুঁজতে থাকেন। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে এ নিয়ে তিনি আলাপ-আলোচনা করলেন। তাঁরা শ্যামমোহিনীর মুখে তাঁর

অসুবিধার কথা শুনে অচিরেই তাঁকে একটি বাসার সন্ধান দিলেন। তিনি গিয়ে বাসাটি দেখেও এলেন। বাসাটি ছিল ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সন্নিকটে, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিটে। ১৯২৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকেই শ্যামমোহিনী ভ্রাতুষ্পুত্রী দুটিকে সঙ্গে নিয়ে ঐ নতুন বাসায় উঠে এলেন।

ঐ বাড়ীর মালিক ছিলেন ব্রাহ্মমতাবলম্বী। মেয়ে তিনটি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে পড়াশুনা করে কিন্তু থাকে ধর্মতলার কাছাকাছি হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ারে, এত দূর থেকে এখানে এসে পড়তে কষ্ট হয় শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বাড়ীতে শ্যামমোহিনীকে ঘর ভাড়া দিলেন এবং যাতে তাঁদের কোন কষ্ট না হয় সেদিকেও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে লাগলেন।

এখানে থাকাকালে শ্যামমোহিনী বাজারহাট থেকে রান্না-বান্না, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা পর্যন্ত গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ নিজ হাতে সমাধা করতেন। পড়াশুনায় কিন্তু তাঁর কোনপ্রকার ত্রুটি ছিল না।

ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধায়িকা

শ্যামমোহিনী যখন ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুলে ভর্ত্তি হলেন সে-সময়ে এই ট্রেনিং স্কুল হোস্টেলের সুপারিণটেণ্ডেন্ট ছিলেন একজন খৃষ্টান মহিলা। এই সুপারিণটেণ্ডেন্টের সঙ্গে হোস্টেলের মহিলাদের তেমন বনিবনা হচ্ছিল না। মনকষাকষি প্রায় লেগেই থাকত। তখন লেডী অবলা বসু—ভুবনবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিনী, বিদ্যাসাগর বাণীভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা—শ্যামমোহিনীকে অনুরোধ করলেন, 'আপনি এই হোষ্টেলের দেখা-শুনার ভার নেন যদি তবে খুব ভাল হয়, কারণ ভদ্রমহিলার সঙ্গে মেয়েদের অনবরত মনোমালিন্য লেগেই আছে।'

১৯২৩ সালে অক্টোবর মাসে লেডী বসুর অনুরোধ ক্রমে শ্যামমোহিনী ঐ হোস্টেলের সুপারিণটেণ্ডেন্টের পদে অভিষিক্তা

হলেন। পূজাবকাশের পর ঐ অক্টোবর মাসেই বাসা উঠিয়ে তিনি ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুল হোস্টেলে উঠে এলেন। হোস্টেলটি ছিল ৩৯।৩ বি, সুকিয়া ষ্ট্রীটে যার বর্তমান নাম মহেন্দ্র শ্রীমানী ষ্ট্রীট।

লেডী বসু শ্যামমোহিনীকে নীচে-উপরে দুখানা ঘর দিলেন। শ্যামমোহিনী ভ্রাতুষ্পুত্রী সুরমা ও সুষমাকে নিয়ে ঐ ঘর দুটিতে থাকলেন। লেডী বসু ছিলেন ব্রাহ্মমতাবলম্বী। কিন্তু তিনি গোঁড়া হিন্দু বিধবা শ্যামমোহিনীর আচারনিয়মনিষ্ঠা পালনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি নীচের ঘরে রান্না করে খাবেন আর উপরের ঘরে থাকবেন।'

লেডী বসু মাঝে মাঝে শ্যামমোহিনীর ঘরে এসে বসতেন। শ্যামমোহিনী তাঁকে নিজ হাতে যত্ন করে ঘরে যা খাবার থাকত তাই খেতে দিতেন। লেডি বসুও আপত্তি করতেন না, তৃপ্তির সঙ্গে সে খাবার খেতেন।

শ্যামমোহিনীর তত্ত্বাবধানে হোস্টেলের মেয়েদের অভিযোগ এখন আর থাকল না। এবং লেডী বসু তাঁর পরিচালনাদক্ষতা দেখে মুগ্ধ হলেন। লেডী বসুর মানুষ চেনার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। কাকে দিয়ে কাজ হবে তা তিনি অনায়াসেই বুঝতে পারতেন। শ্যামমোহিনীকে দেখেই তিনি চিনেছিলেন এঁকে দিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠানের যথার্থ কাজ হবে। হোস্টেলের সুপারিণটেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হয়ে শ্যামমোহিনী তাঁর সে দৃঢ় প্রত্যয় সত্যে পরিণত করলেন।

সিনিয়র ট্রেনিং শিক্ষালাভ

১৯২৩ সালে জানুয়ারী মাসে ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুলে শ্যামমোহিনী ভর্ত্তি হলেন জুনিয়র ট্রেনিং ক্লাশে, কিন্তু পড়তে হল তাঁকে সিনিয়র ট্রেনিং। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে তখন ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুলের ক্লাশ হত। শ্যামমোহিনী জুনিয়র ট্রেনিং বিভাগে ভর্তি হয়ে অভিনিবেশ সহকারে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। সেই সময় ঐ ট্রেনিং

স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন পূর্ণিমা বসাক। তিনি ছিলেন নারীশিক্ষা সমিতির য়্যাসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারী কৃষ্ণপ্রসাদ বসাকের পুত্রবধূ। জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় ক্লাশেরই তিনি Method of Teaching (শিক্ষাপ্রণালী) পড়াতেন। পড়াতে-পড়াতে ছাত্রীদের এ-বিষয়ে নানা প্রশ্ন কবতেন। সে সময় অন্যান্য ছাত্রীর তুলনায় শ্যামমোহিনী অধিকতর তৎপরতার সঙ্গে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতেন, কারণ প্রশ্নগুলির উত্তর তাঁর অনেক আগেই জানা ছিল।

যাঁরা এই ট্রেনিং ক্লাশে ভর্তি হতেন তাঁরা প্রত্যেকেই বৃত্তি পেতেন। ভর্তি হওয়ার পূর্বেই তাঁদের সে ব্যবস্থা হয়ে থাকত। যাঁদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা হত না তাঁরা ভর্তি হতেন না। কিন্তু শ্যামমোহিনী বৃত্তি না নিয়েই ভর্তি হয়েছিলেন। তখন তিনি হোস্টেলে না থেকে বাসা ভাড়া করে থাকতেন। ইতিমধ্যে একটি মেয়ে স্কুল ছেড়ে গেলে একটি বৃত্তি খালি হল। এবং এই বৃত্তিটি অন্য কাউকে দেওয়ার কথা উঠে এবং সেজন্যে কয়েকজন মহিলার পরীক্ষা গ্রহণেরও প্রস্তাব হয়। শ্যামমোহিনী পরীক্ষা দিতে রাজী হলেও অন্য মেয়েরা রাজি হলেন না। তাঁরা বললেন, 'না, পূর্ণিমাদি, আমরা শ্যামমোহিনীদির সঙ্গে পরীক্ষায় বসে পারব না, কাজেই আমাদের পরীক্ষা দিয়েও কাজ নেই। আপনি ও বৃত্তিটা শ্যামমোহিনীদিকেই দিন।'

মেয়েদের একথা শুনে প্রিন্সিপ্যাল বসাক শ্যামমোহিনীকে বললেন 'থাক, আপনাকেও আর পরীক্ষা দিতে হবে না। ওরা পরীক্ষা দিতে রাজি নয় যখন, বৃত্তিটা আপনারই প্রাপ্য—আপনিই পাবেন।'

এরপর পূর্ণিমা বসাক শ্যামমোহিনীকে ডেকে বললেন, 'আপনি এত জানেন, আপনার এত জ্ঞান, আই. এ,-বি. এ, পাস মেয়েরা আপনার সঙ্গে পারে না, তবে কেন আপনি জুনিয়র ট্রেনিং পড়ছেন?'

উত্তরে শ্যামমোহিনী বললেন, 'কিন্তু আমি কি সিনিয়র ট্রেনিং পড়তে পারব?'

হ্যাঁ পারবেন, তবে বৃত্তিটা পাবেন না।

শ্যামমোহিনী বললেন, না পূর্ণিমাদি, আমি বৃত্তি চাই না, বৃত্তি নিয়ে তো আমি পড়তে আসিনি—ও বৃত্তি আপনি কোনো গরীব মেয়েকে দিন।

পূর্ণিমা বসাকের পরামর্শমত শ্যামমোহিনী সিনিয়র ট্রেনিং-এ ভর্তি হলেন। পড়াশুনা এগিয়ে চলল। শ্যামমোহিনীর বিশেষ কোনো কষ্ট হয় না, কারণ তাঁর পাঠ্য বিষয় আগেই তাঁর প্রায় সবই জানা ছিল।

এর মধ্যে একবার ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুলে লি মেমোরিয়াল স্কুল থেকে মিশনারী খৃষ্টান মেমেরা Method of Teaching ক্লাশ নেওয়া দেখতে এলেন।

প্রিন্সিপ্যাল মেয়েদিগকে ডেকে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে মেমসাহেবদের সামনে ক্লাশ নেবে? কেউ রাজি হল না। তখন প্রিন্সিপ্যাল বসাক শ্যামমোহিনীকেই ক্লাশ নিতে বললেন। যদিও শ্যামমোহিনী ওঁদের সামনে পড়াতে খুব ভয় পাচ্ছিলেন তবুও তিনি ক্লাশ নিলেন। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি দেখে মেমেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

শ্যামমোহিনী ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। বার্ষিক পরীক্ষায় তাঁর থিওরেটিক্যাল পরীক্ষার ফল ভালই হল। হাতে কলমে অর্থাৎ প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা নিতে এলেন স্কুল-ইনসপেকট্রেস হৃদয়বালা বোস। শ্যামমোহিনী প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার ক্লাশ নিচ্ছিলেন। ক্লাশে তখন মোট বারজন ছাত্রী ছিল। শ্যামমোহিনীর ক্লাশ নেওয়া শেষ হলে ইনসপেকট্রেস বোস লেডী অবলা বসুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই মহিলার পড়ানোর পদ্ধতি ভারী সুন্দর, ইনি পূর্বে কোথায় পড়েছেন?'

লেডী বসু বললেন, 'উনি গোঁড়া হিন্দুঘরের মহিলা। ঘরে বসে পড়েছেন।' লেডী বসুর উত্তর শুনে হৃদয়বালা বোস বললেন, 'ভারী সুন্দর পড়ান তো। ইনি ঘরে-পড়া গ্রাজুয়েট নিশ্চিত।'

পল্লীশিক্ষা বিভাগের পরিদর্শিকা

শ্যামমোহিনীর বার্ষিক পরীক্ষার ফল তখনও বের হয়নি। কিন্তু স্কুল ইনসপেকট্রেস হৃদয়বালা বোসের এ মন্তব্যে লেডী অবলা বসু অত্যন্ত খুসী হলেন। খুসী হয়ে তিনি শ্যামমোহিনীকে পল্লী স্কুলের পরিদর্শিকা করে পাঠালেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নারী শিক্ষা সমিতির অধীনে পল্লীশিক্ষা বিভাগের কতকগুলি স্কুল ছিল হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলায়। এই পল্লী স্কুলগুলির শিক্ষয়িত্রীগণকে শিক্ষাদান-প্রণালী শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই সকল ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীগণের কাজ।

প্রসঙ্গক্রমে লেডী অবলা বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'নারী শিক্ষা সমিতি'র রিপোর্টের কথায় আসা যাক—তাহলে বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনের প্রতিষ্ঠা ও তার উদ্দেশ্য, পল্লীগ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

"১৯২২ সালে বিদ্যাসাগর বাণীভবন হিন্দু-বিধবাদিগকে সাহিত্য-শিল্পকলাদি শিক্ষা দিয়া শিক্ষয়িত্রী হবার ও আপন জীবিকা অর্জনে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে এই ভবনে ৩০টি ছাত্রী থেকে শিক্ষালাভ করছে। স্থানাভাবে অনেক আগ্রহীর আবেদনও অগ্রাহ্য করতে হচ্ছে।

এই ভবন হতে শিক্ষালাভ করে বর্তমানে ২৫টি ছাত্রী বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করছে। তিনজন সেবার কার্য করে জীবিকা উপার্জন করছেন এবং পাঁচটি সমিতির কার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন।

এই কয়টি বিধবা অপরের গলগ্রহ হয়ে দুঃখময় জীবন যাপন করার পরিবর্তে বাণীভবনে শিক্ষালাভ করে স্বাবলম্বী হয়ে আপন পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যাণ করছেন।

বাণীভবনে শিক্ষা ও বাসের জন্য কোনও ফী নাই।

পল্লীগ্রামে বালিকা বিত্তালয়

সমিতির সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ৪টি জেলায় ২০টি স্কুল আছে। অপরগুলি কর্পোরেশন, স্বাধীন সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হয়েছে। এই সব স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিল্পকার্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ১,০০০ হাজার।

সমিতি হতে গিয়ে মহিলা স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রতিমাসে স্কুলগুলি পরিদর্শন ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণের সহিত শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকেন।"

বাদুড়বাগান লেনে এই আবাসিক "বিত্তাসাগর-বাণীভবন" বিধবা আশ্রম তৎকালীন বিধবাদের বিশেষ করে ১০ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে যাদের বয়স তাদের যে সুযোগ-সুবিধে করে দিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা ও নানারূপ শিল্পকাজ শিখে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে, তা নিম্নে বিধবাদের বয়সের তালিকা থেকে উপলব্ধি করা যাবে।

বাংলাদেশে তখন স্ত্রীলোকদের সংখ্যা ছিল—২, ২৫, ৪৪, ৩১৪, তন্মধ্যে বিধবাদের সংখ্যা···৪৪, ৪৮, ০৫০। এর মধ্যে বয়স অনুপাতে বিধবাদের সংখ্যা ছিল—

১। ১০ বৎসর পর্যন্ত — ৯,৮৭৪

২। ১০ থেকে ১৫ " — ৩৫,৪২৮

৩। ১৫ " ২০ " — ৯৩,৭১৩

৪। ২০ " ২৫ " — ১,৪৬,৬০০

৫। ২৫ " ৩০ " — ২,২৩,৮৬৫

৬। ৩০ " উর্দ্ধে " — ১৯,৫৫,৯০৩

তৎকালে বিধবাগণ সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে যে নির্মম যাতনা ভোগ করেছে তা বর্ণনাতীত। বাংলার এই সমস্ত অবহেলিতা নিরক্ষরা নিঃসহায়া বালবিধবাদের দুঃখে বিগলিতা হয়ে ও তাদের প্রতি অসীম মমত্ববোধে তাদিগকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার

জন্যেই লেডী অবলা বসু বিদ্যাসাগর বাণীভবন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাবধি তার শাখা অফিস মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রামে অবস্থিত আছে। এতদ্ব্যতীত তিনি নারীশিক্ষা বিস্তারের যে অসাধারণ কর্মধারার আদর্শ রেখে গেছেন তাঁর সে অত্যুৎজ্বল গৌরবময় কর্মধারা যুগযুগান্তর স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে জাজ্বল্যমান থাকবে। জীবনব্যাপী তাঁর সে সাধনার কথা বলতে গেলে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'নারী শিক্ষা সমিতি'র গোড়ার কথা কিছু বলতে হয়।

নারী শিক্ষা সমিতি

১৯১৯ সালে লেডী অবলা বসু নারী শিক্ষা সমিতি স্থাপন করেন। এর মুখ্য উদ্দেশ্য বাংলাদেশে বিশেষভাবে পল্লীগ্রামে স্ত্রী-শিক্ষার এরূপ ব্যবস্থা করা যাতে বালিকারা সু-মাতা ও সু-গৃহিণী হতে পারে, পুরস্ত্রী ও বিধবাগণ নিজ নিজ বাসগৃহ শান্তির আলয় করতে পারে এবং প্রয়োজনত শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী প্রভৃতির কাজের দ্বারা ও শিল্পচর্চা দ্বারা জীবনোপায় করতে পারে।

উদ্দেশ্য :—এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করবার জন্য নারী শিক্ষা সমিতির কাজের তিনটি ধারা রয়েছে—শিক্ষা বিস্তারকরা, শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা এবং আর্থিক উন্নতি সাধন করা আর সহরে বিশেষতঃ গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন (১৯২২)—শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করার জন্যে এই নামে সমিতির অধীনে একটি বিধবা আশ্রম হয়েছে।

এখানে হিন্দু আচারপদ্ধতি বজায় রেখে বিনা খরচায় তিন বৎসর যাবতীয় শিল্পকাজ ও মধ্য ইংরেজী পর্যন্ত লেখাপড়া শিক্ষা দিয়া নানারূপে সম্মানের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য বিধবাদিগকে উপযুক্ত করে দেওয়া হয়।

এই সময় বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষা সমস্যা কত প্রবল ছিল নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকে তার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যাবে।

বাংলার স্ত্রীশিক্ষা সমস্যা (১৯১৯)

বিদ্যালয় ও ছাত্রীসংখ্যা

বাংলার লোকসংখ্যা ঃ— ৪, ৬৬, ৯৫, ৫৩৬

তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা— ২, ২৫, ৪৪, ৩১৪

তন্মধ্যে বিধবা— ৪৪, ৪৪, ০৫০

লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা **দুইজনেরও কম স্ত্রীলোক** মাত্র নাম সহি করতে ও কোনরকমে চিঠি লিখতে ও পড়তে পারত। তার মধ্যে বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত বয়সের বালিকার সংখ্যা ৩৩, ৮১, ৬৪০।

সমগ্র বাংলার স্ত্রীশিক্ষার জন্য কলেজ, উচ্চ ইংরেজী, মাইনর ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল কিঞ্চিদ্‌ধিক ১৪, ০০০।

এদের ছাত্রীসংখ্যা মোট—৩, ৫৭, ০২৯। বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ আছে মাত্র ৩, ৫৭, ০০০ জনের।

যারা অ আ, ক খ গ ঘ কিছুই জানে না তারা ছিল ত্রিশ লক্ষ। নিম্নের প্রাথমিক (প্রাইমারী) বিদ্যালয়সমূহের মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল—৩, ৫৫, ৬৭১

শ্রেণীবিভাগ অনুসারে—

সর্বনিম্ন বা ১ম শ্রেণীর ছাত্রী সংখ্যা—		২, ৯০, ৪৭৩	জন
২য় শ্রেণী	” ” —	৭১, ৬৬৯	”
৩য় শ্রেণী	” ” —	১৭, ১৮৯	”
৪র্থ শ্রেণী	” ” —	২, ৯১৪	”
৫ম ”	(উচ্চপ্রাইমারী)	২, ০১৪	”

(১) ১৪ বছরের শেষে মোট প্রায় ৩ লক্ষ ছাত্রীর মধ্যে বিদ্যালয় ত্যাগ করে আড়াই লক্ষ।

২। তৃতীয় বছরের শেষে নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে পৌনে তিন লক্ষ ছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করে।

৩। পঞ্চম বছরে উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে মাত্র দুই হাজার ছাত্রী

পাঠ করে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হতে না হতে ৩ লক্ষ ছাত্রীর মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ছাত্রী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে যায়।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় এদেশে ব্যাপক স্ত্রীশিক্ষা প্রসার তখনও তেমন আরম্ভ হয়নি। যে কতিপয় মহীয়সী নারীদরদী তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা নারী জাতিকে গৌরবান্বিত করে গেছেন তাঁদের মধ্যে নারীহিতৈষী লেডী অবলা বসুর ত্যাগপূত জীবনের কথা কিছু না বললে নিঃস্বার্থ, সমর্পিতপ্রাণা, নারীদরদী মহীয়সী শ্যামমোহিনীর কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বস্তুত লেডী অবলা বসু তাঁর নারীশিক্ষা সমিতির অধীন বিদ্যাসাগর বাণীভবনে (১৯২২) শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করার জন্মে বিধবা আশ্রম না করলে এবং তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় বৃহত্তম কর্মক্ষেত্রের প্রস্তুতির জন্য হাতেখড়ি না নিলে আজকে নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের (১৯৩৫) মত এতবড় বিরাট প্রতিষ্ঠান করে তাকে অসামান্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা এবং এখানে শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়ে সর্বস্তরের শত শত বিধবা সধবা অধবা নারীদের জীবনে স্বাবলম্বী করা শ্যামমোহিনীর পক্ষে সম্ভব হত কিনা সে কথা পর্যালোচনা করা দরকার মনে করি।

লেডী অবলা বসু

১৮৬৫ সালে ৮ই আগষ্ট অবলা বসু তাঁর পিতার কর্মস্থল বরিশাল জেলায় (অধুনা বাংলাদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর পিতার নাম দুর্গামোহন দাস। ইনি একাধারে কৃতী আইনজীবী ও অমিততেজস্বী সমাজ-সংস্কারক পুরুষ ছিলেন। এ কাজে তিনি নিজেকে একান্তভাবে সঁপে দেন।

শোনা যায় তৎকালীন কঠোর সামাজিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দুর্জয় সাহস বক্ষে নিয়ে তিনি তাঁর বিমাতাকে পুনরায় বিবাহ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতৃব্য।

পিতার এই বৈপ্লবিক মহান গুণাবলী লেডী অবলা বসুর চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। লেডী অবলা বসুর ভগ্নী সরলা রায় ছিলেন একজন অসামান্যা সমাজ-সংস্কারক ও নারীদরদী। তিনি বহু নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। সেগুলির মধ্যে গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটি আজও দক্ষিণ কলকাতায় চলেছে।

পিতার জীবনের প্রভাব ভগিনীদ্বয়ের মধ্যে কিভাবে প'ড়েছিল তা 'আমার দিদি' প্রবন্ধে লেডী অবলা বসু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন :

তিনি লিখেছেন, "আমরা কি কেবল অন্তঃপুরে প্রাচীরবদ্ধ হইয়া থাকিবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের মধ্যে কি বিন্দুমাত্র পরোপকার করিবার বল ও শক্তি নাই?"

এর সমর্থনে সরলা রায় 'আমাদের দায়িত্ব' নামে এক বক্তৃতায় বলেছেন, "পুরুষরা আমাদের জন্য অনেক করিয়াছেন, এখন আমাদের অগ্রসর হইয়া, অন্ততঃ সম্ভাবনীয় করণীয় কার্যগুলির ভার না লইলে, তাঁহাদের প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে বা দেশের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারিব না।"

১৮৯০ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস (লেডী অবলা বসুর পিতা), আনন্দমোহন বসু ও অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় স্থাপন করেন। লেডী বসু ও তদীয়া ভগ্নী সরলা রায় প্রথম থেকে এই শিক্ষালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে এর বহু উন্নতি সাধন করেন।

১৮৯৮ সাল থেকে সরলা রায় স্বীয়হস্তে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ভার তুলে নেন। ১৯১০ সালে তিনি এই ভার তদীয় ভগ্নী অবলা বসুর উপর অর্পণ করেন। ১৯১০ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত লেডী বসু উক্ত বালিকা শিক্ষালয়ের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই কাজের ভার নিয়ে তিনি চাঁদা তুলে পিতার নামানুসারে 'দুর্গামোহন ভবন' নামে মেয়েদের জন্যে বড় বড় হল বিশিষ্ট একটি আবাসিক ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করেন।

লেডী বসুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর 'নারী শিক্ষা সমিতি' ও 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন'। ১৮৮১ সালে অবলা দাস (বসু) বেথুন স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এণ্ট্রাস পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর ১৮৮৩ সালে এফ্. এ পাশ করে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারীতে ভর্তি হন। কিন্তু ডাক্তারী পড়া তাঁর আর সম্ভব হল না! ১৮৮৭ সালে ভুবন-বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর ছায়ার ন্যায় তিনি নিরন্তর স্বামীর সঙ্গে থেকে তাঁকে পরিচর্যা করে স্বামীর সাধনার পথ প্রশস্ত ও নিঃশঙ্ক করে দিয়েছেন। তিনি স্বামীর সঙ্গে বিশ্বের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণের সময় সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলেন সিস্টার নিবেদিতা ও কৃষ্ণভামিনী দাসকে।

কৃষ্ণভামিনী দাস (১৮৬৪-১৯১৯) ছিলেন বহুবাজারের বিখ্যাত শ্রীনাথ দাসের পুত্র, 'সেঞ্চুরী কলেজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিষ্টার দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহধর্মিণী। ইনি একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। এঁর বহু মূল্যবান লেখা প্রবাসী, সভা, প্রদীপ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন নারীকল্যাণ ব্রতে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের প্রাণস্বরূপা ছিলেন। তিনি বহুবার বিলাতে গেছেন। সঙ্গী লেডী বসু, আচার্য জগদীশ বসু ও সিস্টার নিবেদিতা। সিস্টার নিবেদিতা ইতিমধ্যে বাগবাজারে মেয়েদের জন্যে একটি শিক্ষা নিকেতন খুলেছেন। কৃষ্ণভামিনী দাসের সঙ্গে শ্যামমোহিনীর পরিচয় ছিল। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে শ্যামমোহিনী মহিলাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেন। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণভামিনী দেবী শ্যামমোহিনীর সঙ্গে আলাপ করে খুসী হন এবং তাঁকে শিক্ষা বিস্তার করার পরামর্শ দেন।

একদিকে সিস্টার নিবেদিতার প্রভাবে অন্যদিকে বিশ্বের উন্নতিশীল দেশের নারীর সংস্পর্শে অবলা বসুর মনে আপন দেশের নারীর দুর্দশার দিকে নজর পড়ে এবং সে দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্যে তিনি স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান গঠনের মূলে তাঁর

অন্তর্দৃষ্টির তুলনা হয় না। একাজে তিনি যে অমর কীর্তি রেখে গেছেন তা অল্পকথায় বলার নয়। বারান্তরে এই মহীয়সী বসুমাতার মহত্ত্বর জীবনের কিছু তুলে ধরার কামনা রাখি। তবে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়, ইদানীং সরকারী সাহায্যে গঠিত নারীকল্যাণমূলক যে সব সংগঠন দেখি, এর উদ্ভাবনের মূলে লেডী অবলা বসুর অন্তর্দৃষ্টির উদ্ভাবনী শক্তির সাক্ষ্য রয়েছে।

লেডী অবলা বসুর স্নেহচ্ছায়ায়

শ্যামমোহিনী লেডী অবলা বসুর অপূর্ব সংগঠনপ্রজ্ঞাপ্রদীপের পাঠপীঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে সেদিন যে আলোয় ভরে নিয়েছিলেন—অনির্বাণ সে আলো ধিকিধিকি জ্বলে শ্যামমোহিনীকে নারী শিক্ষা পরিষদ গঠনে প্রেরণা দান করে। এ কাজে তিনি অসামান্য সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়ে বিধবা, সধবা, কুমারী, দুঃস্থা, নিপীড়িতা, নিগৃহীতা, নিরন্ন, নিরাশ্রয় সর্বস্তরের শত শত মেয়েকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন ক্রমাগত অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী। সে ইতিহাসই একে একে বলছি। এর পূর্বে লেডী বসুর অবদান তাঁর একাজে কি বিপুল সাহায্য করেছে আসুন নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা শ্যামমোহিনীর জবানীতে তা অবগত হই।

১৯৬৫ সাল। লেডী অবলা বসুর জন্মশতবার্ষিকী। এই উপলক্ষে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় কর্তৃক আয়োজিত লেডী অবলা বসু জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যায় শ্যামমোহিনী ব্রাহ্ম ট্রেনিং বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী ও প্রাক্তন শিক্ষিকা হিসাবে "শ্রদ্ধেয়া লেডী অবলা বসু স্মরণে" এই শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান।

"মাননীয়া লেডী অবলা বসুর সহিত ১৯২৩ সালে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তখন তাঁর সম্পাদনায় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়—ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুল ও নারী শিক্ষা সমিতির অধীনে বিদ্যাসাগর বাণীভবন

বিধবা আশ্রম, মহিলা শিল্পভবন, পল্লীশিক্ষা বিভাগ ও নারী সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতি চলিতেছিল।

তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের এই সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হই ও তাঁহার সহিত মাঝে মাঝে দেখা করিয়া তাঁহার কার্যাবলীর খুঁটিনাটি বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে থাকি। তিনি ঐ বিষয়ে আমার আগ্রহ দেখিয়া আন্তরিকতার সহিত সকল বিষয় আমার সহিত আলোচনা করিতেন ও কি কি উপায় অবলম্বন করিলে দেশে শিক্ষাবিস্তার-কার্য আরও ভালভাবে চালানো যায় তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতেন। বাণীভবনের মেয়েদের জুনিয়র ট্রেনিং পড়ানোর জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রস্তুতির ভার আমার উপর অর্পণ করেন—পূর্বে উহারা বারবার ঐ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছিল। সেই সময় বাণী ভবনের মেয়েদের জুনিয়র ট্রেনিং প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি তাহাদের পড়ান আরম্ভ করি—ডিসেম্বরে ঐ পরীক্ষায় উহারা পাশ করে। পরে ১৯২৫ হইতে ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হইয়া ট্রেনিং পাশ করিয়া যোগ্য শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হয় ও সমিতির পল্লীবিদ্যালয়-সমূহে প্রেরিত হইতে থাকে।

তাঁহার পল্লীশিক্ষা বিভাগটির জন্য উপযুক্ত পরিদর্শিকার অভাব জানাইয়া আমাকে ঐ কার্য গ্রহণ করিতে বলায় আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ঐ কার্যভার গ্রহণ করি। নারী শিক্ষা সমিতির অধীনে প্রায় ৪০টি পল্লী বিদ্যালয় ছিল। ২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলার কয়েকটি গ্রামে, ঢাকা, ময়মনসিং ও বিক্রমপুরের কয়েকটি গ্রামে ও পাবনা জেলার কয়েকটি গ্রামে নারী শিক্ষা সমিতির সাহায্যে বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হইত। আমি হুগলি, হাওড়া ও ২৪ পরগণার স্কুলগুলির ভার নিয়াছিলাম। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েই লেডী বোসের কর্মক্ষমতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাইয়াছি। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কাজ করায় আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় ঐ কাজ ত্যাগ করিয়া আমি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করি।

ঐ সময় তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করি ও তাঁহার নির্দ্দেশে অবসর সময়ে যথাসাধ্য সমিতির কাজ করিতাম।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার কাজ দেখিতাম। সকাল হইতে ১১টা পর্য্যন্ত অতন্দ্রভাবে স্বামীসেবা ও সংসারের কাজ শেষ করিতেন। পরে ডক্টর বোস বিশ্রাম করিতে গেলে তাঁহার দেশসেবার কাজ আরম্ভ হইত। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুলের কাজ প্রায়ই দেখিতে যাইতেন। তৎপর নারী শিক্ষা সমিতিতে ৬।১ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে বেশী সময় অবস্থান করিয়া তথাকার কার্যাবলী দেখিতেন। ঐ সময় হরিমতি দত্ত নাম্নী একজন দানশীলা মহিলা তাহার সর্বস্ব ৩৫০০০ টাকা বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের গৃহ নির্মাণের জন্য দান করেন। ঐ দান পাইয়া লেডি বসুর যে আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি দেখিয়াছি, নিজে সাম্রাজ্য লাভ করিলেও বোধ হয় তিনি অত আনন্দিত হইতেন না।

তারপর ১৯২৬ সালে পাবনা এম. ই স্কুলটিকে হাই স্কুলে পরিণত করার জন্য আমার ডাক আসায় আমি তথায় চলিয়া যাই। পাবনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত শিক্ষাবিস্তার ও কংগ্রেসের কাজে ব্যাপৃত থাকি। তৎপর ১৯৩১ সালে আবার লেডী বোস আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া সমিতির কাজে যোগদান করিতে বলেন। তারপর আমি নারী শিক্ষা সমিতির বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ গ্রহণ করি। এই সময় দেখিয়াছি তিনি প্রায় প্রত্যহ নারী শিক্ষা সমিতির উন্নয়নমূলক কাজে ১২টা হইতে ২টা পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকিতেন। ঐ সময়ে তাঁহার সুযোগ্য এ্যাসিট্যাণ্ট সেক্রেটারী শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক মহাশয় ও আমি তাহার সঙ্গে থাকিতাম। স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিয়া স্বাবলম্বী করাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বাণী ভবন বিধবাশ্রমের উন্নতির জন্য তিনি কত চেষ্টাই না করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের বহু পরিকল্পনা ও পরামর্শ সর্বদাই করিতেন। দেশে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইলে বহু ট্রেণ্ড শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন—ঐ উদ্দেশ্যে একটি ট্রেনিং স্কুল স্থাপনের

চেষ্টা করিতে থাকেন ও গভর্ণমেন্টের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে থাকেন। তাহার ফলস্বরূপ ১৯৩৫ সালে বাণীভবন ট্রেনিং স্কুলটি স্থাপিত হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানটি হইতে বৎসর বৎসর বহু শিক্ষয়িত্রী পাশ করিয়া বাহির হইতেছে এবং সুষ্ঠুভাবে দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। তৎকালে বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের একটি শাখা ঝাড়গ্রামে স্থাপিত হয়। এজন্য তথাকার রাজা জমি বাড়ী প্রভৃতি দান করেন। তাহার পর হইতে বাণীভবন-বিধবাশ্রমটি ঝাড়গ্রামে পরিচালিত হইয়া বিধবাদের শিক্ষাদান করত তাহাদের দুঃখ ও অভাব মোচন করিয়া স্বাবলম্বী করিতেছে। তাঁহার ন্যায় মনস্বিনী, গুণবতী ও প্রতিভাশালিনী মহিলা জগতে খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার মহৎ জীবনের কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

লেডী অবলা বসু আমার জীবনে আদর্শস্বরূপিনী ছিলেন। নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের অন্তর্গত বাণীপীঠ স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনায় তাঁহার অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইয়াছি। আমি ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত নারী শিক্ষা সমিতিতে কাজ করিয়াছি ও তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষাবিস্তারের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি। তাহার ফলে ১৯৩৪ সালে ওখানে থাকিতেই বাণীপীঠ হাইস্কুল, প্রাইমারী স্কুল, বয়স্কা মেয়েদের জন্য শর্ট ম্যাট্রিক স্কুল, শিল্পবিদ্যালয়, ছাত্রীনিবাস প্রভৃতি স্থাপিত হয়। তিনি প্রথমে ইহার গভর্নিং বডিতে ছিলেন। তাঁহার আশীর্বাদই এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও পাথেয়।

আজ এই স্মরণীয় দিনে আমি পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি ও ভগবানের নিকট তাঁহার সুমহতী কীর্তি, অম্লান যশ ও অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিতেছি। তাঁহার জীবনী পর্যালোচনা করিয়া দেশের নারীসমাজ তাঁহার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হউক, কর্মে প্রেরণা লাভ করুক ও দেশের অশিক্ষা দূর করার জন্য স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হউক এই আশা পোষণ করি।"

শ্যামমোহিনীর এই সুন্দর স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন

লেডী অবলা বসুর মহৎ জীবনের কথা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি 'লেডী অবলা বসু আমার জীবনে আদর্শস্বরূপিনী ছিলেন' কথার দ্বারা লেডী বসুর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। শ্যামমোহিনীর এই লেখনীর মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের একটি অনুপম দিক প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি যেমন কোমলস্বভাবা, স্বল্পভাষী এবং সত্যকথনে অভ্যস্ত লেখাটিও তেমনি সংক্ষিপ্ত, স্বচ্ছ ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং মূল্যবান, তথ্যবহুল ও বাহুল্যবর্জিত। তিনি অতীতে অনেক লেখা লিখেছেন। কিন্তু সে লেখার কোনো কপি রাখারও প্রয়োজন মনে করেন নি। তা না হলে সে সমুদয় লেখা নিয়ে বৃহৎ একখানি সংকলনগ্রন্থও হতে পারত। লেখার হাত তাঁর অপূর্ব কিন্তু সময়াভাবে লিখতে পারেন নি। তিনি দুঃখ করে বলেন, এত কাজ করেছি আর ভেবেছি আমার ডায়েরী লেখা উচিত কিন্তু সময় পাইনি—ফলে তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি। লিখলে অনেক অজানা তথ্য আমরা জানতে পারতাম। না লিখে রাখার জন্য অনেক কিছু থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। কারণ দীর্ঘ ছেয়াশী বৎসর বয়সে এখন তাঁর পক্ষে স্মৃতিচারণ করা খুবই কষ্টকর। তবু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়ে এই বয়সেও তাঁর যে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়েছি তাতে আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষয়িত্রী

এখন আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ১৯২৪ সালে শ্যামমোহিনী সিনিয়র ট্রেনিং পাশ করলেন। পরীক্ষা দিয়েই তিনি লেডী বসুর কথায় তিনমাস নারীশিক্ষা সমিতির অন্তর্গত গ্রামের স্কুলসমূহের পরিদর্শিকার কাজ করেন। কিন্তু শরীর খারাপ হওয়ায় তিনি লেডী বসুকে অনুরোধ করলেন তাঁকে কলকাতায় কাজ দেবার জন্য।

শ্যামমোহিনীর অসুবিধার কথা শুনে লেডী বসু তাঁকে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন। তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ

করেন আর অবসর সময়ে লেডী বসুর সঙ্গে নারীশিক্ষা সমিতির দেখাশুনা করেন। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এইভাবে তাঁর কাজ চলছিল। এ কাজ ছাড়া তিনি সকালবেলা একটি করপোরেশন স্কুলের হেড-মিসট্রেসের কাজও করতেন। এই ফ্রি প্রাইমারী করপোরেশন স্কুলটি বিদ্যাসাগর কলেজ ভবনে চল্‌ত।

দীপালী সংঘ গঠন

১৯২৪ সাল। তখন ছিল স্বাদেশিকতার যুগ। দেশের প্রাণশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছু একটা করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ১৯০৫ সালে ৭ই আগষ্ট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নীতি রহিত আন্দোলনের পর থেকেই স্বাদেশিকতার আন্দোলন বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের ফলে ইংরেজ সরকার দুই বাংলাকে একত্রিত করতে বাধ্য হলেন। এতে দেশপ্রেমে দেশের মানুষ প্রচণ্ডভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। শ্যামমোহিনীর প্রাণশক্তিও এই সময় একটার পর একটা কাজের ভার নিয়ে প্রচণ্ড কর্মপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হতে থাকে। মেয়েদের মধ্যে স্বাদেশিকতাবোধ জাগ্রত করার জন্য তিনি হোস্টেলের এবং পাড়ার মেয়েদের নিয়ে 'দীপালী সংঘ' গঠন করলেন। এই সময় তিনি মেয়েদের নিয়ে সভাসমিতিতেও যোগদান করতেন।

বিপ্লবী পুলিন দাস

বিপ্লবী লেঠেল পুলিন দাস শ্যামমোহিনীর 'দীপালী সংঘে'র মেয়েদের লাঠিখেলা, ছোরাচালান ও যুযুৎসুর প্যাঁচ শিক্ষা দিতেন ঐ হোস্টেলেরই প্রাঙ্গণের মধ্যে। এইগুলি শিক্ষার মাধ্যমে পুলিন দাস বহুনারীকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। নারী জাতিকে জড়ত্ব থেকে জাগ্রত করে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেবার প্রয়াস চালান।

সে এক যুগ গেছে—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমিত শক্তিসম্পন্ন বন্দেমাতরম্‌ শক্তিমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জাতির প্রাণশক্তি
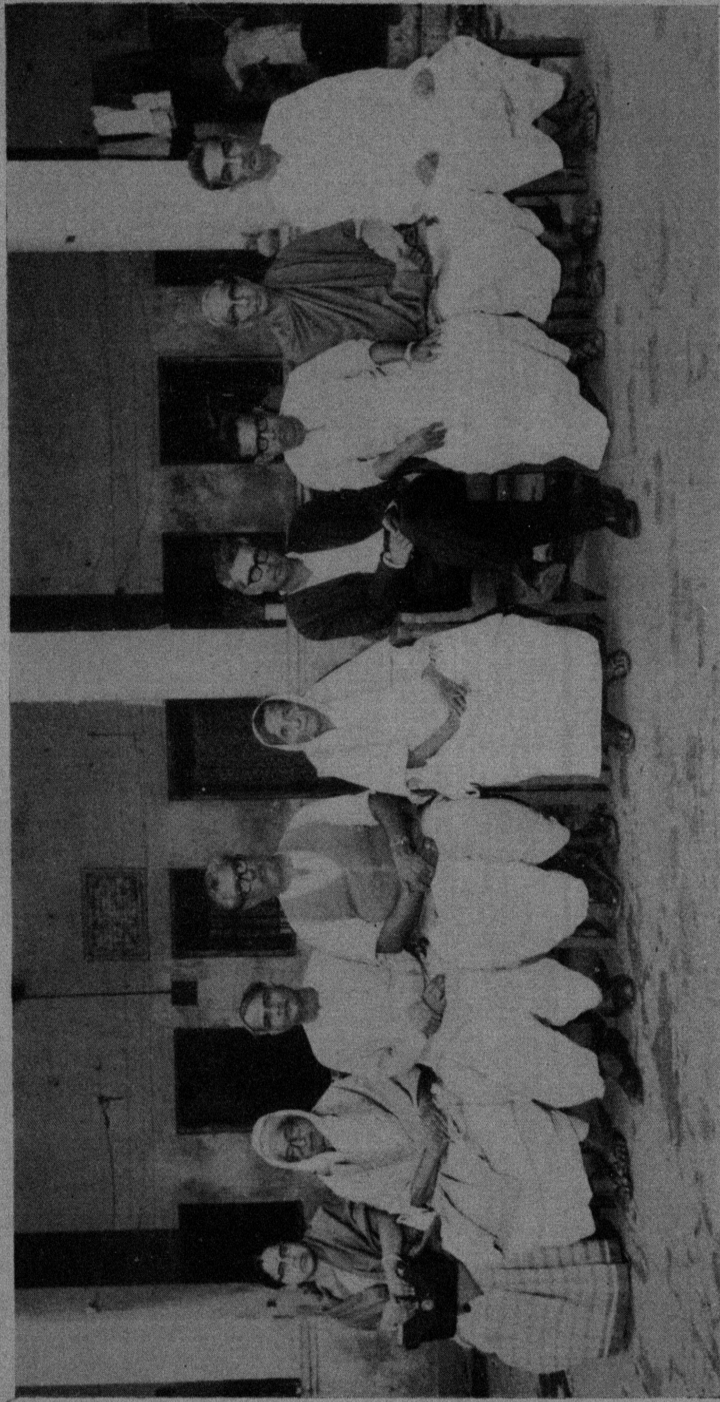
কার্যকরী কমিটির কতিপয় সদস্য ; মধ্যস্থলে শ্যামমোহিনী
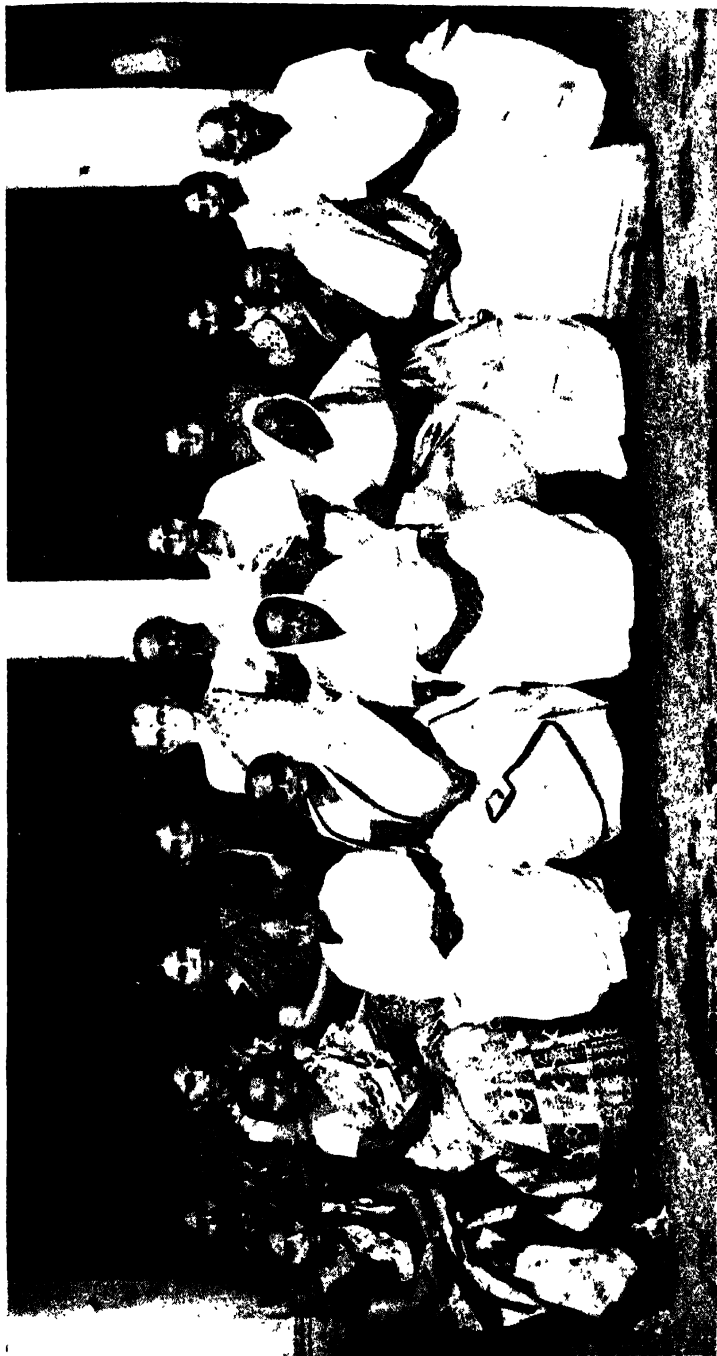
পরিষদের কতিপয় কর্মীর সঙ্গে শ্যামমোহিনী (প্রথম সারির বাম হতে পঞ্চম)

জড়ত্ব থেকে পূর্বেই বিপুলভাবে জেগে উঠেছিল। অন্যদিকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসীর কর্ণে ক্রমাগত দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের বাণী ওজস্বিনী ভাষায় শোনাতে থাকেন। অকস্মাৎ প্রাণ-শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে কত মহৎ ব্যক্তি যে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তার সীমাপরিসীমা নেই। বিপ্লবী পুলিন দাসও এই জাগ্রত প্রাণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে রাখতে গোপনে বিপ্লবী দল গঠন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশিত শক্তিমন্ত্রে বাঙালী জাতিকে শিক্ষা দিতে তিনি প্রথমে ঢাকায় (অধুনা বাংলা দেশ) মৈশুণ্ডীতে ভূতের বাড়ী নামে খ্যাত এক বাড়ীতে লাঠিখেলা প্রভৃতির মাধ্যমে বিপ্লবী দল গঠন করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা সমগ্র বাংলাদেশের নারীপুরুষনির্বিশেষে সকলের মধ্যে চলত। বীরাঙ্গনা বীণা দাসের (ভৌমিক) দিদি বিপ্লবী কল্যাণী দাসের (ভট্টাচার্য) "ছাত্রীসংঘে'র মেয়েদের পুলিন দাস লাঠিখেলা, ছোরা চালান ও যুযুৎসুর প্যাঁচ শিক্ষা দিতেন। আমি নিজে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত বিপ্লবী লেঠেল পুলিন দাসের নিকট লাঠিখেলা, ছোরা চালান, যুযুৎসুর প্যাঁচ শেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। আমি থাকতাম তখন বালিগঞ্জ সরলা পুণ্যাশ্রমে। পড়তাম লেক গার্লস স্কুলে। প্রখ্যাত আইনবিদ্ ও সুসাহিত্যিক ডঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের সুযোগ্যা কন্যা সুষমা সেনগুপ্তা একাধারে ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা ও প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে স্কুলটি খুব সুনামের সহিত চলত। স্কুলটি এখন নিজস্ব বাড়ীতে চলছে। স্কুলের ক্লাশ শেষে বোর্ডিং-এ ফিরে এসে আমরা বোর্ডিংএর মেয়েরা মিলে খেলাধূলার জন্য বেরিয়ে পড়তাম। আমরা প্রথমে পুলিন দাসের নিকট ঐসব খেলা শিক্ষা আরম্ভ করি আশ্রমের সন্নিকটে বালিগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। তারপর বালিগঞ্জের সিঙ্গিপার্কের বিরাট চত্বরের মধ্যে। লাঠিখেলা, ছোরা চালান, যুযুৎসুর প্যাঁচ ছাড়াও আমাদের সাইকেল চালান, সাঁতার কাঁটা ও নানাবিধ ব্যায়াম শিক্ষা

করতে হত। এই সমুদয় খেলাধূলা, ব্যায়াম শিক্ষা প্রভৃতি সিঙ্গি পার্কের হাতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হত। সিঙ্গি পার্কের মধ্যে তখন একটি পুকুর ছিল। সেখানে মেয়েদের সাঁতার শেখান হত। আমরা পূর্ব বঙ্গের মেয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই সাঁতার জানতাম এবং আমরা যে সব মেয়ে সাঁতার জানত না তাদের সাঁতার শেখাতাম।

আমরা চারটি মেয়ে তৃপ্তি, মীনা, টুনু ও আমি লেঠেল পুলিন দাসের অতি প্রিয় ছাত্রী ছিলাম। আমাদের তিনি অন্য মেয়েদের দেখিয়ে দিতে বলতেন। তখন নিতান্ত অল্প বয়স আমাদের। বিপ্লবী লেঠেল পুলিন দাসের অমর কীর্তির কথা বিশেষ কিছু জানতাম না। খেলার মাষ্টার মশায় বলেই তিনি আমাদের কাছে পরিচিত ছিলেন। আচার্য বেণীমাধব দাশের সহধর্মিণী মহীয়সী সরলা দেবী-প্রতিষ্ঠিত "সরলা পুণ্যাশ্রমের" সত্তর-আশি জন মেয়ে আমরা পুলিন দাসের নিকট খেলা শিখতাম। এ ছাড়া বাইরের মেয়েরাও আসতেন। এদের মধ্যে ঘরের বউ থেকে বয়স্কা মহিলাগণও ছিলেন। কি যত্ন নিয়ে যে তিনি খেলা শেখাতেন। তখন তাঁর বেশ বয়স হয়েছে, কিন্তু পাকা লাঠি হাতে তিনি যখন চত্বরটা ঘুরে এসে আমাদের লাঠিতে লাঠি ঠেকাতেন তখন তাঁর দৈহিক শক্তি, মনের জোর ও আত্মিক শক্তির এক অনুপম রূপ দেখে আমরা রীতিমত বিস্মিত হতাম। আজ অমর সে বিপ্লবী দেশপ্রেমিকের অবদানের কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসছে। দেশে তেমন মানুষ আজ সুদুর্লভ বলে মনে হয়। দেশের যুবকযুবতীদের সেভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করে দৈহিক, আত্মিক ও মানসিক শক্তি বলে বলীয়ান করে তোলার পক্ষে ইদানীং দেশে মানুষের বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। নতুবা দেশের এমন হাল হত না।

শ্যামমোহিনী তখন নিজেও পুলিন দাসের নিকটে লাঠিখেলা প্রভৃতি শিখতেন। কিন্তু এই লাঠিছোরা ও ফুফুসুর প্যাঁচের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী পুলিন দাস তাঁর কানে কি মন্ত্র দিলেন বা

তিনি কি বুঝলেন তা তিনিই জানেন, তবে অচিরেই তিনি স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন।

কংগ্রেসের সদস্য

শ্যামমোহিনী ১৯২৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদভুক্ত হলেন। কংগ্রেসের সদস্যপদের জন্য মাসিক চাঁদা ছিল চার আনা। সদস্য হয়েই তিনি স্বদেশী কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি এই সময় কংগ্রেসের প্রচারার্থে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা শ্রবণে বহু মেয়ে উৎসাহিত হয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন। মেয়েপুরুষ প্রত্যেকেই তাঁর বক্তৃতা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন এবং তাঁর সাহসিকতা ও দেশপ্রেম দেখে অনুপ্রাণিত হতেন। প্রবীণ সাংবাদিক, "মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার", "দেশপ্রাণ শাসমল" "শরৎ-সাহিত্যে নারী" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক এবং 'প্রভাত' মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ পাল প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে শ্যামমোহিনীর তৎকালীন অনেক বক্তৃতা শুনেছেন বলে প্রসঙ্গক্রমে আমাকে জানান এবং মহীয়সী শ্যামমোহিনীর বিপুল কর্মশক্তির উল্লেখ করে' তাঁর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

একাদশ অধ্যায়

পাবনায় পুনর্গমন

শ্যামমোহিনী তাঁর যে দুটি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিয়ে ব্রাহ্ম ট্রেনিং হোস্টেলে থাকতেন তার মধ্যে কনিষ্ঠা সুরমা ১৯২৬ সালে মারা যায়। এ-কারণে তিনি খুব মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এরপর তিনি ঐ বৎসরে পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আকুল আহ্বানে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের কাজে ইস্তফা দিয়ে পাবনায় চলে আসেন।

কিন্তু ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত শ্যামমোহিনী লেডী অবলা বসুর নারীশিক্ষা সমিতিতে থেকে একই সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করার তাঁর যে অসামান্য বহুমুখী শক্তির নিদর্শন রেখে এলেন তাতে লেডী বসু তাঁর সাহায্য একান্ত অপরিহার্য মনে করলেন। পরবর্তীকালে শ্যামমোহিনীকে পুনরায় তিনি তাঁর নারী শিক্ষা সমিতির কাজে সাহায্যের জন্য আহ্বান করেন। ক্রমে সে কথা আমরা জানতে পারব।

পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ধারণা শ্যামমোহিনী ছাড়া এম. ই. স্কুলকে কোনপ্রকারেই হাইস্কুলে উন্নীত করা যাবে না। তাঁর সাহায্য তাঁদের একান্ত প্রয়োজন। শ্যামমোহিনীর ভ্রাতা রাজেন্দ্রকুমার এই সময় ঐ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন। কর্তৃপক্ষ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে গিয়ে ধরলেন, আপনার দিদিকে ফিরিয়ে আনুন, এই স্কুলের মাধ্যমেই তো তিনি ট্রেনিং পড়তে গেছেন। আমাদের দাবী অগ্রগণ্য। কর্তৃপক্ষের আন্তরিক আহ্বানে শ্যামমোহিনী পাবনায় পুনরায় ফিরে এলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যমে উক্ত বালিকা বিদ্যালয়টি হাই স্কুলে পরিণত হল।

পাবনায় ফিরে এসেই শ্যামমোহিনী ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করলেন এবং ঐ বিদ্যালয়টিকে হাইস্কুলে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকলেন। সকালবেলা সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাশ খোলা হল। এম. ই. স্কুলটি যথারীতি দুপুরে চলল।

হাই স্কুল খোলা হল কিন্তু পড়াবেন কারা—শিক্ষক কোথায়? অর্থের অনটন। টাকা দিয়ে শিক্ষক সংগ্রহ করার সঙ্গতি কম। অথচ ক্লাশ যখন খোলা হয়েছে তাকে চালাতেই হবে।

শ্যামমোহিনীর কাজ হল এখন চাঁদা আদায় করা, শিক্ষকদের মাহিনা সংগ্রহ ও মেয়েদের আনার জন্য গাড়ী ঠিক করা। ইতিমধ্যে তিনজন শিক্ষকও ঠিক করলেন। এঁরা হলেন পাবনা ইনষ্টিটিউশানের প্রিন্সিপ্যাল গোপাল চন্দ্র লাহিড়ী, জেলা স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল অধর বাবু, পাবনা ইনষ্টিটিউশনের হেড পণ্ডিত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। এঁরা উঁচু ক্লাশের মেয়েদের সকালে বিনা বেতনে পড়াতেন। এঁদের মধ্যে হেড-পণ্ডিত মশায়কে মাসিক পঁচিশ টাকা মাহিনা দিতে হত। এই টাকাটা ও মেয়েদের বাড়ী থেকে আনার জন্যে গাড়ীভাড়া বাবদ মাসিক ব্যয়ের জন্যে শ্যামমোহিনী বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাঁদা তুলতেন। চাঁদা সাধারণতঃ মহিলাগণের নিকট থেকেই তুলতেন। একাজে তাঁকে সাহায্য করতেন পাবনার বিখ্যাত মোক্তার সমরেশ ভৌমিকের সহধর্মিণী তপস্বিনী দেবী। তিনি শ্যামমোহিনীর সঙ্গে গিয়ে মহিলাদিগের কাছ থেকে উক্ত চাঁদা তুলতে সাহায্য করতেন।

মহিলা সমিতি পুনর্গঠন

স্কুলে শিক্ষকতা ও তৎসহ স্কুলের জন্যে চাঁদা তোলার ফাঁকে ফাঁকে শ্যামমোহিনী মহিলা সমিতির পুনর্গঠন করলেন। মহিলা সমিতির পুনর্গঠন করে ঐ সমিতির পরিচালনার জন্যে চাঁদা তোলা, মিটিং করা, বাড়ী বাড়ী গিয়ে মহিলাদের একত্র করার ব্যবস্থা করা এসব কাজও পুরাদমে চলল শ্যামমোহিনীর। তাঁকে ফিরে পেয়ে পাবনার স্কুল কর্তৃপক্ষের ন্যায় পাবনার মহিলামহলও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। শ্যামমোহিনীর পুনরাগমনে পাবনায় দারুণ সাড়া পড়ে গেল।

তিনি মহিলা সমিতির মেয়েদের সেলাই শিক্ষা দেওয়া, হাতের নানা কাজ শেখানো, তাদের দিয়ে খদ্দর প্রচার করা, বিশেষতঃ চরকায়

সুতো কাটার কাজ নিয়মিত চালাতে লাগলেন। এ ছাড়া শ্যামমোহিনী ফিরে এসে মহিলা সমিতি পুনর্গঠন করেছেন শুনে স্বদেশী খদ্দরের দোকান থেকে মহিলা সমিতিকে খদ্দরের কাপড়চোপড়.প্রভৃতি দিয়ে যেতেন বাড়ী বাড়ী বিক্রি করার জন্যে। এক সঙ্গে এত কাজের মধ্যে অবসর বলে কিছু অবশিষ্ট ছিল না তাঁর, তবু তিনি কর্মবিমুখ হননি কখনও, বরং কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালবাসতেন। তৎকালে শ্যামমোহিনীর সংগঠনদক্ষতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা এককথায় অনন্যসাধারণ বললে অত্যুক্তি হয় না।

শ্যামমোহিনী পাবনায় প্রত্যাগমন করে ১৯২৬ সালে যে হাইস্কুল আরম্ভ করলেন সেই পাবনা বালিকাবিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে ছয়টি ছাত্রীকে দিয়ে প্রথমে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ালেন তিনি এবং ঐ ছয়জন ছাত্রীই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়। এতে গোটা পাবনা সহরে তাঁর কৃতিত্বের কথা ছড়িয়ে পড়ে। এই কাজে তিনি যে ত্যাগ স্বীকার, কষ্টসহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন তা পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

অবশিষ্ট কাজ হল স্কুলটির নাম সরকারী খাতায় লেখাতে হবে অর্থাৎ এফিলিয়েশন দরকার। জলপাইগুড়ি থেকে শিক্ষা কমিশনার এলেন। স্কুলটি পরিদর্শন করে তিনি প্রীত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এফিলিয়েশন মঞ্জুর করলেন। স্কুলটি হাইস্কুল হিসাবে সরকারী খাতায় তালিকাভুক্ত হল। এ সব-কিছুই শ্যামমোহিনীর কৃতিত্ব। শ্যাম-মোহিনীর ভ্রাতা তখন ঐ স্কুলের সেক্রেটারী। ভ্রাতাভগিনীর মিলিত অসামান্য প্রচেষ্টার ফলে পাবনা বালিকা বিদ্যালয়টির নানাদিক থেকে উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু এত কাজ করা সত্বেও শ্যামমোহিনীর মন ভরে না। নারীর ক্রীতদাস-জীবন-যন্ত্রণার মত দেশের পরাধীনতার যন্ত্রণায় তাঁর হৃদয় এখন সমানভাবে দগ্ধ হতে থাকে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগাদানের আহ্বান তাঁর মনের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে তোলপাড় তোলে।

দ্বাদশ অধ্যায়

অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান

দেশপ্রেমিকা শ্যামমোহিনী এখন সর্বপ্রকার বাধাবন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করবেন বলে মনস্থ করলেন। ১৯২৯ সালে তিনি স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে যোগদান করেই মহিলা সমিতির মাধ্যমে চরকায় সূতো কাটা, খদ্দর প্রচার, বিলাতী দ্রব্য বর্জন, পিকেটিং করা প্রভৃতি আরম্ভ করেন। গান্ধীজী প্রবর্তিত এই আন্দোলনে (১৯২০) সমগ্র দেশে একটা যুগান্তরকারী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শ্যামমোহিনী ১৯২০ সালে পাবনায় যে মহিলা সমিতি গঠন করেছিলেন, তারা চরকায় সূতো কেটে সেই সূতো দিয়ে কাপড় তৈরী করতেন। ঐ কাপড় মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করা হত। উদ্দেশ্য—বিলাতী দ্রব্য বর্জন করে দেশী চরকায় কাটা সূতো দিয়ে খদ্দরের কাপড় চালু করা। ১৯২৭ সালে গান্ধীজী পাবনা এলে পাবনা মহিলা সমিতি গান্ধীজীকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং তাদের নিজেদের চরকায় কাটা সূতো দিয়ে প্রত্যেকের নাম লিখে লিখে গান্ধীজীকে উপহার দেন। গান্ধীজী এতে অত্যন্ত খুশী হন। গান্ধীজী তাঁর ভাষণে মেয়েদের অনেক উপদেশ দিলেন এবং বললেন, "মেয়েরা তোমরা সব সীতা দেবীর মত হবে।" গান্ধীজী বারবার চারজন আদর্শ মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন—এঁরা হলেন—সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী ও দময়ন্তী। এঁদের দৃষ্টান্ত তিনি বহুস্থানে নারীদের দিয়েছেন। পাবনার মহিলা সমিতি মহিলাদের নিকটও এঁদের আদর্শের কথা তুলে ধরেন। নারী শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল বিপদ-মুক্ত হবেন এই ছিল গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস। যে কোন কাজ সে সমাজ বা পরিবারের উন্নতি হোক বা স্বদেশবাসীর উন্নতির কাজ হোক—কখনও সুফল আনয়ন করতে পারে না যদি ব্যক্তি-চরিত্র বিশুদ্ধ বা নির্মল না হয়। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যে কোন উপায়

অবলম্বন করা যেতে পারে গান্ধীজী ছিলেন এর ঘোরতর বিরোধী। বলাবাহুল্য গান্ধীজীর উপদেশে শ্যামমোহিনীর নেতৃত্বে পাবনায় মহিলা সমিতি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেন। অসহযোগ আন্দোলনের সাহায্যার্থে বিলাতী দ্রব্য বিশেষ করে বিলাতী বস্ত্র বর্জনে মহিলারা বিপুলভাবে সহায়তা করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে কবে থেকে মেয়েরা রাষ্ট্রবিপ্লবে কিভাবে এগিয়ে এলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে নারীর অবদান পুরুষের চাইতে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু একাজে এগিয়ে আসার পূর্বে কতকগুলি সামাজিক অনুশাসনের কবলে পড়ে মেয়েদের জীবনে সে-যে কি ভয়ঙ্কর অন্ধকারের যুগ গেছে তা পূর্বের অধ্যায়গুলিতে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেসব কথার পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজন মনে করি। আর এদেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্মও তো বেশীদিনের কথা নয়।

১৮৮৫ সালে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। ১৮৮৯ সালে মহিলারা জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করার সুযোগ লাভ করেন। বোম্বায়ে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে যে দুজন মহিলা সর্বপ্রথমে এই অধিবেশনে যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী ও অন্যজন ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুর পরিবার ছিলেন তৎকালীন সমাজে নারীপুরুষের সম-অধিকারের পক্ষপাতী। মার্জিত-রুচিসম্পন্ন পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত এই পরিবার তাঁদের পুত্রকন্যাদের এই ভাবধারায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে স্বর্ণকুমারীর নাম তখন চতুর্দিকে প্রচারিত। স্বর্ণকুমারী বাঙালী জাতিকে দেশপ্রেম, স্বাদেশিকতা ও আত্ম-নির্ভরতার মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রেরণা জোগাতেন ভারতী পত্রিকার মাধ্যমে। একদিকে যেমন ওজস্বিনী লেখনীর মাধ্যমে সে ভাবধারা

বজায় রাখতেন অন্যদিকে তেমনি নারী জাতির মধ্যে স্বাদেশিকতা বোধ জাগাবার জন্য ১৮৯৬ সালে 'সখী সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। অভিজাত ঘরের মহিলাদের নিয়ে বোধ করি এটাই মহিলাদের প্রথম প্রতিষ্ঠান। স্বদেশবাসীর মধ্যে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিলেতী দ্রব্য বর্জন প্রচার তাঁর এই উল্লেখযোগ্য অবদান সে যুগে কম কথা নয়। একাধারে সার্থক সাহিত্যিক-কবি—সাংবাদিকতায় সফল, রাষ্ট্রবিপ্লবী, সু-মাতা, সু-গায়িকা, সাংগঠনিক এমন সার্থক সমন্বয় বিরল। 'অসির চেয়ে মসি বড়' কথাটা তিনি 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও স্ব-নির্ভরতার বীজমন্ত্র দান করে প্রমাণ করেন। বস্তুত লেখনীর মাধ্যমেই প্রথম এদেশবাসীর মনে স্বাদেশিকতাবোধের উন্মেষ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সে যুগে কি বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল সেকথা কে না জানে।

শুধু লেখনীর মাধ্যমে দেশের প্রতি তিনি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করলেন না, কংগ্রেসের সঙ্গেও একান্তভাবে জড়িয়ে পড়লেন। স্বর্ণ-কুমারীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল দীর্ঘদিন কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। স্বামীস্ত্রী মিলে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকে দেশসেবায় নিযুক্ত হন। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী অনেক দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন, তার কতিপয় জাতীয় কংগ্রেসে গীত হয়। এ ছাড়া সরলা দেবী হলেন সেই সৌভাগ্যময়ী মহিলা যিনি সর্বপ্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দেমাতরম সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়া স্বদেশী দ্রব্য দেশের লোকদের মধ্যে প্রচলন করার জন্যে তিনি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' স্থাপন করেন, ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনি প্রথম গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে অভিনন্দন জানান।

তদানীন্তনকালে নারীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সুরু হয় বিলাতী দ্রব্য বর্জনের মাধ্যমে। মেয়েরা প্রকাশ্যে রাজনীতি না করলেও এভাবে তাঁরা আন্দোলনে সাহায্য করেন। পাড়ায় পাড়ায় বিলাতী দ্রব্য

বর্জন করেন, মাদকদ্রব্য বর্জনে তাঁরা তৎপর হন। এ ছাড়া তাঁদের কাজ ছিল বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া—অর্থ সংগ্রহ করে সাহায্য করা, চরকা কাটা—স্বদেশী জিনিসপত্রের প্রদর্শনী করেও লোকের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরণের চেষ্টা করা। জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ করার জন্যে—"লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি' ঘরে ঘরে, রাখিবে তণ্ডুল তাহে একমুষ্টি করে"—স্বর্ণকুমারীর প্রথমা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী পত্রিকার মাধ্যমে এই মন্ত্র প্রচার করেন, কবিতা-প্রবন্ধ-সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশাত্মবোধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

নারীজাগরণ আর স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে একটা যোগসূত্র ছিল। এগিয়ে এলেন স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা সিষ্টার নিবেদিতা। শ্রীঅরবিন্দকে তিনি সাহায্য করেন।

অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পর সারা ভারতবর্ষে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে মেয়েরা প্রকাশ্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁরা নানাভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে থাকেন। এভাবে মেয়েরা যদি পুরুষের পাশে এসে বিপ্লবের সহযোগী না হতেন তবে বিপ্লব এত ত্বরান্বিত হত কিনা সন্দেহ। দলে দলে মেয়েরা সংবাদ আদানপ্রদান, অস্ত্র পরিবহন ও বিপ্লবীদের আশ্রয়দান করে তাদের নানাভাবে সাহায্যসহায়তা করেন। বিপ্লবীদের আশ্রয় দান করার অপরাধে ছ'কড়িবালা ঘোষ নামে এক মহিলা সর্বপ্রথম কারাদণ্ড ভোগ করেন। এর পর ১৯১৫ সালে প্রকাশ্যে কংগ্রেসে যোগদান করে বিদুষী কবি সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের মধ্যে যুগান্তরকারী আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। ঐ বৎসরই অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন এবং ভারতীয় মেয়েদের কিভাবে স্বদেশী আন্দোলনে কাজে লাগান যায় সেকথা ভাবতে আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে তিনি সরোজীনী নাইডুর সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করেন।

১৯২০ সালে দেশবন্ধু নাগপুর কংগ্রেসে তাঁর মাসিক ৫০।৬০

হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। দলে দলে মেয়েরা দেশবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একাজে পথপ্রদর্শিকা ছিলেন দেশবন্ধুজায়া বাসন্তী দেবী। বড়বাজারে কাঁধে করে খদ্দর বিক্রয় করতে গিয়ে বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী ও নারী কর্ম মন্দির প্রতিষ্ঠানের কর্মী সুনীতি দেবী পুলিশের হাতে ধরা পড়েন, কারাবরণ করেন। এভাবে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে মেয়েরা দলে দলে যোগদান করে অমানুষিক লাঞ্ছনা ভোগ করেন। দেশের মধ্যে বিপুল বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারে সমগ্র দেশের মানুষ যেন সেদিন নির্মম চাবুক খেয়ে যেভাবে জেগে উঠেছিল তার তুলনা কোন ভাষায় দেওয়া সম্ভব নয়। অভূতপূর্ব সে জাগরণ জাতি কখনও ভুলতে পারবে না। কংগ্রেসের পতাকাতলে মেয়েরা আগেই সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। দেশবন্ধুর ভগ্নী উর্মিলা দেবী নারী কর্ম মন্দির গঠন করেন। এর অন্যতম সদস্য ছিলেন হেমপ্রভা মজুমদার। দেশবন্ধু তখন কারাগারে। ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর তিনি ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল একই সঙ্গে গ্রেপ্তার হন দেশবন্ধুর বাড়ী থেকে। বাসন্তী দেবী বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে ভূষিতা হন। ১৯২২ সালে চট্টগ্রাম কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তিনি তাঁর সভাপতিত্ব করেন। এই সময় সর্বপ্রকার সভাসমিতি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী বলে সরকার ঘোষণা করলে আইন অমান্য করে দলে দলে ছেলেরা কারারুদ্ধ হন। তাদের পরিচালনার ভার হেমপ্রভা মজুমদার গ্রহণ করেন। তাঁর অপূর্ব সংগঠনক্ষমতা ও কার্যপরিচালনা-নৈপুণ্য দেখে সকলে মুগ্ধ হন।

এই সময় কত মেয়েই যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংগ্রামে নেমে পড়েছিলেন, সে ইতিহাস এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বহু বিদুষী নারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন—যেমন, সন্তোষকুমারী গুপ্তা, শ্রমিক নেত্রী ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি

১৯২০ সালে কলকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর অধিনায়িকা ছিলেন। বাংলাদেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের চরম পরাকাষ্ঠা দেখা যায় ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত। দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে উদ্ধার করার জন্যে মেয়েরাও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এই সময়ে। এদিক থেকে লীলা নাগের (রায়) দীপালী সঙ্ঘ, লতিকা ঘোষের রাষ্ট্রীয় মহিলা সঙ্ঘ ও কল্যাণী দাসের (ভট্টাচার্য) ছাত্রীসঙ্ঘের দান অপরিসীম, অসামান্য।

কলকাতায় কল্যাণী ভট্টাচার্যের ছাত্রীসঙ্ঘে বিপ্লবী প্রীতিলতা ওহ্‌দ্দেদার থেকে বিপ্লবী শান্তি, সুনীতি, উজ্জ্বলা মজুমদার, কমলা দাশগুপ্তা প্রভৃতি থাকতেন। স্কুলকলেজে পিকেটিং, অস্ত্র পরিবহন, বিদেশীবস্ত্র ও মাদক দ্রব্য বর্জন—এই সব কাজ মহিলা সঙ্ঘগুলি পরিচালনা করতেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করতে নারী সত্যাগ্রহ সমিতি গঠিত হয়। এর সভানেত্রী উর্মিলা দেবী আর সম্পাদিকা শান্তি দাশ (ইনি হুমায়ুন কবীরকে বিয়ে করেন)। গ্রামে-গ্রামেও নারী সত্যাগ্রাহীরা দলে দলে আইন অমান্য করে কারাবরণ করতে থাকেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পত্নী নেলী সেনগুপ্তা ১৯৩৩ সালে কংগ্রেসের সভানেত্রীত্ব করতে গিয়ে ধরা পড়েন।

এইভাবে নারী জাগরণের সঙ্গে-সঙ্গে নারীদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা দেশের স্বার্থে চরম আত্মত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকেন। আত্মত্যাগ করলেন বিপ্লবী শান্তি ও সুনীতি কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সকে গুলী করে' হত্যা করে'। বিপ্লবী বীণা দাস বাংলার গভর্নর জ্যাকসনকে গুলী করে' হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়লে সমগ্র বঙ্গদেশে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলে আত্মত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হয়ে পড়লেন। সে কি উন্মাদনা! গোটা বঙ্গদেশে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হল। চট্টগ্রামের মাষ্টারদার (সূর্য সেন) শিষ্যা প্রীতিলতা ওহ্‌দ্দেদার নেতৃত্ব দিয়ে ১৯৩২ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর

পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে আর এক বোমসেল ফাটালেন কিন্তু ধরা পড়ার আগেই পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে প্রীতিলতা আত্মাহুতি দিলেন। কল্পনা দত্ত ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করেন। এভাবে রাষ্ট্রবিপ্লবে মেয়েরা চরম ও নরম সর্বরকম সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশের স্বাধীনতা আনয়নে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলার মেয়েরা এভাবে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়ে চরম আত্মত্যাগের দ্বারা দেশের স্বাধীনতাকে এগিয়ে এনেছিলেন। কত মা-বোন যে প্রাণ দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। গরীয়সী জননী মাতঙ্গিনী হাজরা ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে জাতীয় পতাকা হস্তে গুলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে' অমর হলেন।

এভাবে বাংলার নারীসমাজ অগ্রণী হয়ে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তি ত্বরান্বিত করেছিলেন।

বস্তুতপক্ষে প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে ত্যাগে, প্রেমে ও সেবার প্রেরণায় বাংলার আকাশবাতাস মুখরিত ছিল। 'কে করিবে আগে প্রাণদান' এই ছিল দেশের মানুষের একান্ত আকুতি। শিক্ষা বিস্তার যাঁর ধ্যান, জ্ঞান, প্রাণ সেই শ্যামমোহিনীও স্কুলের শিক্ষকতাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে দেশের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 'শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু স্বরাজ্য অপেক্ষা করতে পারে না'—দেশের নেতৃবৃন্দের এই আবেদনে সাড়া দিতে তিনি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করলেন না। কোথায় ভেসে গেল তাঁর সে প্রতিজ্ঞা—অর্থ উপার্জন করে স্বাবলম্বী হবেন, স্ব-নির্ভর হয়ে শুধু শিক্ষা বিস্তারই করবেন। কোথায় রইল তাঁর সে অভিপ্রায়! দেশের স্বাধীনতাই তাঁর নিকট এখন অধিক কাম্য হয়ে দাঁড়াল।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়—

দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়"—

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তরের এই একান্ত আকুতির সঙ্গে শ্যামমোহিনীও একাত্ম হয়ে যান। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন অতন্দ্র সৈনিকের ন্যায় তিনি একাজে একান্তভাবে নিজেকে সঁপে দিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে বিলেতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্যের প্রচার আরম্ভ করলেন পাবনার মহিলা সমিতিকে নেতৃত্ব দিয়ে—সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু তিনি কেবল একাজেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের ভার নিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পাবনা জেলা সদরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে গিয়ে অসাধারণ ক্লেশ সহ্য করে তিনি মেয়েদের নিকট হতে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য গহনা সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর তৎকালীন কর্মতৎপরতা, নেতৃত্ব দেবার সহজাত দক্ষতা ও কর্মকুশতার প্রয়োগকৌশল দেখে সমগ্র পাবনার মহিলাবৃন্দ ছাড়াও যুবকগোষ্ঠি সমভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেভাবে শ্যামমোহিনীর নেতৃত্ব স্বীকার করেন এবং অকাতরে পুলিশের অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে সহর পরিক্রমা করেন সে কথায় পরে আসছি।

১৯২০ সালে ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে দেশের নেতৃবৃন্দ অসহযোগ আন্দোলনে স্কুলকলেজ বয়কট, উকিল, মোক্তার ও জজ ব্যারিষ্টাদের আদালত বয়কট প্রভৃতি ছাড়াও তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ড গঠনের কর্মসূচী নেন। কারণ স্বরাজ্য কথার প্রবক্তা বালগঙ্গাধর তিলক ঐ বৎসরই পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন জাতীয় সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম পুরুষ। সর্বপ্রথম তিনিই 'স্বরাজ্য আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা লাভ করবই' দৃপ্তকণ্ঠে একথা ঘোষণা করেছিলেন। আজ তিনি নেই কিন্তু অসমাপ্ত

কার্যের ভার নিলেন গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ।

জাতীয়তাবাদের এই নেতার স্মৃতিরক্ষার্থে গান্ধীজী নাগপুরের অধিবেশনে ঘোষণা করলেন, তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডে এক কোটি টাকা সংগ্রহ করে দিলে আমি স্বরাজ্য এনে নেব। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উক্ত টাকা সংগ্রহ হয় না, একাজে আরো কিছুদিন সময় পাওয়া গেল। পত্রিকার মাধ্যমে শ্যামমোহিনী এটা জানতে পারলেন। তখন তিনি চিন্তা করলেন, আমরা মহিলা সমিতিই বা এ থে'ক বাদ যাই কেন। আমরাও এতে অংশ নেব, যতটা সম্ভব চাঁদা তুলে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে জমা দেব। কথার সঙ্গে কাজের কোন ফারাক নেই। একাজে হাত দিয়েই তৎপর শ্যামমোহিনী নিজেই তাঁর পাঁচভরির একগাছি সোনার হার তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডে জমা দিলেন। তারপর পাবনার মহিলা সমিতির অন্যতম সম্পাদিকা শীতলাই-এর জমিদার যোগেন্দ্র নাথ মৈত্রের স্ত্রী সরলা দেবীর নিকটে গেলেন। তিনিও একজন স্বদেশপ্রাণা মহিলা ছিলেন। শ্যামমোহিনীর এ অভিপ্রায় শোনামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের গলার মোটা হারগাছি খুলে তা সানন্দে শ্যামমোহিনীর হাতে তুলে দিলেন তখনকার দিনে যার দাম ছিল অন্যূন ১২০০ টাকা। নিজে তো দিলেনই, অতঃপর তিনি শ্যামমোহিনীকে পরামর্শ দিলেন, টাকার চাইতে আপনি বরং গহনা তুলুন, তাহলে বেশী টাকা তুলতে পারবেন। সরলা দেবীর পরামর্শমত কাজ করে যথার্থ সফল হলেন শ্যামমোহিনী। দলে দলে মহিলারা মহিলা সমিতির সেক্রেটারীদ্বয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাদের নিজেদের গায়ের গহনা এক এক করে খুলে শ্যামমোহিনীর হাতে তুলে দিতে লাগলেন। এতে শ্যামমোহিনী নিজেও কম অবাক হলেন না। এত অল্প সময়ের মধ্যে তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহে মেয়েদের নিকট হতে এমন অভূতপূর্ব সাড়া পাবেন এ তিনিও প্রথমে ভাবতে পারেননি। এখন সর্বত্র মেয়েদের নিকট

হতে এভাবে বিপুল সহযোগিতা পেয়ে তিনি একাজে অধিকতর উৎসাহী হলেন।

গান্ধীজী যে সময় দিয়েছিলেন তার আর মাত্র সাত দিন বাকী ছিল। এই সাত দিনের মধ্যেই পাবনার কংগ্রেসের নিকট গহনা-টাকা জমা দিয়ে শ্যামমোহিনী বললেন,—'যৎসামান্য কিছু সোনার গহনা আমরা মহিলা সমিতি মিলে তুলেছি, আপনি দয়া করে এগুলি বিক্রী করে টাকাটা তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডে গান্ধীজীর নিকট পাঠিয়ে দেবেন।'

পাবনার তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি আচমকা পাবনা মহিলা সমিতির একাজে অসামান্য সাফল্য দেখে কি পরিমাণ আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন তা ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার। শ্যামমোহিনীর নিকট হতে গহনাগুলি গ্রহণ করে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ ঐ গহনাগুলির দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন, তারপর খুসীতে আত্মহারা হয়ে তাঁর কর্মীদের বললেন, "ছেলেরা তোমরা যেখানে বিশেষ কিছু করলে না, মেয়েরা সেখানে এত টাকা তুলে দিলেন!" গহনাগুলি বিক্রি করে তৎকালীন সস্তা বাজার দরেও বিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল। আর সেই বিশ হাজার টাকা পাবনা মহিলা সমিতির দান বলে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলেন পাবনার তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি। মহিলা সমিতির একাজে সমগ্র পাবনা জেলায় দারুণ সাড়া পড়ে গেল। তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডে বাংলা দেশ থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়ায় ভার ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উপর। এই ফাণ্ডের সংগৃহীত অর্থের তহবিলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। পরে নির্মল চন্দ্র এই পদে নিযুক্ত হন।

লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে শ্যামমোহিনী

অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী তাঁর বিখ্যাত ডাণ্ডী অভিযান, লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। ১৯৩০ সাল, ১২ই মার্চ

গান্ধীজী তাঁর সবরমতী আশ্রমের ৭৯ জন অনুগামী নিয়ে সমুদ্র-উপকূলে গিয়ে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি ও জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ একে একে এই আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করতে থাকেন। এঁদের স্থান নিলেন মেয়েরা। গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ধৃত হলে মেয়েদের মধ্যে যিনি সর্বাগ্রে এ কাজে এগিয়ে এলেন তিনি সর্বজনবরেণ্যা বীরাঙ্গনা বাংলার মেয়ে সরোজিনী নাইডু। সে বিশদ বিবরণ আগেই দিয়েছি।

বস্তুত, গান্ধীজী তাঁর ডাণ্ডী অভিযানের দুদিন পূর্বে অর্থাৎ ১৯৩০ সালে ১০ই মার্চ Young Indiaয় সর্বস্তরের মেয়েদের এই আন্দোলনে যোগদানে আহ্বান জানালেন।

গান্ধীজী দীর্ঘদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন। সেখানে তিনি দেখেছিলেন পুরুষ শ্রমিকেরা সত্যাগ্রহ করে জেল হাজতে গেলে তাদের স্ত্রীকন্যাগণ তাদের স্থলাভিষিক্তা হয়ে কি অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখবরণ করে আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। এই সব শ্রমিক নারীর সাহসিকতা, ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ করার অদ্ভুত শক্তি দেখে গান্ধীজী নারীশক্তির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ করেন। এদের এই শক্তিকে দেশসেবার কাজে লাগাতে হবে এই হল তখন থেকে গান্ধীজীর ঐকান্তিক অভিপ্রায়। নারীশক্তি যে পুরুষের চাইতে কোন অংশে কম নয়, বরং দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকারে তাদের তুলনা নেই এটা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নারীর ভূমিকা দেখে অটুট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান গান্ধীজী। আর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েদের অবদান নিঃসন্দেহে তার প্রমাণ দেয়। এসব ঘটনার সঙ্গে জাতি আগেই পরিচিত আছেন।

১৯২৯ সালে শ্যামমোহিনী স্কুলের কাজে ইস্তফা দিয়ে অসহযোগ

আন্দোলনে যোগদান করে বিলেতী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং, চরকায় সুতো কাটা, বাড়ী বাড়ী গিয়ে খদ্দর বিক্রি করা প্রভৃতি কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। পাবনার মহিলা সমিতিকে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি এক বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন। পর বৎসর তিনি লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পাবনার সর্বস্তরের মহিলা ও পুরুষ ভলান্টিয়ার সহ বিরাট শোভাযাত্রা বের করে সহর পরিক্রমা করেন। আগে আগে শুচি শুভ্র খদ্দরপরিহিতা মেয়ে ভলান্টিয়ারগণ, পিছে পিছে ঐ একই পোষাকে পুরুষ ভলান্টিয়ারগণ সুশৃঙ্খল মিছিল করে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে চলেছেন। বুকে তাদের দুর্জয় সাহস —মুখে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ, সারিবদ্ধভাবে তালে-তালে পা ফেলে চলেছেন। শ্যামমোহিনী তাদের নেত্রী, আগে আগে চলেছেন নির্ভীক তিনি; নির্ভয়ে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন অগণিত ঐ সব মুক্তিযোদ্ধা নারীপুরুষগণ। বিরাট পুলিশ বাহিনীও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। সেদিকে কারও ভ্রুক্ষেপ নেই। মিছিল করে তারা ক্রমাগত এগিয়ে যেতেই থাকে। অকস্মাৎ পুলিশ বাহিনী এগিয়ে এসে সেই সুশৃঙ্খল নিরস্ত্র মিছিলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের বেটনের আঘাতে কয়েকজন ছেলে ভলান্টিয়ার গুরুতররূপে আহত হলেন। আহতদের পাবনা টাউন হলে আনা হল। শ্যামমোহিনী তবু বিচলিত না হয়ে পুরোভাগে থেকে ঐ শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন এবং সহর পরিক্রমা শেষ করে টাউন হলে আসেন, এক বিশাল জনসভায় সভানেত্রী হয়ে পুলিশের এই বর্বর কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে পাবনাবাসীদের উদাত্ত আহ্বান জানান, আন্দোলনের সামিল হতে বলেন। তাঁর এই অসম সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের কথা তৎকালীন পাবনার 'স্বরাজ' পত্রিকা ও 'হিতৈষী' পত্রিকায় সবিস্তারে প্রকাশিত হয় এবং যুগান্তরকারী এক আলোড়ন ঘটে।

আদালত বর্জন আন্দোলনে

কিন্তু লবণ আইন অমান্য আন্দোলনেই শ্যামমোহিনী ক্ষান্ত হলেন না। মহিলা বাহিনী নিয়ে পাবনার উকিল মোক্তারদের গভর্ণমেণ্ট সংশ্রব ত্যাগ করানোর জন্যে পাবনার বার লাইব্রেরীর সম্মুখে তিনি পিকেটিং আরম্ভ করলেন। পিকেটিং সুরু করে উপর্যুপরি সাতদিন তাঁদের আদালত বর্জন করতে বাধ্য করেন। নিরুপায় হয়ে এইসব উকিল-মোক্তারগণ এসে শ্যামমোহিনীকে অনুরোধ জানাতে থাকেন, "দেখুন, আপনারা যে আমাদের আদালত বর্জন করালেন, তাতে আমরা একেবারে বসে গেছি। কিন্তু সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে আর কয়জন উকিল, মোক্তার, আইনজীবীরা আদালত বর্জন করেছেন? কাজেই আমাদের কয়েকজন আদালত বর্জন করলে কি কাজ হবে? বর্জন করলে আমাদের রুজিরোজগার বন্ধ হবে—আমাদের পরিবার পরিজন না খেয়ে মরবে; তাতে কোন স্থায়ী ফল হবে না। কাজেই আপনি অনুমতি দিন—আমরা আদালতে যাই—উপার্জন করে পরিবার প্রতিপালন করি।"

শ্যামমোহিনীর ভাই রাজেন্দ্রকুমার চৌধুরীও তখন পাবনার আদালতে ওকালতি করতেন। দিদির আন্দোলনের ফলে তিনিও আদালত বর্জন করে বাড়ীতে বসে আছেন। কিন্তু তার জন্যে তাঁর মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনই রাজেন্দ্রকুমারের কাছে বড় বলে মনে হতে থাকে।

উকিল-মোক্তারেরা গিয়ে তাঁকেও ধরলেন, 'ভাই রাজেন, তোমার দিদিকে এই আন্দোলন করা থেকে ফেরাও, নতুবা আমরা যে না খেয়ে মরছি—তোমারও তো রুজিরোজগার বন্ধ হল', বলে তাঁরা তাঁদের মনের ক্ষোভ তাঁর কাছে প্রকাশ করতে থাকেন।

উত্তরে কিন্তু দিদির বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি রাজেন্দ্রকুমার। বরং নীরব থেকে দিদির কাজ সমর্থনই করলেন। বয়সে সামান্য বড় হলেও দিদিকে তিনি মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন, বলতেন, 'ছোটবেলায়

মা-বাবা মারা যায়—দিদিই আমাদের প্রতি পিতামাতা উভয়ের কর্তব্য করেছেন। কোন দিন দিদির কোন কাজে বাধা দেইনি। এখনও দেব না।' তবু রাজেন্দ্রকুমারকে ভাবিয়ে তুলল।

তিনি এটা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, দিদি যা আরম্ভ করেছেন তাতে তাঁকে নির্ঘাৎ কারাগারে যেতে হবে। সেইমত কানাঘুসাও চলছিল। চারিদিকে পুলিশী তৎপরতা, পাবনা মহিলা সমিতির বিশেষ করে শ্যামমোহিনীর উপর পুলিশের তীব্র নজর প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। যে কোন সময়ে গ্রেপ্তার হতে পারেন তিনি, কিন্তু শ্যামমোহিনীর সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। পুলিশ গ্রেপ্তার করবে, করুক না, তা বলে ভারত-মাতার মুক্তি আন্দোলন থেকে কি করে বিরত থাকা যায়। সে সম্ভব নয়। এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিলকের সেই 'স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার, আমি তা লাভ করবই' কথাটা বার বার তাঁর মনে হতে থাকে। তিনি নানাভাবে আন্দোলন চালিয়েই যেতে থাকেন। এভাবে স্বদেশপ্রেমে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি অসহযোগ, লবণ আইন অমান্য প্রভৃতি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নেতৃত্ব দেন। আজকের কথা বলছি না কিন্তু সে যুগে মেয়েদের সব ছেড়ে-ছুঁড়ে সম্মুখে এগিয়ে এসে একাজ করায় কতখানি বুকের পাটার দরকার, কি পরিমাণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হলে তা করা সম্ভব সে সব কথা বিশেষ করে বলার প্রয়োজন নেই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নবদ্বীপ বিদ্যালয় সংগঠনে

শ্যামমোহিনী হয়তো দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেই নিঃশেষে আত্মবলিদান করবেন, তাঁর তৎকালীন কার্যকলাপে প্রত্যেকেই এটা ধরে নিয়েছিলেন। পাবনার মহিলা সমিতি থেকে পাবনার জনগণ তাঁর নেতৃত্বের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। নিঃসন্দেহে তিনি নিজেও সেইভাবে মনেপ্রাণে প্রস্তুত হয়েই একাজে নেমেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে যে কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তাঁকে তা করতেই হবে। শিক্ষাবিস্তারই যাঁর প্রাণস্বরূপ তাঁকে সে কাজেই আত্মোৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একাজে তিনি যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন তা পাবনার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে রইল। শ্যামমোহিনী যখনই যেকাজে যোগদান করেছেন সেখানে আগাগোড়াই তাঁর অদ্ভুত সংগঠনশক্তি ও নেতৃত্ব দেবার অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। সে স্বাধীনতা একদিন পাওয়া যাবেই। কিন্তু সে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শিক্ষাবিস্তার করে মানুষ তৈরি করতে হবে। ঈশ্বর যেন শ্যামমোহিনীর আজন্মপোষিত এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তাঁকে আবার শিক্ষাবিস্তারের কাজেই ফিরিয়ে নিলেন। না হলে অকস্মাৎ এই সময়েই নবদ্বীপে তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী পদের জন্য ওখানকার কর্তৃপক্ষ শ্যামমোহিনীকে আকুল আহ্বান জানাবেন কেন? এই সময় ঐ স্কুলের চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থা। এফিলিয়েশন কাটা যাবার উপক্রম। এফিলিয়েশন না থাকা মানে স্কুল তুলে দিতে হবে—সরকারী কোন রকম সাহায্য পাওয়া যাবে না। তদুপরি পড়ুয়া মেয়েও পাওয়া যাবে না। গত্যন্তর না দেখে তাঁরা শ্যামমোহিনীর দ্বারস্থ হলেন।

শ্যামমোহিনীর গঠনমূলক কার্যের প্রশংসা ঐ স্কুলের কর্তৃপক্ষ আগেই শুনেছিলেন। আশান্বিত হয়ে তাঁরা তাই শ্যামমোহিনীকে ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের ভার নেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন।

শ্যামমোহিনীর ভাই রাজেন্দ্রকুমার যদিও দিদি তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করলে পাবনা ছেড়ে চলে যাবেন —একথা ভেবে মনে মনে দুঃখ অনুভব করলেন কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে দেখলেন তিনি "দিদি এখানে থাকলে নির্ঘাৎ স্বদেশী আন্দোলনে থাকার জন্য জেলে যাবেন, তার চাইতে ওখানে গিয়ে স্কুলের গঠনমূলক কার্যের ভার নিলে এটা এড়াতে পারবেন।" এছাড়া 'তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়-এর একজন কার্যকরী সমিতির সদস্য বারবার এসে শ্যামমোহিনীকে অনুনয়বিনয় করে বলতে থাকেন, "আপনি কি শুধু পাবনাতেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করবেন? সর্বত্রই তো আপনার দেশ, আপনি এসে আমাদের এই ধ্বংসোন্মুখ বালিকা বিদ্যালয়কে রক্ষা করুন। আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে স্কুলটিকে কোনমতে রক্ষা করা যাবে না।" তাদের সে আকুল আহ্বান তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না।

১৯৩০ সালে মে মাসে শ্যামমোহিনী ঐ বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করলেন এবং ভার গ্রহণ করে অচিরাৎ তিনি ঐ পতনোন্মুখ বালিকা বিদ্যালয়কে পুনর্জীবিত করে তাঁর অদ্ভুত সংগঠনীশক্তির পরিচয় দিলেন।

তিনি যখন এই তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের ভার নিলেন তার ১৫।২০ দিন বাদেই স্কুল পরিদর্শনে পরিদর্শিকা আসবেন। এর মধ্যেই ঐ স্কুলের যাবতীয় নথিপত্র ঠিক করতে হবে এবং ছাত্রীদের পরিদর্শিকার সামনে উপযুক্তভাবে উপস্থিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়া এই স্কুলের ধারাবাহিক কোন রেকর্ড নেই, শিক্ষয়িত্রীগণ পড়ানোর কোন পদ্ধতিই জানেন না। হাতে মাত্র কয়েকটি দিন

বাকী। কি করা যায়—কি করবেন তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে। কিন্তু কি করা যায়—যতটুকু চিন্তা করার সময়—এই সময়ের মধ্যে শ্যামমোহিনী ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেললেন। নিম্ন প্রথায় তিনি স্কুলকে নতুন সাজে সাজালেন। পুরাতন ভোল পাল্টিয়ে নতুন পদ্ধতি নতুন কায়দায় সাজালেন স্কুলটিকে।

১। বড় বড় কাগজে মেয়েদের দিয়ে আঁকিয়ে ড্রয়িং, ম্যাপ ড্রয়িং প্রভৃতির দ্বারা প্রতিটি ঘর ভরে ফেললেন।

২। যাবতীয় হিসাব-নিকাশের খাতাপত্র ঠিক করে ফেললেন—নির্ভুল সব জমা-খরচের হিসাব তৈরী করলেন। এ কাজে এই পনর-বিশ দিন তাঁর প্রায় আহারনিদ্রা ছিল না বলা চলে।

৩। ক্লাশ অনুযায়ী হাতের কাজ করালেন। সেগুলি আলমারীতে সাজিয়ে রাখলেন।

৪। মেয়েদেরও তিনি তাঁর বাসায় এনে রাতদিন পড়িয়ে তাদের উপযুক্ত করে তুললেন যাতে পরিদর্শিকার সামনে তারা কোন ভুল না করে। শিক্ষা শুধু স্কুলেই সীমাবদ্ধ রইল না—তাঁর বাসায় গিয়ে ছাত্রীরা নিয়মিত পড়ে আসতে থাকে।

৫। মেয়েদের স্কুলে ও তাঁর বাড়ীতে পড়িয়েই তিনি ক্ষান্ত হন না। সেই সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদিগকেও কিভাবে পড়াতে হয়—কিভাবে স্কুলকে আদর্শ স্কুলে পরিণত করা যায়—তাদিগকে সে শিক্ষাও দিতে থাকেন তিনি।

শ্যামমোহিনীর সুচারু, সুনিপুণ দক্ষ পরিচালনায় তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়টির যেন নবজীবন লাভ হল। ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেল। শিক্ষয়িত্রী থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকেই যেন এখন ভিন্ন মানুষ। সব জড়তা কাটিয়ে তাঁরা যেন শ্যামমোহিনীর সান্নিধ্যে অজেয় শক্তির অধিকারী হলেন।

দুর্দশাগ্রস্ত তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের নতুন এই প্রাণচাঞ্চল্যে কর্তৃপক্ষ থেকে স্থানীয় লোক প্রত্যেকেই শ্যামমোহিনীর ভূয়সী

প্রশংসা করতে থাকেন এবং তাঁর অপূর্ব সংগঠনশক্তির কাছে মাথা নত করেন।

পরিদর্শিকার বিস্ময়

নির্দিষ্ট দিনে পরিদাশকা এলেন। তিনি প্রথমে স্কুলের চেহারা দেখে তারপর মেয়েদের পরীক্ষা করে রীতিমত অবাক হলেন। তিনি শ্যামমোহিনীকে বললেন, কয়েক মাস আগে এসে দেখলাম যে, স্কুলে কিছু নেই; আপনি এত শিগ্‌গির কি করে সেই স্কুলকে এত ভাল করলেন! আপনি কি ইন্দ্রজাল জানেন! পরিদর্শিকার এ কথার উত্তর দিলেন স্কুলের সেক্রেটারী যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী। ইনি ছিলেন নবদ্বীপে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের একজন সেবায়েত। যতীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, ওঁকে আমরা এনেছি পাবনা থেকে। উনি খুব ভাল গঠন-মূলক কাজ জানেন। পরিদর্শিকা পরিদর্শন রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসাসূচক মন্তব্য লিখে দিলেন। স্কুলের এফিলিয়েশন রয়ে গেল।

১৯২৯ সালের মে মাস থেকে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত শ্যামমোহিনী ঐ তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। যখন তিনি ঐ স্কুলে যোগদান করেন তখন স্কুলটি ছিল প্রাইমারী। মাত্র দেড় বৎসরের ব্যবধানে তিনি স্কুলটিকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করলেন। এত অল্প সময়ে তিনি যে অসামান্য সংগঠনশক্তির পরিচয় দিলেন তাতে অদূর ভবিষ্যতে নিখিল ভারত নারীশিক্ষা পরিষদের মত বিরাট প্রতিষ্ঠান গঠন করে যে তা সুষ্ঠুভাবে চালাবেন এ যেন তারই প্রস্তুতিপর্ব।

পুনরায় বাণীভবনের সুপারিণটেণ্ডেণ্ট

শ্যামমোহিনী নবদ্বীপ তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের গঠনের কাজে একান্তভাবে নিমগ্ন আছেন। তাঁকে দেখে মনেই হয় না যে, তিনি একাজ ছেড়ে আবার কোথাও যাবেন। কিন্তু যেতে তাঁকে

হল। ১৯৩১ সাল। আহ্বান এল নারীশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা স্বয়ং লেডী অবলা বসুর কাছ থেকে। তাঁর সাহায্য তাঁর অপরিহার্য। লেডী অবলা বসুর আহ্বানে শ্যামমোহিনী পুনর্বার কলকাতায় এসে নারীশিক্ষা সমিতির কাজে যোগদান করলেন। পাঠক-পাঠিকাদের হয়তো স্মরণ থাকতে পারে এখানে থেকেই ১৯২৩ সালে তিনি সিনিয়র ট্রেনিং পাশ করেন। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্ম ট্রেনিং বোর্ডিং-এর সুপারিণটেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত থেকে তিনি পুনরায় পাবনায় ফিরে যান। পাবনায় ফিরে শিক্ষাবিস্তার, বিভিন্ন সংগঠমূলক কাজ ও জাতীয় আন্দোলনে ব্যাপৃত থেকেছেন। এসব ব্যাপারের সঙ্গে পাঠকপাঠিকাগণ আগেই পরিচিত হয়েছেন।

একটা জিনিষ আমরা পূর্বাপর লক্ষ্য করেছি, তিনি যে কাজেই ব্যাপৃত থেকেছেন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই তা করেছেন এবং একটা দাগ রেখে চলেছেন। এখন লেডী বসুর আহ্বানে ফিরে এসে তিনি যুগপৎ বিদ্যাসাগর বাণীভবন হোষ্টেলের সুপারিণটেণ্ডেণ্ট ও বাণীভবন এম. ই. স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে কাজ করতে থাকেন।

এই সময় বিদ্যাসাগর বাণীভবন ছিল ৬।১, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে। সমিতির নিজস্ব কোন বাড়ী ছিল না, কিন্তু এই সময় বাড়ী তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়েছে। শ্যামমোহিনী এই সমিতিতে যোগদানের পর বাড়ী তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়। ২৯৪।৩, আপার সার্কুলার রোডে নারীশিক্ষা সমিতির আবাসিক নিজস্ব বাড়ী তৈরী হল। একদিকে সুপারিণটেণ্ডেন্টের পদের ন্যায় গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদ ও স্কুলে পড়ানোর কাজ, অন্যদিকে নারীশিক্ষা সমিতির নানা গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত থাকলেন শ্যামমোহিনী। কিন্তু কোনো কাজে ত্রুটি নেই। প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি সদ্ব্যবহার করে সার্থকতায় ভরে তুললেন।

বাড়ী তৈরী শেষ হওয়ার পর সমিতি তার নিজস্ব বাড়ীতে উঠে এল। নারীশিক্ষা সমিতির উন্নতির মূলে লেডী অবলা বসু ছাড়াও আর একজন দেশহিতৈষী শিক্ষাবিদ মানুষের অবদান সশ্রদ্ধ চিত্তে

স্মরণীয়। অসীম তাঁর মমতা এই নারীশিক্ষা সমিতির উপর। মহান্ এই ব্যক্তিটির প্রাণপাত চেষ্টার ফলেই নারীশিক্ষা সমিতির স্ত্রীশিক্ষা প্রসার ও একাজে তার বিপুল অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। তিনি হলেন কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক। ইনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। নারীশিক্ষা সমিতিতে আসার পূর্বে তিনি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঐ শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা করতেন। বিদ্যোৎসাহী, দেশপ্রেমিক এই মানুটির শিক্ষাদানপ্রণালী অতুলনীয় ছিল। তাঁরই হাতে-গড়া ছাত্রী (পরে পুত্রবধূ) পূর্ণিমা বসাক ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের অন্তর্ভুক্ত ট্রেনিং স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। শ্যামমোহিনীকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

তৎকালে নারীশিক্ষা সমিতির অধীনে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি ছিল—

১। বিদ্যাসাগর বাণীভবন (বিধবা আশ্রম)।

২। মহিলা শিল্পভবন।

৩। বিদ্যাসাগর বাণীভবন (এম. ই. স্কুল)। এখানে আবাসিক ছাত্রী ছাড়া বাইরের ছাত্রীরাও লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করত।

৪। পল্লী শিক্ষা বিভাগ।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল নারীশিক্ষা সমিতির অন্তর্গত পল্লী শিক্ষার বিভাগগুলি। এই সমিতি বিভিন্ন জেলায় চল্লিশটি গ্রামে চল্লিশটি নারীশিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন করে নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই সমুদয় স্কুলে শুধুমাত্র অল্পবয়স্কা ছাত্রীরাই পড়াশোনা করত না— ঘরের বউঝি থেকে বয়স্কা মেয়েরাও পড়াশুনা করতেন। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীদের শিল্পকাজও শিক্ষা দেওয়া হত। এই স্কুলগুলির দু-একটি এখনও বর্তমান আছে। ঢাকা জেলার কয়েকটি গ্রামেও এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নারী সমবায় ভাণ্ডার। ভাণ্ডারটি ছিল কলেজ স্ট্রীটে। মেয়েরাই মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত দোকানে বসে মেয়েদের হাতের তৈরী জিনিস বিক্রি করতেন। এর

উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাবলম্বী করা। এই প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হল ঐ নারী সমবায় ভাণ্ডার।

অধুনা নারীপরিচালিত কিছু কিছু সমবায় বিপণি দেখা যায়। কিন্তু তৎকালে এটি ছিল মেয়েদের একটি দুঃসাহসিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হবার পথপ্রদর্শক। বস্তুতঃ স্কুলকলেজ ছাড়া অন্য কোথাও জীবিকা অর্জনের প্রবেশাধিকার পাবে মেয়েরা এটা ছিল সে যুগে অকল্পনীয় ব্যাপার।

শ্যামমোহিনীর সংগঠন কার্যের সম্বন্ধে লেডী বসু ও কৃষ্ণপ্রসাদ বসাকের উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁরা প্রতি রবিবার শ্যামমোহিনীকে গ্রামের ঐ সব স্কুল পরিদর্শন করতে পাঠাতেন। মহাপ্রাণ কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক ব্যক্তিগতভাবে শ্যামমোহিনীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি শ্যামমোহিনীকে বলতেন, "চালডালের হিসাবের জন্যে আপনার জন্ম হয়নি; পৃথিবীতে অনেক বড় কাজের জন্য আপনার জন্ম হয়েছে।"

লেডী অবলা বসু, কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক ও শ্যামমোহিনী মিলে সে সময় নারীশিক্ষা সমিতির বিভিন্ন প্রকার উন্নতির কথা আলোচনা করতেন। প্রতি রবিবার তিনি ট্রেনে, বাসে ও হেঁটে কত ক্লেশ স্বীকার করেই না পল্লীস্কুলগুলি পরিদর্শন করতে যেতেন। তৎকালে আজ-কালকার মত গ্রামদেশে রাস্তাঘাট উন্নত ছিল না এবং যানবাহনেরও আদৌ সুযোগ-সুবিধা ছিল না। কাজেই একাজে তাঁকে খুব কষ্ট স্বীকার করতে হয়। স্কুলগুলি পরিদর্শন করে ত্রুটি দেখ্‌লে তিনি তা' সংশোধন করার নির্দেশ দিয়ে আসতেন। শিক্ষকশিক্ষিকাদের শিক্ষণপ্রণালী শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই পরিদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

নারী সমবায় ভাণ্ডারের ভার

ঐ সব কাজ ছাড়াও নারী সমবায় ভাণ্ডারের যাবতীয় ভার শ্যামমোহিনীর উপর পড়ে। সমবায় ভাণ্ডারের হিসাব দেখা থেকে কি

ব্যবস্থা অবলম্বন করলে জিনিসপত্রের বিক্রয় বৃদ্ধি পায় এবং একাজে মেয়েরা উৎসাহ পায় এসব ব্যাপারে তাঁর সাহায্য অপরিহার্য ছিল। একাজে তিনি তাদের বুদ্ধিপরামর্শ দিতেন।

১৯৩২ সালে নারীশিক্ষা সমিতির অধীনে প্রথম সর্বভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর সেক্রেটারী ছিলেন শ্যামমোহিনী। এই শিল্প প্রদর্শনীতে কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মহিলাদিগের স্বহস্তনির্মিত শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত দ্রব্যের উৎকর্ষ যাচাই করে পুরস্কার বিতরণও করা হয়। এই প্রদর্শনী-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের ভার তাঁর উপর যেমন নির্ভাবনায় অর্পণ করেছিলেন লেডী বসু, সেকাজ তেমনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন তিনিও।

তৎকালে নারীশিক্ষা সমিতির অধীনে ছয়টি বিভাগ ছিল। এর প্রত্যেকটির তত্ত্বাবধানের ভার শ্যামমোহিনীর উপর অর্পণ করেন লেডী বসু। এ দেখে যাঁরা পৃষ্ঠপোষক ও যাঁরা চাঁদা দিয়ে ঐ সমিতিকে সাহায্য করতেন সেই সদস্যাবৃন্দের অনেকে লেডী বসুকে বলতেন, "আপনি কি ভেবে আপনার এত ডিপার্টমেণ্টের সব ভার শ্যামমোহিনী দেবীকে দিচ্ছেন? ওঁর একার পক্ষে এত ডিপার্টমেণ্ট দেখা কি সম্ভব?"

তৃপ্তির হাসি হেসে লেডী বসু উত্তর দিতেন,—"উনি পারেন, বিভিন্ন দিকে ওঁর কর্মদক্ষতা প্রচুর আছে। নিজের কাজ করে বাকী সময়ে উনি এইগুলি করতে পারেন—তাই ভার দিয়েছি।"

শ্যামমোহিনীর উপর সমস্ত কাজের ভার দিয়ে লেডী বসু এমন নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, রিপোর্ট ও হিসাব দাখিল করলে তিনি দেখতে চাইতেন না, বলতেন, ও ঠিক আছে, শ্যামমোহিনী যখন বলেছেন তখন আর কোন প্রয়োজন নেই ওসব দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট করে'।

এই সময় বিদ্যাসাগর বাণীভবনের (বিধবা আশ্রম) আর একটি শাখা অফিস মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে খোলা হল। এটা ছিল

কেবলমাত্র বিধবা মেয়েদের জন্য আশ্রম। ঝাড়গ্রামের রাজা এই আশ্রম গঠনের জন্য জমিবাড়ী প্রভৃতি দান করেন। এরপর লেডী অবলা বসু ও সমিতির সহকারী সম্পাদক কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক আর একটি পরিকল্পনা করলেন। পরিকল্পনাটি ছিল বিদ্যাসাগর বাণীভবনের যে সব মেয়েরা এবং অন্যান্য মেয়েরা যারা এম. ই. পাশ করে বসে আছেন—ট্রেনিং না নেওয়া পর্যন্ত যাদের চাকরী হচ্ছে না—তাদের জন্য ট্রেনিং স্কুল খুলবেন। পরিকল্পনানুযায়ী 'বাণীভবন শিক্ষিকা শিক্ষণ বিভাগ' এই নামে আর একটি বিভাগও খুললেন তাঁরা। লেডী বসু শ্যামমোহিনীকে বললেন, "আপনি আসার পর আমার অনেক কাজ হয়েছে।"

স্ত্রীর একাজে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর তেমন সম্মতি ছিল না। লেডী বসু রাতদিন একাজে নিমগ্ন থাকেন তিনি পছন্দ করতেন না। তাই লেডী বসু ঘরের যাবতীয় কাজ সেরে স্বামীকে খাইয়ে-দাইয়ে দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে নারীশিক্ষা সমিতির কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। এতে অনেকে ঠাট্টা করে বলতেন, জগদীশ বসুর সতীন এই নারীশিক্ষা সমিতি। স্বামী পছন্দ করতেন না—তাই তিনি স্বামীর সর্বরকম সুখ-সাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে দুপুরের বিশ্রাম বাদ দিয়েই এই সময়ের মধ্যে নারীশিক্ষা সমিতির সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। আর এজন্য একাজে শ্যামমোহিনীর মত অক্লান্ত, নিরলস নিঃস্বার্থ বিচক্ষণ কর্মী পেয়ে লেডী বসু যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন। নামেমাত্র শ্যামমোহিনী বিদ্যাসাগর বাণীভবন বিধবা আশ্রমের সুপারিণটেণ্ডেণ্ট—কিন্তু সর্ব কাজেই তাঁর ডাক পড়ত। নারীশিক্ষা সমিতির এমন দিক ছিল না যেখানে শ্যামমোহিনীর ডাক পড়ত না।

আর শ্যামমোহিনী, শ্যামমোহিনীও কি এইসব কাজের ভার পেয়ে নিজেও কম উপকৃত হয়েছেন। এই নারীশিক্ষা সমিতির সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি স্বীয় জীবনে বিভিন্ন সংগঠন কার্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে হলে তার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যে নিখুঁত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তার অধিকাংশই শ্যামমোহিনী অর্জন করেন লেডী বসুর নারীশিক্ষা সমিতির কার্যে যোগদান করে', এখানকার সমস্ত বিভাগগুলির দেখাশুনার ভার পেয়ে। শ্যামমোহিনীর মুখ থেকেই সে কথা আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। লেডী বসুর জন্মশতবার্ষিকী (১৯৬৫) পালন উপলক্ষে 'শ্রদ্ধেয়া লেডী অবলা বসুর স্মরণে' শীর্ষক শ্যামমোহিনীর শ্রদ্ধাঞ্জলিটি ইতিমধ্যে আমরা পাঠকপাঠিকাদের সামনে তুলে ধরেছি। মহৎ যিনি, তিনি যে মহতের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে কিভাবে আরো মহত্তর হতে পারেন, শ্যামমোহিনীর এ আচরণের মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই। আজ পর্যন্ত তিনি যার নিকট হতে যতটুকু সাহায্য সহায়তা পেয়েছেন, তার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞার অন্ত নেই, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠা নেই, বরং সোচ্চার হয়েই তিনি তা প্রকাশ করে থাকেন। যেন তারাই সব, তিনি উপলক্ষ্য মাত্র।

কিছুদিন হল আমি তাঁর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছি, বটবৃক্ষ-সম এই মহীয়সীর অপার মাতৃহৃদয়ের স্নেহচ্ছায়ায় বসে তাঁর স্মৃতিচারণ শুনেছি, আর শুনে আমি অবাক হয়েছি, সামান্য কর্মী-মানুষের প্রতি তাঁর কি অসীম কৃতজ্ঞতাবোধ—নিজের চাইতে তিনি এই সব মানুষকে, তাদের কাজকে তাঁর বিপুল কর্মের সাফল্যের উপাদান বলে মনে করেন। নৌকার মাঝি শ্রীহরির প্রতি তিনি যে কী অসীম কৃতজ্ঞতা পোষণ করেন সে কথা অচিরেই আমরা জানতে পারব। শ্রীহরি মাঝি সেদিন তাঁর কাছে যেন স্বয়ং শ্রীহরি রূপেই দেখা দিয়েছিল।

এই সব মানুষের প্রতি তাঁর কত মমত্ববোধ, সদ্য সংঘটিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলে তা পরিষ্কার বুঝা যাবে। তাঁর অনেক গ্রুপ ফটোর মধ্যে কয়েকটি এই বইতে ছাপা হচ্ছে। যাঁরা বেছে দিচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কোন একটা ফটো ধরে বললেন,

না, ফটোতে এ কোথাকার কে সব এসে দাঁড়িয়ে গেছে, পরিষদের এরা কেউ নয়—এদের বাদ দিলে হয় না ?

স্বল্পবাক শ্যামমোহিনী বললেন, তাতে কি হয়েছে, থাক না। এসেই যখন পড়েছে, ওরা থাক। এর মধ্যে আর একজনের বাদ দেওয়ার কথা শুনে বললেন, একে বাদ দিবি কিরে, সেবার আমার অমুক কাজে খুব উপকার করেছিল, থাক ও। বরং আমারটা বাদ দে। কিন্তু এতে যে মাথা ভারী হয়ে যায় সেদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। এমনি সবাইকে নিয়ে তাঁর ভুবনভরা সংসার তিনি গড়ে তুলছেন

সংসারের আর পাঁচজনে যাদের ত্যাগ করে, অপ্রয়োজনীয় অপাংক্তেয় বলে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় তিনি তাদের ধুলো ঝেড়ে কোলে তুলে নিয়েই আজীবন তাঁর দেবদেউলের পূজার আয়োজন করেছেন—তাঁর পরিষদে স্থান দিয়ে প্রকৃত মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন, এদের বাদ দেওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না তিনি।

"জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"—

স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীর মিল খুঁজে পাওয়া যাবে শ্যামমোহিনার প্রতিটি আচরণের মধ্যে। "বহু মানুষকে মিলাইয়া এক একটি প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া তোলা বিশেষ একপ্রকার প্রতিভার কাজ।" নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের একথার যথার্থতার প্রমাণ আমরা শ্যামমোহিনীর মধ্যে দেখতে পাই। বিভিন্ন মানুষের সমন্বয়ে নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের মত একটি বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্যে তাঁর যে মনস্বিতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁকে অবশ্যই একজন প্রতিভাশালিনী মহিলা বলতেই হয়।

শ্যামমোহিনী বিদ্যাসাগর বাণীভবনের সুপারিণটেণ্ডেণ্ট পদে থাকাকালে একটা জিনিস খুব ভালভাবে লক্ষ্য করেছিলেন, তা হলো —আবাসিক মেয়েদের ভর্ত্তির আগ্রহ যত বেড়ে চলেছিল, সে

তুলনায় সিটসংখ্যা নগণ্য, মাত্র ৬০টি। ৬০ জনের বেশী একজনকেও নেওয়া চলে না। তা-ও শুধু বিধবাদের।

অথচ মেয়েরা স্বেচ্ছায় পড়তে চায়, দেশের দূরদূরান্ত থেকে আসত, তাদের সিট নেই বলে ফিরিয়ে দিতে সুপারিণটেণ্ডেন্ট হিসাবে শ্যামমোহিনীর বুকে শেলসম বাজত। তাঁর কাছে অত্যন্ত অসহনীয় মনে হত। দিনের পর দিন এভাবে বিশেষতঃ অসহায়া বিধবাদের মুখ চেয়ে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠে। কেবলমাত্র ৬০টি মেয়েকে শিক্ষা দিয়ে কি হবে—বিধবা ছাড়াও দলে দলে সর্বস্তরের মেয়েদের শিক্ষা দেবার ব্রত নিয়েছেন যিনি এখন এই সময় তার ব্যবস্থা কিছু একটা তাঁকে করতেই হবে।

কিন্তু কি করবেন তিনি, মাথার উপরে লেডী বসু। শ্যামমোহিনী লেডী বসুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। লেডী বসু নিরুপায়, তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন, এই মুহূর্তে সিটসংখ্যা যাটের বেশী বাড়ানোর আর কোনো উপায় নেই। অগত্যা সে আশা শ্যামমোহিনীকে পরিত্যাগ করতে হল।

সর্বস্তরের মেয়েদের জন্য

আগেই বলেছি বিদ্যাসাগর বাণীভবন হোষ্টেলটি ছিল কেবলমাত্র বিধবা মেয়েদের আবাসিক হোষ্টেল। কিন্তু বিধবা ছাড়াও গরীব ঘরের দুঃস্থা বয়স্কা কুমারীগণ, সধবা ইত্যাদি বহু মেয়ে যাদের হামেশাই সমাজে নানাভাবে উৎপীড়িত হতে হয় তাদেরও বর্তমানে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ দেখে শ্যামমোহিনীও আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি শপথ নিলেন, যেমন করেই হোক এদের জন্য কিছু একটা করবেনই তিনি।

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"—

রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বান তাঁর মনে প্রবল নাড়া দেয়। কিন্তু
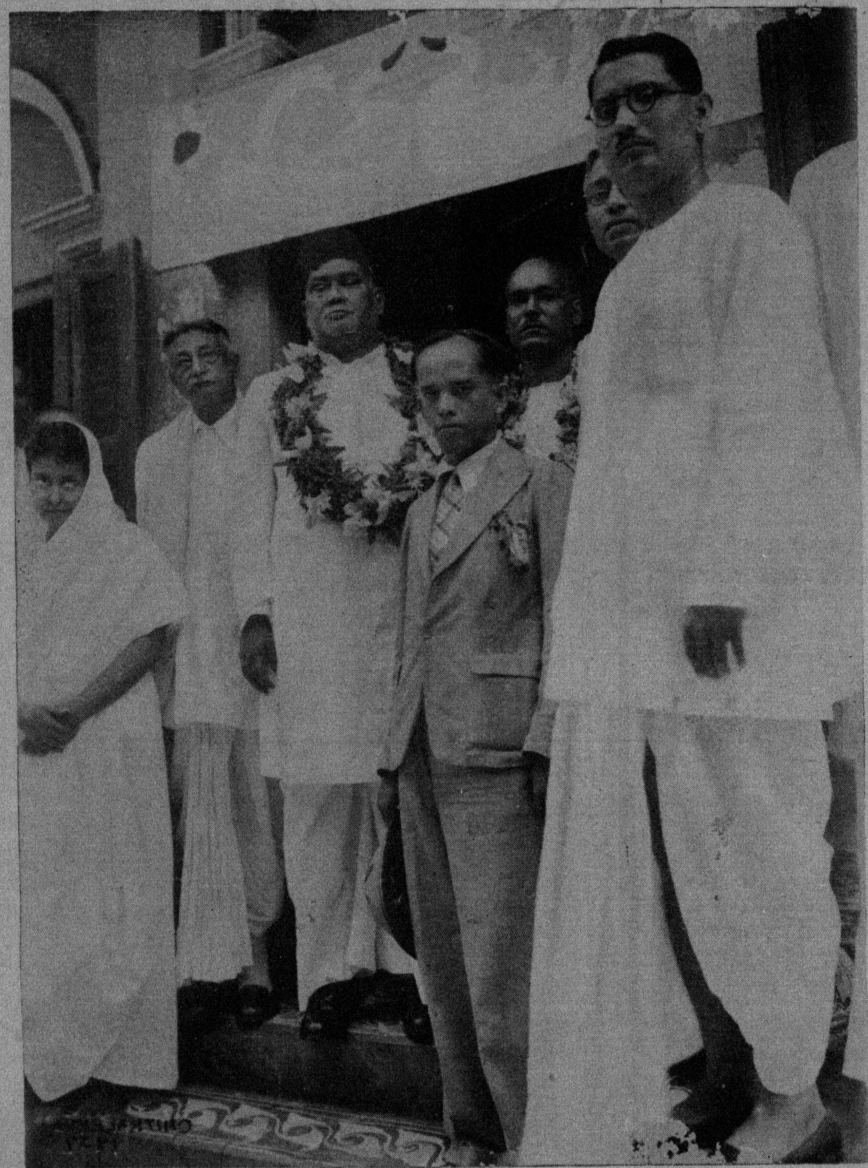
মাল্যপরিহিত প্রধানমন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক

(একেবারে বামে) দণ্ডায়মানা শ্যামমোহিনী

পরিষদের অন্তর্গত মন্দিরে দেবদেবীমূর্তি

প্রয়োজন সম্পর্কে ভাবা যত সহজ, করা তত সহজ নয়, বিশেষতঃ তৎকালীন সমাজের মেয়েদের দায়িত্ব নেওয়া। সমাজে কত গলদ, কত কলঙ্ক রটতে পারে—তাই সুপরিকল্পিতভাবে যা কিছু করার জন্য অগ্রসর হতে হবে। এদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে রেখে সুশিক্ষা দেওয়া যায়—এমনি কতকিছু অগ্রপশ্চাৎ ভাবনাই না এখন তাঁর মনে। উচ্ছ্বাস-আবেগ সংযত করে বাস্তবতার দিকগুলিকে তিনি বরাবরই প্রাধান্য দেন—এখানেও সে ত্রুটি করলেন না।

নালন্দা-তক্ষশীলা আদর্শ

শৈশব থেকেই শ্যামমোহিনীর অন্তরে শিক্ষাবিস্তারের বীজ নানা ভাবে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তাঁর এই অভিলাষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এতদিন দেখেছি আমরা তাঁর বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যের মধ্য দিয়ে। তাঁর বাসনা পূর্ণরূপ পেল বিদ্যাসাগর বাণীভবনে সুপারিণটেণ্ডেণ্ট পদে আসীন থাকাকালে।

বিদ্যাসাগর বাণীভবনে বসে শ্যামমোহিনীর একমাত্র আকুল প্রার্থনা ছিল কেমন করে বৃহত্তম সংগঠন করা যায়; সিট-নেই-বলে ফিরিয়ে-দেওয়া এইসব দুঃখী মেয়েদের করুণ মুখগুলি প্রতিনিয়ত তাঁর মনের মুকুরে প্রতিবিম্বিত হতে থাকে। ভেতর থেকে কে যেন তাঁকে ক্রমাগত উৎসাহ দেন—পিতৃভূমি করঞ্জা গ্রাম থেকে আরম্ভ করে এত তো সংগঠন করেছ, নারীশিক্ষা সমিতির নানা বিভাগের সংগঠন ও পরিচালনার সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত থেকেছ—তবু এখনও এত শঙ্কা তোমার কিসের? মাভৈঃ। কে যেন অভীঃমন্ত্রে দীক্ষা দিতে থাকেন তাঁকে।

প্রবল বাসনা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সবই আছে, এখন কাজ আরম্ভ করলেই হয়, শক্তি-ফন্দি কিছুই নয়—সাহসে ভর করে কাজে নেমে পড়তে হবে। এমনতর কত ভাবনার ঝড় মনের মধ্যে উঠল তাঁর।

নারীশিক্ষা সমিতিতে বেশ আছেন—এখানকার চাকরীতে অর্থ আছে, লেডী বসুর মত প্রথিতযশা দরদী মহিলা মাথার উপরে—কিন্তু 'তবু ভরিল না চিত্ত'—কোথায় যেন এক বিরাট শূন্যতা অনুভব করতে থাকেন শ্যামমোহিনী। 'হেথা নয়—হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে' মনের মধ্যে ক্রমাগত এই সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে তাঁর। পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টির মূলেই নাকি অপার বেদনা কাজ করে—শ্যামমোহিনীও এখন সৃষ্টিবেদনার যন্ত্রণায় জর্জরিত হতে থাকেন। অতীতের দিকে চেয়ে দেখলেন তিনি। সেই স্বপ্ন—"যদি পারি তবে প্রতিষ্ঠা করব নালন্দা-তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে এক মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে নারী ও সমাজ ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার অনুশীলনে ভারতের লুপ্ত সভ্যতা ও প্রতিষ্ঠাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে এবং স্বাধীন সত্তার অধিকারিণী হবে। নালন্দা-তক্ষশীলা শ্যামমোহিনীর আদর্শ—কিন্তু দেশ যে এখন নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত—পাশ্চাত্য ভাবধারাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করেছে—সুতরাং নতুন আয়ুধে নারীসমাজকে তৈরী করতে হবে। প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে এমনভাবে শিক্ষাদান করতে হবে যাতে মেয়েরা সাধারণ শিক্ষালাভের সঙ্গে শিল্পসংস্কৃতি প্রভৃতি শিক্ষালাভ করে তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করতে পারে।

শ্যামমোহিনীর কর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি কোন কাজেই ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে বর্তমানকে অর্থহীনভাবে উপেক্ষা করেন না। আজন্ম সংগঠন শক্তির অধিকারিণী তিনি কী আর বেশীক্ষণ ভাবনাচিন্তা নিয়ে বসে থাকতে পারেন?

মূলতঃ দুই কারণে শ্যামমোহিনীকে এই সময়ে অত্যন্ত বিচলিত দেখা যায়:

১। যে সময়ের কথা হচ্ছে—সেই ১৯৩৩ সালে বয়স্কা মহিলাদের জন্যে কোন স্কুলই ছিল না।

২। এছাড়া লোকসংখ্যা অনুপাতে মেয়েদের স্কুলও খুব কম ছিল। তৎকালীন ইংরেজ সরকারের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে দেশের স্ত্রীশিক্ষার হার খুব কম ছিল।

এইসব কারণে শ্যামমোহিনী অত্যন্ত মর্মাহত হন। উক্ত রিপোর্টে স্ত্রীশিক্ষার শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি যেমন করে হোক ব্যাপকভাবে দেশে স্ত্রীশিক্ষা যত সত্বর পারেন আরম্ভ করবেন মনস্থ করলেন। মনের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে এখন তিনি একাজে বদ্ধপরিকর হলেন।

শ্যামমোহিনী মনে মনে স্থির করলেন যে, এই বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনে থেকেই তাঁর একাজ আরম্ভ করবেন এবং যত সত্বর পারেন কলকাতায়ই এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। কারণ সহরে মেয়েদের জন্যে বৃহৎ আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে তা পরিচালনা করা যত সহজ হবে—গ্রামবাংলায় করলে তত সহজ হবে না। নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে।

তবে ভবিষ্যতে যখন তিনি ব্যাপক স্ত্রীশিক্ষা প্রসার করবেন তখন সুদূর গ্রামেও এর শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনাও শুক্তিতে মুক্তার মত তিনি তাঁর মনের কোণে একান্তভাবে সঞ্চিত করে রাখলেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাণীপীঠ স্কুল স্থাপন

১৯৩৪ সাল, ১৫ই জানুয়ারী। এল সেই একান্ত কাঙ্ক্ষিত পুণ্য দিনটি। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে বড় প্রতিষ্ঠান করবেন শ্যামমোহিনী —তাহলেই নারীদের জন্যে বড় কিছু করা হবে। শ্যামমোহিনীর আজীবন অন্তরের এই স্বপ্নের বাস্তব সৌধ রচনা করলেন তিনি ঐ দিনটিতে। সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ-অর্থসম্পদ সর্বস্ব ত্যাগের মাধ্যমে একাজে আপনাকে উৎসর্গ করলেন তিনি। এই দিনটি তাই আমরা পুণ্য দিন বলেই অভিহিত করব। তিনি বাণীপীঠ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে পরোক্ষে বিশ্বের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। জীবনব্যাপী তাঁর সে সাধনার ফলশ্রুতি জনকল্যাণমূলক বহু প্রতিষ্ঠানের কথা একে একে আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে জানতে পারব।

স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়

"আশা করবো, মহাপ্রলয়ের পরে নৈরাশ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটা নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।" —রবীন্দ্রনাথ

আশাবাদী শ্যামমোহিনী তাঁর এই স্বপ্নের বাস্তবরূপ দানের প্রচণ্ড সাড়া পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর বাণীভবন হোস্টেল সুপারিণটেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত থেকে—অসংখ্য শিক্ষালাভেচ্ছু মেয়েদের ফিরিয়ে দেবার অব্যক্ত বেদনা থেকে। সেই আশাকে তিনি বাস্তবে রূপদান করলেন বিদ্যাসাগর বাণীভবনে থেকেই এর সন্নিকটে বাড়ী ভাড়া নিয়ে বাণীপীঠ

স্কুল স্থাপন করে। এ কাজে হাত দেবার পূর্বে অবশ্যই তিনি লেডী বসুর সঙ্গে পরামর্শ করে নিলেন। লেডী বসুকে তিনি তাঁর মনের আকুতি জানিয়ে বললেন, "বিদ্যাসাগর বাণীভবনে মাত্র ৬০টি সিট, ফলে দৈনিক কত মেয়েকেই ফেরত দিতে হচ্ছে,—আমি কি এজন্য একটি স্কুল খুলতে পারি?"

লেডী বসু শ্যামমোহিনীর এই অভিপ্রায়কে সমর্থন করলেন, এবং তাঁকে স্কুল খোলার সম্মতি দিলেন। লেডী বসুর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শ্যামমোহিনী ঐ বৎসরই বয়স্কা মেয়েদের জন্যে বাণীপীঠ নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বয়ং লেডী বসু এর প্রথম গর্ভনিং বডিতে থাকলেন। নারীশিক্ষা সমিতির বিপরীত দিকে লক্ষ্মীবিলাস হাউসের পার্শ্বে ছোট্ট একটি দোতলা বাড়ী ভাড়া নিলেন শ্যামমোহিনী। ভাড়া একান্ন টাকা। এই ভাড়া বাড়ীতেই তিনি বাণীপীঠ স্কুল আরম্ভ করলেন। আর ছাত্রীদের থাকার জন্যে ৯ নম্বর নারিকেল বাগান লেনে আর একটি ছোট্ট বাড়ী নিয়ে ছাত্রীনিবাস স্থাপন করলেন তিনি।

বাণীপীঠ স্কুলের বৈশিষ্ট্য

বাণীপীঠ আবাসিক স্কুল খোলার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ

১। বিদ্যাসাগর বাণীভবনে তখন কেবলমাত্র বিধবাগণ স্থান পেত। কিন্তু বাণীপীঠ স্কুলে বিধবা, সধবা, কুমারী সর্ব শ্রেণীর মেয়েদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হল।

২। এখানে বয়সের কোন সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। সব বয়সের মেয়েরা আবাসিক হোস্টেলে থেকে বিদ্যার্জনের সুযোগ-সুবিধে পেত এবং পায়।

৩। বাণীপীঠ স্কুলে শিল্প শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল যাতে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষা করে মেয়েরা জীবিকা অর্জনের সুযোগ লাভ করে।

প্রথম ছাত্রী

বাণীপীঠ স্কুল প্রতিষ্ঠার দিনে ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র দুটি। এঁদের মধ্যে একজন হলেন তৎকালীন নাম-করা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার অমূল্য চরণ উকিলের ভগ্নী সরযুবালা দেবী। ইঁনি সধবা অবস্থায়ই লেখাপড়া শেখার আগ্রহ নিয়ে এখানে ভর্তি হলেন। কয়েকটি সন্তানের মা তিনি তখন। বয়স্কা সধবা, বিধবা বা কুমারী প্রত্যেকেই এই স্কুলে পড়াশুনা করতে পারবেন জেনে তিনি ভর্তি হন। অপর জন ছিলেন একজন বয়স্কা বিধবা মহিলা, নাম সরলা দেবী।

বাণীপীঠ স্কুল স্থাপনে আনন্দবাজার পত্রিকা

বল বল বাহুবল, আপন বাহুবল নিয়ে অর্থাৎ কারো আর্থিক সাহায্য ছাড়াই শ্যামমোহিনী তাঁর স্বোপার্জিত অর্থ দিয়ে বাণীপীঠ স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু নেপথ্যে থেকে ঈশ্বরই যেন তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন যার ফলে বহুগণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর এ কাজে স্বেচ্ছায় তাঁদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করলেন।

এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত আইনবিদ ডঃ রাধাবিনোদ পাল। ইনি পরে আইনজ্ঞ হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই প্রথম বাণীপীঠ স্কুল ও হোস্টেলের গভর্নিং বডির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নানাভাবে বুদ্ধিপরামর্শ ইত্যাদি দিয়ে শ্যামমোহিনীর কাজে সহায়তা করেন।

আর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্রীদের পড়ানোর ভার নিয়ে আরম্ভেই বাণীপীঠের সুনাম যেভাবে উচ্চ শিখরে তুলে দিলেন তাঁদের কৃতিত্বের সে সব কথায় পরে আসছি। এর পূর্বে বাণীপীঠ স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাবার মুলে তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকার অসামান্য অবদানের কথা বলছি। আনন্দবাজার পত্রিকার সে অবদান বাণীপীঠ স্কুলের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে।

এই সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা দুইজন প্রফুল্ল কুমার সরকার ও সুরেশ চন্দ্র মজুমদার শ্যামমোহিনীর এহেন মহৎ উদ্দেশ্যের কথা শুনে বিনামূল্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে শ্যামমোহিনীকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

প্রফুল্লকুমার সরকার ও সুরেশ চন্দ্র মজুমদার সংবাদপত্র পরিচালনা জগতে দুটি উজ্জ্বল নাম। ক্রমাগত দুটি বৎসর তাঁরা বিনামূল্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়াতে অগণিত বয়স্কা কুমারী, সধবা, বিধবা এসে বাণীপীঠ স্কুল ও হোস্টেলে ভর্তি হতে থাকল। এজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা ও তার ঐ দুই দিকপাল প্রতিষ্ঠাতার নিকট শ্যামমোহিনী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত পরিষদ অশেষ ঋণী। তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বললেন, আনন্দবাজার পত্রিকা ও তার প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় প্রফুল্ল কুমার সরকার ও সুরেশ চন্দ্র মজুমদারের বদান্যতায় দু'তিন মাসের মধ্যেই বাণীপীঠ ছাত্রীসংখ্যায় বিদ্যাসাগর বাণীভবনকে ছাড়িয়ে গেল। কারণ পত্রিকার মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর মেয়েদের এখানে থাকার ব্যবস্থা আছে জানতে পেরেই সুদূর পল্লীগ্রাম ও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এত বেশী মেয়ে এসে বাণীপীঠে ভর্তি হতে থাকল। শ্যামমোহিনীর বর্তমান পরিষদের গোড়াপত্তন হল।

শ্যামমোহিনীর সঙ্গে প্রফুল্ল কুমার সরকার ও সুরেশচন্দ্র মজুমদারের হৃদ্যতা ছিল। সুরেশচন্দ্র মজুমদার তখন থাকতেন প্রফুল্ল কুমার সরকারের বাড়ীতে। শ্যামমোহিনী ঐ বাড়ীতে তাঁর স্কুল সম্পর্কে যাতায়াত করতেন। প্রফুল্ল কুমার সরকারের মা সরলা সরকার শ্যামমোহিনীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁকে উৎসাহ দিতে পরে তিনিও শ্যামমোহিনীর বাণীপীঠের সদস্য হন। প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী নির্ঝরিণী সরকারও বাণীপীঠের সঙ্গে যুক্ত হন। তৎকালীন বাণীপীঠের গভর্নিং বডির সদস্যরূপে এঁদের নাম পরিষদের প্রসপেকটাসে লিখিত আছে। এখন শ্যামমোহিনীর কথায় বলি ঃ

"১৯৩৪ সাল, ১৫ই জানুয়ারী বাণীপীঠ স্কুল খুললাম। কিন্তু দুই

মাসের মধ্যেই স্কুল ও বোর্ডিং মেয়েতে ভর্তি হয়ে গেল। স্থান সংকুলান না হওয়ায় স্কুলটি নারিকেল বাগান লেন থেকে স্থানান্তরিত করলাম ৬।১, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে। বাড়ীটি ছিল দোতলা। নীচে উপরে সর্বসাকুল্যে বৃহৎ বৃহৎ ছটি ঘর। মাসিক ভাড়া ৮০ টাকা। কিন্তু মার্চ-এপ্রিলে ঐ বাড়ীও মেয়েতে ভরে গেল। এত মেয়ে আসতে থাকল যে আরো একটি বাড়ী ভাড়া নিলাম ৬।২, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে। মে-জুন মাসে ঐ বাড়ী দুটিও ছাত্রীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল। তখন কি করি ঐ বাড়ীর সংলগ্ন বাদুড় বাগান লেনে ৮০ টাকা মাসিক ভাড়ায় ৬ খানি ঘরবিশিষ্ট আরো দুটি ব্লক ভাড়া নিলাম। পুজোর পর ঐ দুটি ব্লকের একটি ছাত্রীতে ভরে গেল। এই সমস্ত বাড়ীর মালিক ছিলেন সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় নামে এক মহানুভব ব্যক্তি। তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, নাহলে এভাবে চার-চারটি বাড়ী তিনি আমাকে একাজে ভাড়া দিতেন না। ঐ বাড়ীগুলি এমনভাবে তৈরী ছিল যে, এক বাড়ীর ভেতর দিয়ে অন্য বাড়ীতে যাওয়া যেত এবং গেট বন্ধ করে দিলে একই বাড়ী বলে মনে হত।

"বাণীপীঠ স্কুলে এখন যাঁরা ভর্তি হলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ঘরের বৌ, বিধবা ও কিছু কিছু বয়স্কা কুমারী; এদের কেউ কেউ কিছু পরিমাণ বাংলা লিখতে-পড়তে জানতেন কিন্তু অঙ্ক ও ইংরেজী আদৌ জানতেন না।"

"আর যাঁরা এদের পড়াতেন তাঁরাও ছিলেন সকলেই স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকেই পড়াতেন। এঁদের মধ্যে রেবতীমোহন লাহিড়ী—ইতিহাসে এম. এ., নীতিশ বাকচী—মনোবিজ্ঞানে এম. এ. (হেড মাষ্টার), ননীগোপাল গুপ্ত—ইতিহাসে এম. এ., দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র বি. এ। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন রসিক লাল নন্দী ও শরৎচন্দ্র ঘোষ।"

সেদিন এই সমস্ত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি যেভাবে শ্যামমোহিনীকে সাহায্য করেছেন তাতে এঁদের সে প্রভূত অবদান বাণীপীঠ স্কুল

গঠনের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের গোড়ার কথা বলতে গেলে এঁদের কথা সর্বাগ্রে এসে পড়ে।

শ্যামমোহিনী স্বয়ং তখনও নারীশিক্ষা সমিতির কাজে নিযুক্ত। ঐখানে থেকেই তিনি এতবড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। বাণীপীঠ ছাত্রীনিবাসের তৎকালীন সুপারিণটেণ্ডেণ্ট ছিলেন কমলা মৈত্র। শ্যামমোহিনীর এক আত্মীয়া তিনি। আর য়্যাসিসট্যাণ্ট সুপারিণটেণ্ডেণ্ট ছিলেন সুধাংশু সেন। এই মহিলা ছিলেন যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা কুমুদ শঙ্কর ও প্রখ্যাত কিরণ শঙ্কর রায়ের নিকট আত্মীয়া।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঢাকায় স্বামীর নামে স্কুল

নারীশিক্ষা সমিতির কাজ বলুন আর বাণীপীঠ স্কুল প্রতিষ্ঠা বলুন শ্যামমোহিনীর কিন্তু মন রয়েছে ঢাকায় শ্বশুরালয়ের গ্রামের সেই স্কুলটির দিকে যা তিনি বিবাহের পর (১৯০০) শাশুড়ীর তত্ত্বাবধানে আরম্ভ করেছিলেন। এখন সেই স্কুলটিকে পুনঃস্থাপন করতে হবে।

পিতৃভূমি করঞ্জা গ্রামে গোবিন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে এ সম্বন্ধীয় যত জটিল কাজকে সরলীকরণ করার সহজাত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন শ্যামমোহিনী। সে বুদ্ধির প্রকাশ এখানেও দিলেন। এসব কাজের মধ্য দিয়ে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই সামাজিক কতরকম কল্যাণ-কাজ একই সঙ্গে করে যাচ্ছিলেন। কথায় বলে প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ করে তাই খাঁটী হয়, কার্যকরী হয়।

কাজে হাত দিয়ে ব্যর্থ হওয়া শ্যামমোহিনীর 'কোষ্ঠীতে' লেখেনি। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র তাঁকে 'আমার পয়মন্ত কপালে মেয়ে' বলে আদর করতেন—জ্যোতিষীগণও তাঁকে একজন ভাগ্যবতী মেয়ে বলে কোষ্ঠীতে লিখে দিয়েছিলেন—শ্যামমোহিনীর জন্মের পর তাঁর পিতা আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে থাকেন। তিনি অনেকগুলি রাজষ্টেটের উকিল নিযুক্ত হয়েছিলেন। আশা করি পাঠকপাঠিকাদের সে কথা স্মরণে আছে। পিতার কথা শ্যামমোহিনীর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে—শ্যামমোহিনীর জীবন চর্যার মধ্য দিয়ে আমরা তার প্রমাণ পাই।

যাক্ যা বলছিলাম। শ্যামমোহিনী সুরেন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যে মায়ারাণীকে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করলেন। কিন্তু এর আগে তিনি মায়ারাণীকে স্নেহের ডোরে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন। তিনি তাঁর ভাশুরপো দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে মায়ারাণীকে বিবাহবন্ধনে

আবদ্ধ করলেন। এখন মায়ারাণী ও দ্বিজেন্দ্রনাথের একটু পরিচয় দেওয়া যাক।

মায়ারাণী হলেন শ্যামমোহিনীর বৈমাত্রেয়ী দিদি সুরসুন্দরীর দৌহিত্রী। এই সুরসুন্দরীর বাসায় ১৯২৩ সালে শ্যামমোহিনী তাঁর দুটি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিয়ে কলকাতায় ট্রেনিং পড়তে এসে উঠেছিলেন।

আর দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র হলেন শ্যামমোহিনীর ভাশুর দেবেন্দ্রনাথ মৈত্রের একমাত্র পুত্র। এই দেবেন্দ্রনাথের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি—তিনি যেমন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, মধুর স্বভাবের ছিলেন তেমনি সুপুরুষ ছি লন। শ্যামমোহিনীর বিবাহের পর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কালা জ্বরে মারা যান—মৃত্যুকালে তাঁর একমাত্র পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র দুই মাস।

শ্যামমোহিনীর তাঁর ভাশুরপো দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে মায়ারাণীর বিবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্য হল—মায়ারাণীর হাটাইল-মধুপুরে শ্বশুর বাড়ীতে থেকে ঐ সুরেন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে কোন অসুবিধে হবে না।

মায়ারাণী তৎকালে শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। আর দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন বি. এ. পাশ। তাঁকেও শ্যামমোহিনী কাজে লাগালেন। ঐ বৎসরই বাণীপীঠ স্কুলে তিনিও শিক্ষকতা আরম্ভ করলেন।

এসব ব্যবস্থাদি করার পর শ্যামমোহিনীর পক্ষে তাঁর স্বামীর নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার আর কোন বাধা রইল না। তিনি বিদ্যাসাগর বাণীভবনে থাকাকালে ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কিছুদিন ছুটি নিয়ে এক ফাঁকে ঢাকায় চলে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে দিয়ে এলেন। ঐ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে মায়ারাণীকে ১০ টাকা মাহিনা দিতেন। প্রতি মাসে মনি অর্ডার করে কলকাতা থেকে শ্যামমোহিনী তাঁকে ঐ টাকা পাঠিয়ে দিতেন।

স্কুলটি ছিল প্রাইমারী, চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়ে উভয়েই পড়ত। এদের পাঠ্যপুস্তক থেকে সব কিছুর ব্যয়ভার শ্যামমোহিনী নিজে বহন করতেন। মায়ারাণীর পড়ানোর খুব সুখ্যাতি ছিল। তাঁর তত্ত্বাবধানে দিনে দিনে স্কুলটির শ্রীবৃদ্ধি হয়।

শ্যামমোহিনী তাঁর স্বামী সুরেন্দ্রনাথের এবং শাশুড়ী ভবানী সুন্দরী দেবীর সেদিনকার ঐকান্তিক অভিলাষ ঐ অজ পাড়াগাঁয়ের নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাবিস্তার ব্যবস্থা প্রকাশ্য স্থানে করে দিয়ে তাঁদের সে মনস্কামনা পূর্ণ করলেন। গয়ায়-বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রিয়জনের বিদেহী আত্মার তৃপ্ত্যর্থে পিণ্ডদান করে হিন্দুরা যেমন কৃতকৃতার্থ হন তেমনি একাজ সমাধা করে শ্যামমোহিনী নিজে কৃতার্থম্মন্য হলেন।

১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ঐ স্কুলটি চলছিল। তারপর এই স্কুলটি ও পাবনার করঞ্জা গোবিন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয়টি একই কারণে ১৯৫০ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

দেশ বিভাগের (১৯৪৭ সাল, ১৫ই আগাষ্ট) কিছুদিন পর হিন্দুদের স্কুলে মুসলমান ছাত্রছাত্রী পাঠান বন্ধ করে মাদ্রাসা স্থাপন করেন মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা। এই সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির ফলে স্কুল বন্ধ করে মায়ারাণী ঐ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কারণ নিজের দেশ হয়ে গেল বিদেশ পাকিস্থান—যাতায়াতে পাশপোর্ট ব্যবস্থা চালু হল। এভাবে রাজনীতির বিকৃতি ঘটায় ও তা ঘৃণিত পথে চলায় কত সুপ্রচেষ্টাই যে ব্যাহত হয়েছে—কত মহাপ্রাণ যে বেদনায় কঁকিয়ে উঠেছেন তার সীমাসংখ্যা নেই। শ্যামমোহিনীও এ ঘটনার আকস্মিকতায় রক্তাক্ত বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। গোটা বাংলাদেশের অশিক্ষা দূর করার পরিকল্পনা তাঁর এভাবে ব্যাহত হল। কিন্তু শ্যামমোহিনী এ ব্যর্থতায় বিমূঢ়া হয়ে পড়ে থাকেন নি। তিনি তাঁর পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করে এর নিত্য নতুন শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধি করতে লাগলেন।

১৯৩৪ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী দুই মাসের মধ্যেই শ্যামমোহিনী কলকাতায় বাণীপীঠ স্কুল ও ঢাকায় সুরেন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয় গঠনের কাজ একই সঙ্গে শেষ করলেন। দুটি স্কুলই তিনি বিদ্যাসাগর বাণীভবনে থাকাকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে আর ওখানে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ বাণীপীঠ স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান অপরিহার্য হয়ে পড়ল। এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে শ্যামমোহিনী লেডী বসুর অনুমতি নিয়ে ওখানকার কাজ ছেড়ে চলে আসেন। তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করলে লেডী বসু সহ ওখানকার সকলেই একযোগে বললেন, আপনি চলে গেলে সমিতির কাজে অশেষ ক্ষতি হবে।

উত্তরে শ্যামমোহিনী বললেন, আমাকে যেতে হবে, না হলে বাণীপীঠ এত অল্প সময়ে এত বড় হয়ে গেছে যে, তাতে অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে—কাজেই আমাকে যেতেই হবে।

ফিরে এসে শ্যামমোহিনী বাণীপীঠ গঠনের কাজে সম্পূর্ণ আত্ম-নিয়োগ করলেন। বাণীপীঠ প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌কালে তার কার্যকরী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন :

১। ডঃ রাধাবিনোদ পাল—সভাপতি
২। শ্যামমোহিনী দেবী—প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা
৩। রেবতীমোহন লাহিড়ী—অর্গানাইজিং সেক্রেটারী
৪। লেডী অবলা বসু সদস্য
৫। পূর্ণিমা বসাক ”
৬। জিতেন্দ্র নাথ মৈত্র ”
৭। নীতিশ বাক্‌চি ”

উপরোক্ত কার্যকরী সদস্যবৃন্দ ব্যতীত যে সকল উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক বাণীপীঠে শিক্ষকতা করতেন, যাঁদের আনুকূল্যে ও শিক্ষা-পদ্ধতির উৎকর্ষে বাণীপীঠ স্কুলের সুনাম এত দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন কলেজের অধ্যাপক।

বিভিন্ন বিভাগ খোলা হল (১৯৩৩)

বাণীপীঠ স্কুল আরম্ভ করেই এর অধীনে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি খুললেন শ্যামমোহিনী :

১। বয়স্কাদের জন্য শর্ট ম্যাট্রিক স্কুল

২। জুনিয়র ও সিনিয়র ট্রেনিং সেণ্টার

৩। বাণীপীঠ প্রাইমারী স্কুল

৪। বাণীপীঠ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল

৫। বাণীপীঠ ছাত্রীনিবাস

৬। বাণীপীঠ উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়

বাণীপীঠ স্কুলে শিল্পশিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকায় এতগুলি বাড়ী নিয়েও জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না। এই সঙ্গে প্রথম বৎসরেই ছাত্রীসংখ্যা আশাতীত বেড়ে যাওয়ায় ঐ চারটি বাড়ীর ছাদের উপর শ্যামমোহিনী টিন দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চালা তুলে নিলেন। এর একদিকে মেয়েরা থাকত আর অন্যদিকে শিল্প বিদ্যালয়ের ক্লাশ হত। শিল্পকেন্দ্রের সরঞ্জাম ছিল তাঁত, সেলাই মেসিন প্রভৃতি।

আমরা বরাবরই একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি—কি করে কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা অল্প জায়গায় ও স্বল্প খরচে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়—মূলতঃ সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করার জন্যই শ্যামমোহিনী এতবড় পরিষদ গঠন করতে পেরেছেন। ছাদকেও তিনি কাজে লাগিয়েছেন।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁর লেখনীর প্রসাদগুণে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসামান্য গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি সৃষ্টির দ্বারা মানুষের দৃষ্টিশক্তির আবরণ উন্মোচন করে মানুষকে চিন্তার খোরাক দেন—মানুষের চিত্ত জয় করে কালজয়ী হন। শ্যামমোহিনীর এই সব কর্মধারার পদ্ধতি দেখে তিনি যে একজন সত্যিকার সৃষ্টিধর্মী জীবন-শিল্পী এ বুঝতে আর কারো বাকী থাকে না। এখানেই তিনি অনুকরণীয়া। নবদ্বীপ তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়, পাবনা বালিকা

বিদ্যালয় তিনি কি ভাবে ঢেলে সাজিয়ে দিয়ে এসেছিলেন সেকথা আমরা আগেই বলেছি। এখানে তাঁর সংগঠন শক্তি পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না।

নারী শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী লেডী বসুর কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য : 'আপনি আসার পর আমার সমিতির অনেক উন্নতি হয়েছে।'

এভাবে সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে শ্যামমোহিনী এখন বাণীপীঠের সংগঠন ও তার উন্নতির কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। যেন দেশের তাবৎ অসম বয়সের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পুণ্য কাজ তাঁর উপর বর্তিয়েছে এবং তাঁকে তা করতেই হবে এমনি মন নিয়ে তিনি কাজে অগ্রসর হলেন। আর কোন দিকে তাঁর মন নেই।

নারীশিক্ষা সমিতির য়্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী কৃষ্ণপ্রসাদ বসাকের কথা তাঁর মনে এ ব্যাপারে সতত কাজ করে : 'যে কাজ যখন করবেন তা একাগ্রচিত্ত হয়ে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে করবেন তাহলেই সাফল্য আসবে।'

যে সময়ের কথা বলছি সেই ১৯৩৪ সালে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে একদল দেশপ্রেমিক বীরাঙ্গনা নারী চরম আত্মাহুতি দিয়ে চলেছেন—আর শ্যামমোহিনী ঐ বৎসরই তাঁর নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের গোড়াপত্তন করলেন। বাণীপীঠ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাবিস্তার করার জন্য পরোক্ষে মানুষ গঠনের কাজে আত্মোৎসর্গ করলেন। কারণ মেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা মানে নেপোলিয়নের সেই কথা 'If you educate the girl, you will educate the whole family'. এভাবে নারী জাতির শিক্ষার ভার নিলেন শ্যামমোহিনী। এছাড়া তখনও দেশে খৃষ্টধর্মের এমন প্রভাব ছিল যে, সুদূর পল্লীঅঞ্চলেও বহু স্ত্রীপুরুষ জাতিভেদ প্রথা ও শিক্ষার অভাবে খৃষ্টধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়তে আরম্ভ করেছিল—শ্যামমোহিনী তাঁর বাণীপীঠ স্কুল ও বোর্ডিং স্থাপন করে

সেদিক থেকেও হিন্দুধর্মকে কিছুটা রক্ষা করার ব্রত নিলেন। ভারতীয় কৃষ্টি, শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনার চর্চাও তিনি একই সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে প্রচার করেন। ভারতীয় আত্মবৈশিষ্ট্য যা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে জাতি ভুলতে বসেছিল সেই সনাতন হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টাও মেয়েদের মধ্যে চালিয়ে যাচ্ছিলেন যা অন্যদিকে কেবল কূপমণ্ডুক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দুধর্মকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তৎকালে শ্যামমোহিনীর এ প্রচেষ্টাও দেশের পক্ষে কম গৌরবের ছিল না। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল হিন্দুকন্যাকে তিনি তাঁর বাণীপীঠে আশ্রয় দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন, পরোক্ষে জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণের ব্রত নিলেন এটাও তৎকালে বড় কম কথা নয়। তাঁর এই মহতী প্রচেষ্টার ফল যে অচিরেই সুফল প্রদান করে সেকথাই বলছি এখন।

ছাত্রীদের কৃতিত্ব

বাণীপীঠের এই সমুদয় অসম মেয়েদের ঐ সব বিদ্বান অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ এমনভাবে শিক্ষা দিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে ৬০টি মেয়েকে ট্রেনিং প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুললেন। এই ৬০ জন ছাত্রীই কলকাতার বিভিন্ন ট্রেনিং স্কুলে যেমন, সেণ্টমেরী, লি মেমোরিয়াল ট্রেনিং স্কুল, সরোজনলিনী ট্রেনিং স্কুল, মুসলিম ট্রেনিং স্কুল, হিন্দু ফিমেল ট্রেনিং স্কুল, ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুল প্রভৃতি ৯টি ট্রেনিং স্কুলে ট্রেনিং প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেন এবং প্রত্যেক ট্রেনিং স্কুলে এই সব মেয়েদের অধিকাংশই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হলেন। তাঁরা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করার জন্য করপোরেশন ও গভর্নমেণ্টের নিকট হতে বৃত্তি পেয়ে ট্রেনিং পড়তে লাগলেন। পাশ করে পরবৎসরই (১৯৩৫) বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হলেন। এতে স্কুলটির সুখ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ট্রেনিং স্কুলের

কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল পূর্ণিমা বসাক শ্যামমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কিভাবে শিক্ষা দেন, এ যে দেখছি সব কলেজ ষ্টাইলে লেখা। প্রত্যেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে পাশও করেছে।"

একথা শুনে শ্যামমোহিনীর আনন্দের অন্ত নেই। উত্তরে তিনি বললেন, "আমার শিক্ষকগণ যে সব কলেজেরই প্রফেসর। মর্নিং সেস্সানে আমার স্কুলে তাঁরা সকলেই বিনা পারিশ্রমিকে পড়ান।" শ্যামমোহিনী অবশ্য পরে তাঁদের কিছু কিছু এ্যালাউন্স দিতেন। স্কুলের যেমন আয় বৃদ্ধি হতে থাকে তেমনি এই শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের এ্যালাউন্সও বাড়িয়ে দেন তিনি। কিন্তু এই সব উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকগণ কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রতিটি ছাত্রীকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রিন্সিপ্যাল পূর্ণিমা বসাকের উপরের মন্তব্য থেকে।

এ ছাড়া লেডী অবলা বসুও শ্যামমোহিনীকে বলেন, "আপনার বাণীপীঠের ছাত্রীদের প্রবেশিকা ট্রেনিং পরীক্ষায় উচ্চ মানের ফল দেখে আপনার উপর আমার হিংসে হয়। কেননা আপনি আমার এখানে থাকেন অথচ সব কটি মেয়ে এমন কৃতিত্বের সহিত পাশ করল! আর এত অল্প সময়ে ছাত্রীসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেল!"

ষোড়শ অধ্যায়

নিখিল ভারত নারীশিক্ষা পরিষদ গঠন

১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী থেকে ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারী প্রায় এক বৎসরের মধ্যে বাণীপীঠের এই অসম্ভব উন্নতি ও ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় শ্যামমোহিনী বাণীপীঠের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতির দিকে অধিকতর মনঃসংযোগ করলেন। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন বাংলার তৎকালীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যসম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী। অনুরূপা দেবীকে সভানেত্রী করে শ্যামমোহিনী নিখিল ভারত নারীশিক্ষা পরিষদ নামে এক সোসাইটি গঠন করলেন এবং বিদ্যালয়গুলি ও বোর্ডিংকে এরই অঙ্গীভূত করে নিলেন। এই পরিষদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়ঃ

"ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির মধ্যে যাহাতে একজন নারীও নিরক্ষরা না থাকে তজ্জন্য ব্যাপকভাবে জনমত গঠন ও কার্যকরী শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত এই নিখিল ভারত নারীশিক্ষা পরিষদ ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে স্থাপিত হইয়াছে।

"ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সহিত অর্থকরী কুটিরশিল্প ও সাধারণ শিক্ষা দান করিয়া বালিকাদিগকে সুমাতা—সুগৃহিণী করা এবং পুরস্ত্রী ও বিধবাগণকে প্রয়োজনানুসারে আদর্শ শিক্ষয়িত্রী, চিকিৎসাকারিণী, সেবিকা প্রভৃতি গঠন করতঃ স্বাবলম্বী করা এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার জন্য উল্লিখিত বিভাগগুলি ১৯৩৫ সালে পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এরপর নিম্নলিখিত বিভাগগুলি খুলে এগুলিকেও পরিষদের সঙ্গে যুক্ত করলেন শ্যামমোহিনী—

১। বাণীপীঠ সঙ্গীত সঙ্ঘ

২। দুঃস্থা মেয়েদের জন্য ফ্রি ছাত্রীনিবাস

৩। ফাষ্ট এড, হোম নার্সিং ক্লাশ

৪। লেডী ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমা ক্লাশ

৫। হিন্দী শিক্ষা বিভাগ

৬। হোসিয়ারী বিভাগ

স্কুলের বিভিন্ন বিভাগগুলি পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। এই সময়ে নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দ নিয়ে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি পুনর্গঠিত হয়ঃ

নিখিল ভারত নারীশিক্ষা পরিষদের প্রথম কার্যনির্বাহক কমিটি

১। সাহিত্যসম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী—সভানেত্রী

২। লেডী ননীবালা ব্রহ্মচারী—সহঃ সভানেত্রী

৩। লেডী রাণু মুখার্জী—সহঃ সভানেত্রী

৪। কমলা দাশগুপ্ত—সহঃ সভানেত্রী

৫। নলিনচন্দ্র পাল—এ্যাডভোকেট সদস্য

৬। নির্ঝরিণী সরকার সদস্য

৭। সুজাতা দাস সদস্য

৮। অধ্যাপক হরিপদ মাইতি সদস্য

৯। কুসুম কুমারী বসু সদস্য

১০। ডাঃ অমূল্য চরণ উকিল সদস্য

১১। শ্যামমোহিনী দেবী সম্পাদিকা

এ ছাড়া পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেনঃ

১। কমল কৃষ্ণ রায় (ভূতপূর্ব মন্ত্রী)

২। কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ

৩। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—মহারাণী, নদীয়া

৪। মহারাণী, নাটোর

৫। মহারাণী, সন্তোষ ৬। সরলা বালা সরকার

কার্য্যনির্বাহক ব্যক্তি ও পৃষ্ঠপোষকদের নাম থেকেই বোঝা যায় তৎকালীন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাজা, মহারাণী প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁদের অন্তরের গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেন আর একাজে উৎসর্গীকৃতা শ্যামমোহিনীর প্রচেষ্টাকে তাঁরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

স্কুলের জন্য ফাণ্ড

বিভিন্ন বিভাগ খুললেন, কার্য্যনির্বাহক কমিটিও গঠন করলেন শ্যামমোহিনী। এতদিন বাণীপীঠ স্কুল ও বোর্ডিংএর যাবতীয় ব্যয়ভার নিজে বহন করেছেন। অবশ্য বোর্ডিংএর জন্যে মেয়েদের নিকট থেকে নামমাত্র চার্জ নেওয়া হত। এখন স্কুলের ফাণ্ডের জন্য তিনি ইনস্পেকট্রেস অফিসে যাতায়াত করতে থাকেন। বহু চেষ্টার পর ১৯৩৫ সালে প্রথমে শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয়ের ফাণ্ড মঞ্জুর হয়। এই শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয়ের ফাণ্ড পাওয়ার পর শ্যামমোহিনী আবার হাইস্কুলের ফাণ্ডের জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলেন।

প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের আগমন

তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী (তখন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) ছিলেন শের-এ বাঙ্গাল এ. কে ফজলুল হক। ১৯৩৭ সালের শেষভাগে শ্যামমোহিনী প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের সঙ্গে দেখা করে দরখাস্ত দিলেন। হক স্বয়ং পরিদর্শনে এলেন, বাণীপীঠের সমস্ত বিভাগ পরিদর্শন করে যারপরনাই খুসী হলেন। তিনি শ্যামমোহিনীকে সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপক স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য একটি বড় স্কীম প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন এবং এ বাবদ যত টাকা লাগে সবই তিনি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন। তদনুসারে শ্যামমোহিনী পাঁচলক্ষ টাকার একটি স্কীম প্রস্তুত করলেন।

এই স্কীমের ব্যবস্থা এরূপ হল যে, কলকাতায় থাকবে মূল অফিস ও তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানকার স্কুলের সকলপ্রকার শিক্ষায়

শিক্ষিত কর্মী ও শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করে মফঃস্বলের সহরে ও পল্লী গ্রামে আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করে সেখানে প্রাণবন্ত কর্মী ও শিক্ষয়িত্রী পাঠিয়ে গ্রামের বয়স্কা, পুরস্ত্রী ও বালিকাদিগকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে ঐ সব প্রতিষ্ঠানে কর্মী ও শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হয়ে তারা আবার দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। স্কীমটি হাতে পেয়ে প্রধান মন্ত্রী জনাব ফজলুল হক তৎকালীন স্কুল ইনসপেকট্রেস ও য়্যাসিসট্যাণ্ট স্কুল ইনসপেকট্রেসকে বাণীপীঠ পরিদর্শন ও উক্ত বিষয়ে পরামর্শ করতে পাঠান।

তখন স্কুল ইনসপেকট্রেস সুনীতিবালা গুপ্ত ও য়্যাসিসট্যাণ্ট ইনসপেকট্রেস মিস দাস উভয়েই প্রধান মন্ত্রী মাননীয় ফজলুল হকের আদেশক্রমে পরিষদ পরিদর্শন করে অত্যন্ত খুসী হলেন এবং ঐ পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ স্কীমই মঞ্জুর করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুকূল রিপোর্ট দিলেন। এই রিপোর্ট পেয়েই প্রধানমন্ত্রী উক্ত টাকার স্কীমটি মঞ্জুর করলেন। তখন ছিল ১৯৩৭ সাল, জুলাই অথবা আগস্ট মাস। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই ঐ স্কীমের কাজ আরম্ভ হবে বলে স্থির হয়।

কিন্তু শুভকার্যে অনেক বিঘ্ন। একাজেও বিঘ্নের অভাব হল না। শেষ পর্যন্ত টাকাটা পাওয়া গেল না। কিন্তু তবু শ্যামমোহিনী নিরুৎসাহ হলেন না। তখন হেডমিসট্রেস ছিলেন মণিকুন্তলা সেন। তিনি ও কয়েকজন তাঁকে একাজে বাধা দেন। এজন্য ১৯৩৭ সালের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর এই তিন মাসে স্কুল নিয়ে শ্যামমোহিনীকে কিছুটা বিব্রত থাকতে হয়। কিন্তু ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে স্কুল আবার যথারীতি চলতে থাকে। মার্চ মাসেই ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেট বরাদ্দ অনুসারে শ্যামমোহিনী সংবৎসরের গ্রাণ্টের টাকাটা এককালীন পেলেন।

এবার স্কুলের হেডমিসট্রেস হলেন—শকুন্তলা বাগচী। স্কুলটি ছিল ৯নং বাদুড় বাগান রো-তে। আর বোর্ডিং ছিল মাণিকতলা বাজারের

সামনে বিবেকানন্দ রোড আর আপার সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে দ্বিতল বাড়ীতে।

বোর্ডিংএর ছাত্রীসংখ্যা (১৯৩৭-৩৮)

তখন বোর্ডিং ও স্কুল মিলে মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০০ জন এবং বাইরের ৪০০ জন। মোট ৫০০ জন ছাত্রী নিয়ে তখন বাণীপীঠ স্কুল চলতে থাকে।

সপ্তদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)

এই সময় স্কুলে ও বোর্ডিংএ মেয়ে ভর্তির জন্য শ্যামমোহিনী কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় এত মেয়ে এসে গেল যে, বাদুড়বাগান রো-এর স্কুলে স্থানসংকুলান না হওয়ায় তিনি ৫৭।৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে একটি গোটা চারতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে স্কুল স্থানান্তরিত করলেন। এই সঙ্গে স্কুলের অন্যান্য বিভাগগুলির গ্রাণ্টের জন্য তিনি প্রচণ্ড চেষ্টা করতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রাণ্টগুলিই পেয়ে যান। স্কুলটি দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের পরিচালনায় ভালভাবে চলছিল। কিন্তু রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে স্কুল চলাকালে ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

১৯৩৯-সালের ১লা সেপ্টেম্বর একনায়কতন্ত্রী জার্মানী অপমানকর ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গ করে পোলাণ্ড আক্রমণ করলে মিত্রশক্তিবর্গ ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় ব্রিটিশশাসিত ভারতও এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ল।

এই যুদ্ধে জার্মানশত্রুদের মধ্যে একমাত্র ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যকে পরাভূত করাই ছিল হিটলারের প্রধান উদ্দেশ্য। জনাকীর্ণ সহরাঞ্চলে বোমা নিক্ষেপ করে জনসাধারণকে সহরাঞ্চল ত্যাগে বাধ্য করা এবং তার ফলে শত্রুদের সামরিক প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ও জিনিসপত্রের দ্রুত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করাও ছিল এই যুদ্ধপদ্ধতির অন্যতম নীতি। ১৯৪১ সালে কলকাতায় বোমা নিক্ষেপ তার অন্যতম প্রমাণ। নেতাদের নির্দেশে তৎকালীন ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে যোগদান করে। ভারতীয় জওয়ানরা যুদ্ধে গিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এই যুদ্ধে আধুনিক মারণাস্ত্র বোমারু বিমান, জঙ্গী বিমান, ট্যাঙ্ক, ডুবো জাহাজ প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা বহুগুণে লোকক্ষয় ও সম্পত্তি

ধ্বংস হয়। ১৯৪৫ সালের ২রা মে জার্মানী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করলে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধে অসামরিক লোকদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ছিল অকল্পনীয়। শ্যামমোহিনীকেও এই যুদ্ধের কবলে পড়ে তাঁর প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে কি অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করতে হয় তা ঘটনাপরম্পরায় জানা যাবে।

১৯৪১ সাল। কলকাতায় হাতিবাগান ও বিভিন্ন স্থানে বোমা পড়ে। কলকাতাবাসীর অধিকাংশই তখন আতঙ্কে সহর ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করল। ঘন ঘন বিপদসঙ্কেত সাইরেণ বাজায় হোষ্টেলের মেয়েরা আতঙ্কিত। তা দেখে শ্যামমোহিনী মেয়েদের গার্জেনদের ডেকে বললেন, 'দেখুন, এই বিপন্ন অবস্থায় আপনাদের মেয়ে রাখতে পারি না—আপনারা দয়া করে আপনাদের মেয়ে নিয়ে যান।' অধিকাংশ মেয়েকেই বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন তিনি। কিন্তু কতিপয় মেয়ে যাদের যাবার জায়গাও যেমন নেই তেমনি যারা শ্যামমোহিনীকে বললেন, আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব না—কেবল তারাই রয়ে গেল। তাদের এ আবদারকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

স্কুল পাবনায় স্থানান্তরিত

যুদ্ধের আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট নির্দেশ দিলেন স্কুল ও বোর্ডিংকে নিরাপদ কোন জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে। অগত্যা শ্যামমোহিনী তাঁর স্কুলটিকে পাবনায় নিয়ে যাবেন বলে মনস্থ করলেন। কিন্তু নিয়ে যাওয়া কী যে সে ব্যাপার! তবু তাঁকে নিয়ে যেতে হল।

অন্তত পক্ষে ১৫টি' তাঁত মেসিন, এ ছাড়া সেলাই মেসিন, মোমবাতির মেসিন, স্কুলের অন্যান্য আসবাবপত্র, বইপুস্তক, আলমারী ইত্যাদি মিলে বিরাট মোটঘাট প্যাক করে ট্রেনে তারপর ঈশ্বরদি থেকে ১৮ মাইল লরী বোঝাই করে পাবনা জেলায় তাঁর ভাই রাজেন্দ্রকুমারের বাসায় নিয়ে গিয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল ৬টি মেয়ে ও হেডমিসট্রেস শকুন্তলা বাকচী। অপরাপর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী যাননি। পরিষদের অন্তর্গত বাণীপীঠ স্কুলের কিয়দংশ কলকাতাতেই রয়ে গেল। তার তত্ত্বাবধানে রইলেন জিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নামে একজন শিক্ষক। ফলে পাবনা স্কুলের জন্যে স্থানীয় শিক্ষয়িত্রী নিলেন শ্যামমোহিনী। কলকাতার ঐ ৬ জন ছাত্রী মনোরমা, রাধারাণী গুপ্ত, স্নেহলতা দাশ প্রভৃতি ছাড়া অনেক স্থানীয় ছাত্রীকে ঐ স্কুলে ভর্তি করে নিলেন তিনি।

শ্যামমোহিনীর ভাই তাঁর প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী সম্পুর্ণটা দিদিকে স্কুলের জন্য ছেড়ে দিলেন। সেই বাড়ীতেই স্কুল আর বোডিং দুই-ই আরম্ভ হল। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ওখানেই স্কুল ও বোডিং উভয়েই চলতে থাকল।

স্থানীয় লোকের আপত্তি

শ্যামমোহিনীর স্কুল পরিদর্শনে এলেন গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে তৎকালীন শিক্ষা কমিশনার বোদিও রহমান। তিনি স্কুল পরিদর্শন

করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ শিক্ষা কমিশনারের নিকট প্রবল অভিযোগ উত্থাপন করলেন এই বলে 'আপনি শ্যামমোহিনীর এই স্কুল পাঠিয়ে আমাদের স্কুল বন্ধ হবার উপক্রম করেছেন। এখন আমাদের স্কুলে মেয়ে থাকতে চায় না। এই স্কুলে কতরকম ব্যবস্থা—সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতি। মেয়েরা এই স্কুলেই ভর্তি হতে চায়।'

স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষের এই অভিযোগ শুনে বোদিও রহমান শ্যামমোহিনীকে অনুরোধ করলেন, "দেখুন, শ্যামমোহিনী দেবী, এখানকার স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করছেন—তাদের স্কুল নাকি বন্ধ হবার উপক্রম—সব ছাত্রীই আপনার স্কুলে ভর্তি হতে চায়—তা, আপনি এক কাজ করুন না—আপনি পুনরায় স্কুল কলকাতায় নিয়ে চলুন। আমরা ফায়ার ফাইটিং আর্টিকেলস যা লাগে দেব—ব্যাফ্‌ল্‌ ওয়াল দিয়ে সুরক্ষিত করে দেব।'

কলকাতায় স্কুল স্থানান্তরিত

শিক্ষা কমিশনারের পরামর্শ মত মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ঐ বৎসরের জুন মাসে আবার ঐ বিরাট লটবহর নিয়ে কলকাতায় স্কুল উঠিয়ে আনলেন শ্যামমোহিনী। বাড়ী আগেই ছিল। অর্ধেক প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও ছিল। যাবতীয় ফায়ার ফাইটিং দ্রব্য পাওয়া গেল। এগুলি পাওয়া গেল—বেঙ্গল কেমিক্যালে তখন বোমা পড়ে আগুন লাগলো, তার প্রতিরোধে যে সব সাজসরঞ্জাম ছিল সেগুলি এই স্কুলকে তাঁরা দান করলেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল বললেই আচার্য পি. সি. রায়ের কথা মনে পড়ে। স্বদেশবৎসল দেশহিতৈষী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ই সর্বপ্রথম বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেন। স্বদেশী দ্রব্য—যথা ওষুধপত্র, সুগন্ধী প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি তৈরী করে তা দেশের মানুষের মধ্যে প্রচার করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে এই প্রতিষ্ঠান আজও সুনামের সঙ্গে চলছে। পরাধীন দেশে বাক্যে ও কর্মে তাঁর

মত এমন জাতীয়তাবাদী নেতা সুদুর্লভ। তিনি বাঙালী জাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কত ভাবেই না চেষ্টা করে গেছেন। এ বিষয়ে তিনি কয়েকখানি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের বদান্যতার কথা স্মরণ করে শ্যামমোহিনী আচার্য পি. সি. রায়ের মহান ব্যক্তিত্বের কথা তাঁর 'দরদী' হৃদয়ের কথা বল্‌তে গিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, 'তাঁর সে আদর্শ দেশের মানুষ গ্রহণ করলে দেশের অশেষ উপকার হত।'

যাক্ কথায় কথায় অনেক কথাই এসে পড়ে।

প্রকাণ্ড ব্যাফল ওয়াল দিয়ে ৫৭।৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে স্কুল চলতে লাগল। অল্প কিছু সংখ্যক ছাত্রী নিয়েই স্কুল চলতে লাগল। এদিকে বোমার আতঙ্কে সব মানুষই প্রায় কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে, কলকাতায় যেন মড়ক লেগেছে এমনি ভাব তখন। যুদ্ধের ভয়ও কাটেনি—তখন পুনরায় কলকাতার বোমা পড়তে লাগল।

আবার কলকাতা থেকে নবদ্বীপ

গভর্ণমেণ্ট পুনরায় শ্যামমোহিনীকে আদেশ করলেন, স্কুল ও বোর্ডিং উঠিয়ে আপনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের কোন নিরাপদ স্থানে এক্ষণি নিয়ে যান। এখানে আর এক মুহূর্তও রাখবেন না—পুনরায় কলকাতা আক্রমণ হবে।

নিরুপায় শ্যামমোহিনী প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে কৃষ্ণনগর, প্রভৃতি স্থানে উপযুক্ত জায়গার সন্ধানে ঘুরতে লাগলেন যেখানে আবার স্কুল উঠিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু কোথাও তেমন স্থান পেলেন না। অবশেষে হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ডিসেম্বরের শেষে নবদ্বীপ ধামে দুটি বাড়ীর সন্ধান পেলেন এবং ঐ দুটি বাড়ী সঙ্গে সঙ্গে ভাড়া নিলেন তিনি। একাজে তাঁকে কৃষ্ণনগরের মহারাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী অনেক সাহায্য করেছিলেন। তিনি শ্যামমোহিনীকে নিয়ে কৃষ্ণনগরে অনেক বাড়ী খুঁজলেন কিন্তু এ কাজের উপযুক্ত একটি বাড়ীরও সন্ধান মিলল

না। মহারাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী শ্যামমোহিনীর পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অবশেষে নবদ্বীপের ঐ বাড়ীতেই স্কুল ও বোর্ডিং দ্বিতীয়বার কলকাতা থেকে তুলে আনলেন শ্যামমোহিনী।

গভর্ণমেণ্ট তো আদেশ দিয়েই খালাস। কিন্তু একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানকে এভাবে বার বার এক প্রান্ত থেকে আর এক সুদূর প্রান্তে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় নিয়ে যেতে যে পরিমাণ অমানুষিক পরিশ্রম ও নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে শ্যামমোহিনীকে, তা এবং গুরুভার বহন করার তাঁর শক্তির কথা ভাবলে স্বতঃই মুখ থেকে বের হয়—সত্যিই তুমি নারী মুক্তিযোদ্ধা মহীয়সী, তোমাকে নমস্কার করি। তোমার কথা কিছু লিখতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে একজন সৈনিক যেমন অবলীলায় খরস্রোতা নদী পার হয়—দুর্গম পাহাড়-পর্বত উতরায় কমাণ্ডারের নির্দেশে—তেমনি যে দেশের অশিক্ষা বিপুল সেই দেশের অশিক্ষা দূর করার ব্রত নিয়ে তার জন্যে এ কষ্ট স্বীকার যেন কিছুই নয় তাঁর কাছে—সামনে নদী পাহাড় পর্বত যা কিছু বাধাবন্ধন ছিন্ন করে তাঁকে এগিয়ে যেতেই হবে। সেই ভাবেই তিনি একাজে অগ্রসর হলেন।

নৌকো ভাড়া

বাড়ী, সে তো খুঁজে পেলেন, ভাড়াও করে এসেছেন, কিন্তু এত জিনিষপত্র নিয়ে যাবেন কিভাবে। কলকাতা থেকে নবদ্বীপ খুব একটা কাছাকাছি জায়গা নয়। ব্যাকুল হয়ে উপায় খুঁজতে লাগলেন শ্যামমোহিনী। কিন্তু হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি এলো তাঁর। নৌকোযোগেই জিনিসপত্তর নিয়ে যাবেন স্থির করলেন।

গঙ্গার ঘাটে নৌকা ভাড়া করতে গিয়ে বাবার কথা শ্যামমোহিনীর

মনে পড়ল। শৈশবে রাজসাহী থেকে করঞ্জায় আসতে নৌকোই পছন্দ করতেন তাঁর বাবা। পূজার ছুটিতে বিরাট বিরাট তিনখানা নৌকো বোঝাই জিনিসপত্তর সঙ্গে করে তাঁর বাবা তাঁদের নিয়ে আসতেন তিনদিন ধরে নদী ও বিল পার হয়ে বিশ্রাম নিতে করঞ্জায়।

সোজা গঙ্গার ঘাটে নিজেই চলে গেলেন শ্যামমোহিনী। সারি সারি নৌকো বাঁধা রয়েছে গঙ্গার পাড়ে। তিনি দেখেশুনে দু'খানি বড় বড় নৌকো ভাড়া করলেন।

কিন্তু এত আসবাবপত্র, সব তাতে গুছিয়ে নেওয়া তো আর সহজ কথা নয়। বোমার ভয়ে কলকাতা তখন প্রায় জনমানব-শূন্য। কাকে ডেকে একাজ করাবেন। শ্যামমোহিনী স্বয়ং একটি একটি করে প্রতিটি জিনিষ গুছিয়ে বাঁধাছাদা করতে থাকেন। স্কুলের মেয়ে থেকে তার প্রতিটি জিনিস তাঁর প্রাণের প্রাণ। একটি জিনিসও যাতে পড়ে না থাকে—চারিদিকে লক্ষ্য রেখে তিনি প্রত্যেকটি জিনিস গুছিয়ে নেন। কিন্তু এতে তিনি কোন কষ্ট অনুভব করেন না। চিরদিন কঠিন কাজ করে এসেছেন। এছাড়া প্রাণের তাগিদে যে কাজ সে কাজে নাকি কোন কষ্ট হয় না এই তো শ্যামমোহিনীর কর্ম্মময় জীবনের গুপ্তমন্ত্র। বারে বারে স্কুল স্থানান্তরিত করতে তাই তাঁর মনে কোন কষ্ট হয়নি।

নৌকোর মাঝি শ্রীহরি

সেদিনের সেই নৌকোর মাঝির কথা এখনও শ্যামমোহিনী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করলেন, "মাঝির নাম ছিল শ্রীহরি। সত্যিই যেন হরি শ্যামমোহিনীর এই বিপদে অগত্যা মধুসূদন দাদা হয়ে তাঁকে সাহায্য করতে এল। এত মূল্যবান জিনিসপত্র মাঝি একাই প্যাক করে নৌকোয় তুলল। পুনরায় ঠিকমত একাই সেই সমস্ত জিনিসপত্র নবদ্বীপধামে স্কুলবাড়ীতে পৌঁছে দিল। মিলিয়ে দেখা গেল একটা জিনিসও খোয়া যায় নি, যেমনি জিনিস তেমনি

আছে।” এমন মানুষের কথা আজও শ্যামমোহিনী পরম গর্বে, পুলকে-আনন্দে বললেন :

“আমার একজনও সাহায্যকারী লোক নেই—না শিক্ষয়িত্রী, না কেউ। কয়েকটা মাত্র অনুগত মেয়ে ছাড়া। কি করি, এত জিনিস-পত্তর, কিন্তু শ্রীহরি যেন সত্যি হরি হয়ে আমাকে উদ্ধার করলো। জিনিসপত্তর সব গোছগাছ করে প্রকাণ্ড দুটি নৌকা বোঝাই করে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে বলল, “এই যে জিনিসপত্তর সব দেখে নিন মা ; দেখে নিন। একটা জিনিসও শ্রীহরি মাঝির চোখের আড়াল হয় নি বা শ্রীহরি মাঝির হাত দিয়ে খোয়া যায়নি। যেমন তুলে এনেছি তেমনি পৌঁছে দিয়ে গেলাম।”

আসলে আসবাবপত্র যা কিছু সব শ্যামমোহিনীর সঙ্গে গোছগাছ করে দেবার কথা ছিল স্কুলের কেরাণী মহেন্দ্র চক্রবর্তীর। কিন্তু হঠাৎই তার কলেরার মত হল, ফলে শ্যামমোহিনী নৌকোর মাঝিকে গঙ্গার জগন্নাথ ঘাট থেকে ডেকে আনলেন। শ্রীহরি মাঝি সব জিনিসই গুঁছিয়ে নৌকায় বোঝাই করতে থাকে। শ্যামমোহিনী দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের স্কুলবাড়ীতে বসে রইলেন। আর বলতে লাগলেন,—‘মাঝি, তুমি আমার সঙ্কটে মধুসূদন স্বয়ং শ্রীহরি।’

মালপত্র যা কিছু নৌকো বোঝাই করে শ্রীহরি রওনা হয়ে গেল আর শ্যামমোহিনী হাওড়া থেকে মেয়েদের নিয়ে ট্রেনে করে নবদ্বীপ পৌঁছে দেখলেন—তাঁর পৌঁছানোর পূর্বেই জিনিসপত্তর পৌঁছে গেছে এবং একটি জিনিসও খোয়া যায়নি বা ভাঙেনি-চোরেনি। শ্রীহরি মাঝির এমনি সততা এবং সাধুতা আর কর্তব্যপরায়ণতা দেখে শ্যামমোহিনী এত কষ্টের মধ্যেও সান্ত্বনা পেলেন।

গামতলায় স্কুল আরম্ভ

আসবাবপত্র সহ নবদ্বীপে পৌঁছেই আবার স্কুলগৃহ সজ্জিত করার দিকে মনোনিবেশ করলেন শ্যামমোহিনী। পাবনায় স্কুল চলাকালে

ঋষিকেশ অধিকারীকে য়্যাকাউণ্টেণ্ট নিযুক্ত করেছিলেন, পুনরায় তাঁকে খবর দিয়ে নবদ্বীপ আনালেন। নতুন করে দশজন স্থানীয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত করলেন। সমস্ত ঠিকঠাক করে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে স্কুল আরম্ভ করলেন। নবদ্বীপ গামতলা রোডে গোবিন্দজী মন্দিরের লাগোয়া যে দুটি বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন ঐ বাড়ী দুটিতে স্কুল ও বোর্ডিং উভয়ই চলতে লাগল।

দুর্গামণি দেবীর স্কুল সংযুক্তিকরণ

স্কুলের ক্লাশ আরম্ভ হল। আবার স্কুল ইন্সপেকশনে আসবেন ইন্সপেক্টরেস। কিন্তু তখনও ছাত্রী তেমন সংগ্রহ করতে পারেননি শ্যামমোহিনী। অতএব চলল তাঁর ছাত্রী সংগ্রহের কাজ। নাহলে যে সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে না—স্কুলের গ্রাণ্ট কাটা যাবে।

সে সময়ে নবদ্বীপে একটি ছোট্ট বালিকা বিদ্যালয় ছিল। স্কুলটি ছিল দুর্গামণি দেবীর স্কুল। স্কুলটি ছিল প্রাইমারী। ঐ স্কুলটি তাদের ছাত্রীদের নিয়ে শ্যামমোহিনীর বাণীপীঠ গার্লস হাইস্কুলে যোগ দেওয়ায় ছাত্রী সংগ্রহের কোন সমস্যা রইল না। সঙ্গে বোর্ডিংও চলল। 'দুর্গামণি দেবীর সহায়তায়ই এত দ্রুত নবদ্বীপে আমার বাণীপীঠ স্কুল গড়ে উঠল' বলে দুর্গামণি দেবীর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানালেন শ্যামমোহিনী।

স্কুল পরিদর্শন

কলকাতায় বোমা পড়ার পর ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪২ সালের জুন মাস পর্যন্ত কলকাতা থেকে পাবনা—পাবনা থেকে কলকাতা, পুনরায় কলকাতা থেকে নবদ্বীপে যুদ্ধের আতঙ্ক মাথায় নিয়ে স্কুল ও বোর্ডিং আনা নেওয়ায় যে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল এবং এ কাজে যে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল শ্যামমোহিনীকে—একমাত্র মনের জোর, কর্তব্যে অবিচল

নিষ্ঠা ছিল বলেই তাঁর পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব হয়েছিল। একাজ তিনি অতিশয় আনন্দে ও উৎসাহভরে করেন এবং প্রতিবারই স্কুল পরিদর্শনের সম্মুখীন হয়ে তাকে উপযুক্ত করে তুলে ধরতে সক্ষম হন।

কথানুযায়ী নবদ্বীপে বাণীপীঠ স্কুল পরিদর্শনে এলেন য্যাসিসট্যাণ্ট ইন্সপেক্টরেস মীরা হালদার। স্কুল আরম্ভ হয়েছে মাত্র জানুয়ারীতে আর পরিদর্শনে এলেন তিনি ফেব্রুয়ারীতে। পরিদর্শন করে তিনি সুন্দর রিপোর্ট লিখে দিলেন, ফলে মার্চ মাসেই স্কুলের গ্রাণ্ট পেলেন শ্যামমোহিনী। স্কুল চলতে লাগল। কিন্তু এখানেও স্থানীয় স্কুল ছেড়ে মেয়েরা এই বাণীপীঠ স্কুলে ভর্তি হতে থাকল। এখানে পড়াশুনা ছাড়াও সঙ্গীত, সেলাই, তাঁত শিল্প বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে দেখে দলে দলে ছাত্রী অন্য স্কুল ছেড়ে এসে শ্যামমোহিনীর স্কুলে ভর্তি হতে থাকে। প্রধান পরিদর্শিকা সুনীতিবালা গুপ্ত জুন মাসে স্কুল পরিদর্শনে এলেন। পরিদর্শন করে তিনি অত্যন্ত প্রীত হলেন। লিখে দিলেন—স্কুল খুবই ভালই চলছে।

স্থানীয় স্কুলকর্তৃপক্ষের অভিযোগ

কিন্তু এখানেও সেই একই অভিযোগ। স্থানীয় স্কুল বন্ধ হবার অভিযোগ তুললেন স্থানীয় স্কুলকর্তৃপক্ষ প্রধান পরিদর্শিকা সুনীতিবালা গুপ্তের নিকট। এই অভিযোগ শুনে সুনীতিবালা গুপ্ত শ্যামমোহিনীকে বললেম, "এক কাজ করুন, কলকাতায় এখন গণ্ডগোল কম, বোমার ভয় নেই, আপনি আবার কলকাতায়ই স্কুল নিয়ে চলুন। কারণ আপনার স্কুলের এত সুখ্যাতি হয়েছে যে, অন্য স্কুলের মেয়েরা আপনার স্কুলেই এসে ভর্তি হচ্ছে। স্থানীয় ঐ স্কুলের কর্তৃপক্ষ অভিযোগ তুলেছে তাদের স্কুল বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে বলে। এমতাবস্থায় আপনি কলকাতায়ই স্কুল নিয়ে চলুন।"
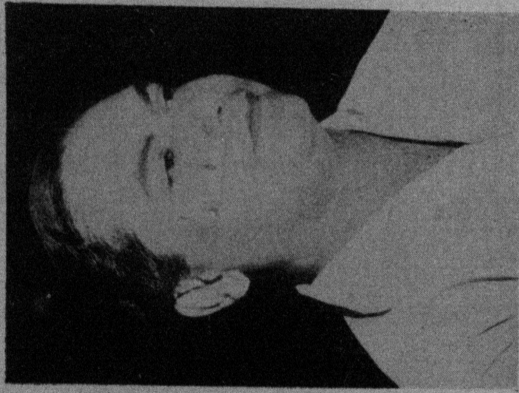
শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র ভট্টাচার্য (এক্স অফিসিও ডি, ডি, পি, আই, এবং স্পেশাল অফিসার, সেকেণ্ডারী এডুকেশন। ইনি পরিষদের পৃষ্ঠপোষক)
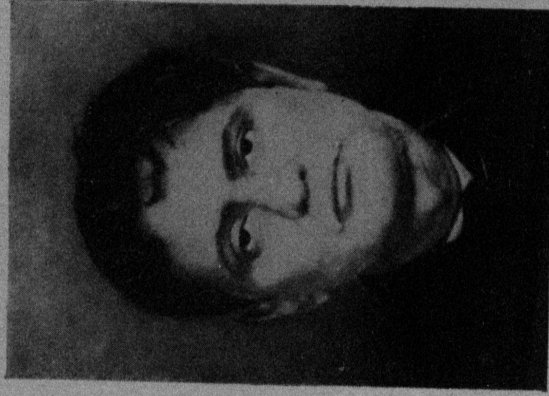
৺রাজেন্দ্র কুমার চৌধুরী প্রবীণ ও বিখ্যাত আইনজ্ঞ

পরিষদের ছাত্রীদের নাটকাভিনয়

পরিষদের ছাত্রীদের চরকায় সুতা কাটা ও তাঁত শিক্ষা

আবার শ্রীহরির শরণাপন্ন

প্রধান পরিদর্শিকার নির্দেশে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে আবার সব তল্পি-তল্পা নিয়ে স্কুল কলকাতায় স্থানান্তরিত করতে হবে। কিন্তু পুনরায় সেই সমস্যা। কি করে নেওয়া হবে স্কুল ও বোর্ডিং-এর এত সমস্ত আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম, তাঁত মেসিন, সেলাই কল, মোমবাতি মেসিন প্রভৃতি। অগত্যা বিপদে শ্রীমধুসূদন শ্রীহরি মাঝির শরণাপন্ন হলেন আবার শ্যামমোহিনী।

সব শুনে একগাল হেসে শ্রীহরি মাঝি বললে, আপনার কোন চিন্তা নেই মা। যতক্ষণ এই শ্রীহরি মাঝি আছি একটা জিনিষও ভাঙবে না বা খোয়া যাবে না। আগের মতই নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেব।

ঊনবিংশ অধ্যায়

কলিকাতায় স্কুল স্থানান্তরিত

১৯৪২ সাল জুলাই মাস। নবদ্বীপ থেকে স্কুল কলকাতায় আনলেন শ্যামমোহিনী। আবার ৫৭।৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে পূর্বের বাড়ীতেই স্কুল ও বোর্ডিং চলতে থাকল। অবশ্য এই বাড়ীতেই অল্প কিছু ছাত্রী নিয়ে ঐ স্কুলের হেড মাষ্টার জিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত স্কুলটি কোনরকমে চালাচ্ছিলেন। এখন নবদ্বীপ থেকে স্কুল পুনরায় কলকাতায় তুলে আনায় স্কুলের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হল।

কিন্তু নবদ্বীপ থেকে স্কুল উঠিয়ে এনেও শ্যামমোহিনীর রেহাই ছিল না। এই সময়ে তাঁকে নবদ্বীপ আর কলকাতায় দুই জায়গায়ই স্কুল চালাতে হয়। ফলে দুই জায়গার স্কুলের তত্ত্বাবধান ও ব্যয়ভার সামলাতে তাঁকে কঠোর শ্রম স্বীকার ও ভাবনাচিন্তার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়। কারণ নবদ্বীপের স্কুলে যে সব ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছিল সেই সব ছাত্রীদের এবং শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদের বৎসরের মাঝখানে তো আর ত্যাগ করা যায় না। অতএব তাদের জন্য ঐ স্কুলটি খুলে রাখতে বাধ্য হলেন শ্যামমোহিনী। ঋষিকেশ অধিকারীকে ওখানে রেখে এলেন তিনি ওখানকার ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের নিয়ে ঐ স্কুলটি ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চালাবার জন্যে। কিছুদিন পর পরই শ্যামমোহিনীকে নবদ্বীপ গিয়ে স্কুলটি দেখে আসতে হত যাতে কোনো বিশৃঙ্খলা না দেখা দেয় এজন্য।

সে যাহোক, স্কুলটি কলকাতায় এসে ভালভাবেই চলতে লাগল এবং এই সময় যুদ্ধভীতি অনেকখানি কমে যাওয়ায় কলকাতায় আবার লোক ফিরে আসতে লাগল এবং ক্রমেক্রমে স্কুলে ও বোর্ডিংএ ছাত্রীসংখ্যা বাড়তে থাকল। জিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তখনও ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। তারপর ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী

মাস থেকে প্রধান শিক্ষয়িত্রী হয়ে এলেন সুপ্রীতি সান্যাল। তিনি এখনও (১৯৭৫) সসম্মানে ঐ পদে বহাল আছেন।

এখন পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভাগগুলির ভিন্নভিন্ন সংক্ষিপ্ত বিবরণ একান্ত প্রয়োজনবোধে নিম্নে দিলাম। এতে কিছুটা উপলব্ধি করা যাবে দীর্ঘ সংগ্রাম ও বহুবিধ সঙ্কট আবর্তের মধ্য দিয়েও আগাগোড়া কি সুমহান উত্তম কাজ করে চলেছেন শ্যামমোহিনী।

বাণীপীঠ গার্লস হাইস্কুল

প্রতি বৎসরই এই স্কুল থেকে cent percent হিসাবে মেয়েরা পাশ করে আসছে। অভিজ্ঞ ট্রেণ্ড শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী পিতামাতার ন্যায় যত্নে ছাত্রীদের সুশিক্ষা দান করেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকগণ ছাত্রীদের পড়িয়ে এই স্কুলের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেন।

এছাড়া অতিরিক্ত বিষয় ফার্স্ট এড, হোম নার্সিং, নানাবিধ শিল্প, শিবপূজা, স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি ইচ্ছাধীন বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা যেমন ছিল তেমনি আছে।

বাণীপীঠ শিল্প বিদ্যালয় (১৯৩৪)

এই বিভাগে রেশম, পশম ও তূলার সূতা দ্বারা নানাবিধ তাঁত বয়ন ও হোসিয়ারী মেসিনের কাজ, কাশ্মীরী শালের কাজ এমব্রয়ডারী, দর্জির কাজ, উলের কাজ, চামড়ার কাজ, মাটির খেলনা প্রস্তুত, আলপনা ও চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

শর্ট ম্যাট্রিক বিভাগ

সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বয়স্কা মেয়েদের অতি অল্প সময়ে নিম্ন শ্রেণী হতে ম্যাট্রিক ও ট্রেনিং প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করানো হয়।

বাণীপীঠ সঙ্গীত সঙ্ঘ (১৯৩৮)

এই বিভাগে অভিজ্ঞ সুরশিল্পীগণ কর্তৃক রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক বাংলা গান, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, কীর্তন, নানাবিধ যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

ছাত্রীনিবাস

এখানে পরিষদের সকল বিভাগের মেয়েদের নিরাপদে থাকবার ব্যবস্থা আছে। বিধবাদের জন্য পৃথক নিরামিষ আহারের ব্যবস্থাও আছে।

সেবা বিভাগ (১৯৩৫)

১৯৩৫ সালে পরিষদ গঠনের প্রথম বৎসর থেকেই কয়েকটি করে অভাবগ্রস্তা মহিলাকে এখানে বিনা বেতনে আহার ও বাসস্থান দিয়ে শিক্ষাদান করা হতে থাকে। এরপর ১৯৪৩ সালে সারা বাংলাদেশে যে বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাতে দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরাই সমধিক দুর্দশাগ্রস্ত হয়। এদের লেখাপড়া ও অর্থকরী শিল্প শিক্ষাদান করতঃ সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালে এই বিভাগটি পরিবর্দ্ধিত করা হয়।

লেডী কেসির আগমন

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তৎকালীন বাংলাদেশের মহামান্য গভর্ণর-পত্নী লেডী কেসি পরিষদ পরিদর্শন করতে এলেন। তিনি পরিষদের কার্যাবলী দেখে খুব সন্তুষ্ট হন এবং গভর্ণমেন্ট রিলিফ বিভাগ থেকে মাসিক ৩০০ টাকা হিসাবে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। পরে লেডী কেসিরই অনুগ্রহে শিল্প বিভাগ পরিবর্দ্ধিত করবার জন্যে গভর্ণমেন্টের উক্ত রিলিফ বিভাগ এককালীন আঠার হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন, কিন্তু দেশবিভাগের ফলে সে সাহায্য আর পরিষদ পেল না।

তখন এই বিভাগে পূর্বের দুঃস্থা মেয়ের সংখ্যা ২০ থেকে বেড়ে ৩৫-এ দাঁড়ায়। এই দুঃস্থা মহিলাগণ বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান পেয়ে শিক্ষালাভ করত। আর এদের সমুদয় ব্যয়ভার শ্যামমোহিনী নিজে বহন করতেন। বাইরের প্রায় ১৫০টি দুঃস্থা মহিলাও এই বিভাগ হতে বিনা বেতনে লেখাপড়া ও শিল্প শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত।

এই বিভাগে দর্জির কাজ, বয়নশিল্প, হোসিয়ারী, নানাবিধ সেলাই, লেডী ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমা কোর্স, মাটির খেলনা তৈরী, চামড়ার কাজ, এমব্রয়ডারী প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। ঐ সকল শিল্প কাজ করে মেয়েরা উপযুক্ত মজুরীও পেত।

হোসিয়ারী

রিলিফ ডিপার্টমেন্ট হতে উক্ত মাসিক ৩০০ টাকা সাহায্য ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে যায়। এ পর্যন্ত যে টাকা পাওয়া গেছে তা দিয়ে ইতিমধ্যে ৭টি হোসিয়ারী মেসিন ক্রয় করে মোজা প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। স্থানাভাবে ও অর্থাভাবে ঐ স্কীমের পরবর্তী পরিকল্পনা, যথা—সাবান প্রস্তুত, কাঠ ও কাপড়ের খেলনা তৈরী, এনভেলপ তৈরী, কার্ডবোর্ড বকস্ তৈরী, মোমবাতি তৈরী, অটোমেটিক তাঁতের কাজ প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় নি। কিন্তু পরবর্তী কালে এ সমস্ত কাজই তিনি নিজ ব্যয়ে করতে সক্ষম হয়েছেন এবং অদ্যাবধি সে সব কাজ অপ্রতিহতভাবে চলেছে।

লেডী কেসির ইচ্ছানুরূপে পরবর্তী স্কীম ১০০টি দুঃস্থা মেয়েকে বিনা ব্যয়ে ঐ পরিকল্পিত হোমে রেখে শিক্ষাদান করাও স্থানাভাবে এবং অর্থাভাবে সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরিষদের নিজস্ব বাড়ী হলে, পরে তা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে এইসব দুঃস্থা মেয়ের সংখ্যা অন্যূন ৫০০।

বাণীপীঠ হিন্দী শিক্ষা বিভাগ (১৯৪৫)

১৯৪৫ সালে সওয়ালকা ট্রাষ্ট ফাণ্ডের সাহায্যে হিন্দী ক্লাশ আরম্ভ হয় এবং পরিষদের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রীগণ ব্যতীত বাইরের

ছাত্রীগণও হিন্দী ভাষা শিক্ষালাভ করে চলেছে। ১৯৪৯ সাল হতে ঐ বিভাগের ব্যয় পরিষদ হতেই বহন করা হয়।

অদ্যাবধি প্রায় সহস্রাধিক মহিলা এই প্রতিষ্ঠানের নানা বিভাগ হতে শিক্ষালাভ করে শিক্ষয়িত্রী, চিকিৎসাকারিণী প্রভৃতি হয়েছে এবং দেশে শিক্ষাবিস্তার করছে। অনবরত উন্নতি হচ্ছে।

মন্দির বিভাগ

এখানে প্রতিদিন দেবদেবীর মূর্তিপূজা, ভোগ ও আরতির ব্যবস্থা আছে। স্কুলের আরম্ভে ও ছাত্রীনিবাসে সন্ধ্যাকালে প্রতিদিন স্তোত্রপাঠ ও ধর্মচর্চার মধ্য দিয়ে এখানকার ছাত্রীদের জীবন গঠিত হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশস্ত স্থানে একটি সার্বজনীন দেব মন্দির ও তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতি স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। দানশীল ও ধর্মপ্রাণ নরনারীদের সাহায্য পেলে মন্দির নির্মাণ করে আরও দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং পূজা ও ভোগের এরূপ ব্যবস্থা করা হবে যাতে অভাবগ্রস্তা মেয়েরা ঐ প্রসাদ গ্রহণ করে বিনা ব্যয়ে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষালাভ করতে পারে।

এই জনহিতকর নারী প্রতিষ্ঠানটির গৃহ ও মন্দির নির্মাণের জন্য দেশের ধনশালী, দানশীল নরনারীগণের সাহায্যের জন্যে এই পরিষদ আবেদন জানাচ্ছে। যে কেউ অর্থ দিয়ে জমি দিয়ে বাড়ী দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। তদুদ্দেশ্যে যিনি যা দান করবেন তা সাদরে গৃহীত হবে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

উপরোক্ত বিভাগগুলি পরিষদের ১৯৪৮ সালের বিবৃতি পত্রের হিসাব অনুযায়ী। এরপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের অন্তর্গত বহু শাখাপ্রশাখার অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং ক্রমাগত পরিষদের কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে। সেই সব ক্রমোন্নতির কথাই আমাদের লেখার উপজীব্য। এই

সঙ্গে তৎকালীন বাণীপীঠ গার্লস হাইস্কুল ছাড়াও উপরোক্ত প্রধান প্রধান সংস্থার কার্যনির্বাহক কমিটির নাম এখানে উল্লেখ করছি।

বাণীপীঠ শিল্প বিদ্যালয়

সভানেত্রী—	অনুরূপা দেবী
সহঃ সভানেত্রী/সভাপতি—	কমলা গুপ্ত
	নলিন চন্দ্র পাল
	গণেশপ্রসাদ সরফ
সদস্য/সদস্যা—	সুরেশচন্দ্র গোস্বামী
	রাধিকা নন্দী
	নিতাইচরণ লাহা
	অণিমা চৌধুরী
	সুপ্রীতি সান্যাল
সুপারিণটেণ্ডেণ্ট—	কুসুম কুমারী বসু
সম্পাদিকা—	শ্যামমোহিনী দেবী

বাণীপীঠ সঙ্গীত সঙ্ঘ

সভানেত্রী—	অনুরূপা দেবী
সহঃ সভানেত্রী—	লেডী ননীবালা ব্রহ্মচারী
	সরলাবালা সরকার
সদস্য/সদস্যাবৃন্দ—	মায়া দে
	পি. চৌধুরী
	নলিনী দত্ত
	কে. বসু
	ধীরেন ঘটক
সম্পাদিকা—	শ্যামমোহিনী দেবী

বাণীপীঠ শিল্প বিত্তালয়

সভানেত্রী— অনুরূপা দেবী
সুপারিণটেণ্ডেণ্ট— শ্যামমোহিনী দেবী
সহঃ সুপারিণটেণ্ডেণ্ট— কুসুম কুমারী বসু
সদস্যা— প্রফুল্ল নলিনী দেবী
প্রতিভা বসু

বাণীপীঠ সঙ্গীত সঙ্ঘ ও ভবানীচরণ লাহা (১৯৩৮)

নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদ গঠনে যাঁদের বিশেষ অবদান রয়েছে, তাঁদের সকলের নাম লেখা এখানে সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁদের স অবদানকে শ্যামমোহিনী আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, "লোকে বলে কলকাতা খারাপ। কিন্তু আমি এসে সব ভাল পেয়েছি। যাতে হাত দিয়েছি তাতে সফল হয়েছি। যার কাছে গেছি তার কাছে সাহায্যসমাদর পেয়েছি। সরকারী সাহায্যও পেয়েছি।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বাণীপীঠ সঙ্গীত সঙ্ঘের গোড়ার কথা বলতে গিয়ে বললেন, "বাণীপীঠ সঙ্গীত সঙ্ঘ স্থাপিত হয় ১৯৩৮ সালে। এর আরম্ভ থেকে যাঁরা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং যাঁদের অবদান ও সক্রিয় সাহায্য-সহানুভূতিতে এই বাণীপীঠ সঙ্গীত সঙ্ঘ ফুলে ফলে বর্দ্ধিত হয়—তাঁরা হলেন ভবানীচরণ লাহা, সংস্কৃতির ধারক বাহক ঠাকুর পরিবারের বধূ কমলা ঠাকুর প্রভৃতি।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের (অধুনা বিধান সরণী) ঠনঠনে কালীবাড়ীর একান্ত সন্নিকটস্থ বিখ্যাত লাহা পরিবারের শিল্পসংস্কৃতি-অনুরাগী ভবানীচরণ লাহা সঙ্গীতের অনেক যন্ত্রপাতি হারমোনিয়াম, তানপুরা, সেতার, এসরাজ, গীটার প্রভৃতি ও তৎসহ ৫০০ টাকা দান করলে তাঁরই বদান্যতায় সঙ্গীত বিভাগ খুললেন শ্যামমোহিনী। সঙ্গীত শিক্ষার শিক্ষক ছিলেন তৎকালীন সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ সাগর লাহিড়ী, যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

কমলা ঠাকুর

এরপর বাণীপীঠ সঙ্গীত সঙ্ঘে এসে যোগদান করলেন কমলা ঠাকুর। ইঁনি এসে বাণীপীঠ সঙ্গীত বিভাগে যোগদানের পর অভিজাত ঘরের মেয়েরা এসে সঙ্গীত বিভাগে ভর্তি হতে লাগলেন। সঙ্গীত শিক্ষা বিভাগের নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ছাত্রীসংখ্যার আধিক্য দেখা দিল।

কমলা ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী। শ্যামমোহিনী ও কমলা ঠাকুর এঁরা উভয়েই তখন সঙ্গীত শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সম্পাদিকা ছিলেন।

সঙ্গীত ক্লাশ বসত অপরাহ্ণ দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত প্রতি শনি ও রবিবার। তিনি ঐ নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকতেন। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে তিনি ঐ বিভাগটি পরিচালনা করতেন। নিজ হাতে মেয়ে ভর্তি করতেন। সম্ভ্রান্ত বনেদী ঘরের মেয়েরা—যারা সঙ্গীত শিখতে উৎসুক—তাদিগকে বাড়ী থেকে আনার ব্যবস্থা করে তিনি এখানে ভর্তি করতে লাগলেন। এদের বাড়ী থেকে আনার জন্য গাড়ী দরকার—তিনি ও শ্যামমোহিনী মিলে এক-এক হাজার করে দু'হাজার টাকা দিয়ে একখানা পুরাতন গাড়ী কিনে ফেললেন। সেই গাড়ী করে মেয়েদের আনা নেওয়া হত। ৫।৫ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শেখাতেন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে কমলা ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে সঙ্গীত শিক্ষা বিভাগটি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছোয়।

কমলা ঠাকুরের সঙ্গীত সঙ্ঘে আসার মূলে ছিলেন তাঁর শাশুড়ী হেমলতা ঠাকুর। বাণীপীঠ স্কুল প্রতিষ্ঠার (১৯৩৪) প্রথম থেকে হেমলতা ঠাকুর এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সঙ্গীত শিক্ষার স্কুল খুলতে গিয়ে (১৯৩৮) শ্যামমোহিনী নিজে গিয়ে হেমলতা ঠাকুরকে অনুরোধ করলেন এই বিভাগের সক্রিয় সদস্য হবার জন্যে।

শ্যামমোহিনীর কথা শুনে তিনি বললেন, “দেখ, আমি বৃদ্ধা হয়ে পড়েছি, এছাড়া সরোজনলিনীতেও যুক্ত আছি—এ কারণে আমি তোমার আর কিছু করতে পারব না। তুমি বরং আমার বৌমাকে নাও। বৌমা আমার অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যুক্ত নেই, ওকেই নাও তুমি।”

তখনও পর্যন্ত কমলা ঠাকুর কোনখানে বের হতেন না। এখন হেমলতা ঠাকুরের কথামত শ্যামমোহিনী কমলা ঠাকুরের নিকট গিয়ে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তিনি তাঁর সম্মতি দিলেন। শুধু সম্মতি দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি বাণীপীঠ সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের যুগ্ম সম্পাদিকা হয়ে এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা করতে লাগলেন।

প্রসঙ্গক্রমে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির কথা কিছু না বললে হেমলতা ঠাকুরের বাণীপীঠ সঙ্গীত শিক্ষা সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত না থাকার কারণ উপলব্ধি করা যাবে না। ১৯২৫ সালে নারী কল্যাণকামী সরোজনলিনীর অকাল মৃত্যুতে তাঁর স্বামী তৎকালীন আই. সি. এস. ও ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত তাঁর স্ত্রীর নামে এই সমিতি স্থাপন করেন। এই বৎসরই (১৯৭৫) সমিতির পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি হল।

এখানেও শিল্পশিক্ষালয়, সিনিয়র টীচার্স ট্রেনিং কলেজ, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতি কেন্দ্র আছে। বাইরের বিভিন্ন স্থানেও এর শাখা অফিস আছে। হেমলতা ঠাকুর এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় তিনি শ্যামমোহিনীর পরিষদে নিজে না থেকে পুত্রবধূ কমলা ঠাকুরকে পাঠান।

ত্রিংশ অধ্যায়

পরিষদের আবাসের প্রচেষ্টায় শ্যামমোহিনী

এই সময়ে শ্যামমোহিনীর নিখিল ভারত নারীশিক্ষা পরিষদ শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে পূর্ণোদ্যমে কাজ করে চলছিল। বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চলে এসে এতদিনে তার একটি স্থিতিও এসেছে। তাই নিজস্ব আবাসের আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে-ছিলেন শ্যামমোহিনী। এই সময়ে দেশের রাজনৈতিক আকাশে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছিল দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্বন্ধে। দেশের স্বাধীনতা যখন প্রায় করায়ত্ত, দেশের স্বাধীনতা যখন হাতের মুঠোর মধ্যে প্রায়—তখনই হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি হল। বিভেদপন্থী ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের উস্কানি দিয়ে উভয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিলেন। কিন্তু কেন এই বিভেদ?

১৯০৬ সালে ভারতে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। ঐ সালে লর্ড মিণ্টোর উস্কানিতেই আগা খাঁ মুসলমানদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্ব দাবী করেছিলেন। আর সেই থেকেই ইংরেজ সরকার ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল পলিসির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ জিইয়ে রেখে-ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার দেখলেন সে অস্ত্র প্রয়োগের এই তাঁদের সুবর্ণ সুযোগ। এখন সেকাজে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন তাঁরা।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট নানা কারণে দেশের শাসনভার হস্তান্তর করতে বাধ্য হলেন ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁরা ভারতবর্ষকে ভেঙে দুভাগ করে দিয়ে গেলেন। জন্ম হল ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ করে পাকিস্তান। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সিমলায় বৈঠক ডাকলেন গান্ধীজী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের নিয়ে। মুসলীম লীগের প্রতিনিধিত্ব করেন মহম্মদ আলি জিন্না। জিন্না সাহেব দাবী জানালেন নবগঠিত একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মুসলমান নেতৃবৃন্দের নাম

তিনিই পেশ করবেন। আর এখানেই ইংরেজের কূটনৈতিক চালের জয়লাভ হল। মহম্মদ আলি জিন্নার এ প্রস্তাবে গান্ধীজী, জওহরলাল নেহেরু প্রভৃতি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আপত্তি জানালেন। কিন্তু জিন্না সাহেব অনড়, অটল। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন মুসলিম লীগ। তাঁরা ভারত বিভাগের দাবী তুললেন; ভারতের মুসলিম অঞ্চলগুলি নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের কথা বললেন। তাঁদের প্রস্তাব কার্যকরী হলেই জিন্না সাহেব তার সর্বময় কর্তা হতে পারবেন।

পাকিস্তানের জন্ম

ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করার পেছনে ব্রিটিশ সরকারের ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল পলিসি কাজ করছিল—জিন্না হলেন তার উপলক্ষ মাত্র। আসলে ব্রিটিশ সরকারের এই ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল পলিসির ফলে ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করে জন্ম হল পাকিস্তান নামে নতুন রাষ্ট্র। আর এই পাকিস্তানের জন্ম হবার প্রাক্কালে কুচক্রী ইংরেজ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে ভারতবাসীরা যে দেশ শাসনের উপযুক্ত নয় এই অজুহাত দেখিয়ে আরও কিছুদিন ভারতবর্ষে তাদের শাসনের নামে শোষণ কায়েম করার মতলবে ছিলেন।

কিন্তু এই সময়ে ব্রিটেনে রক্ষণশীল চার্চিল সরকারের পতন হল। চার্চিল ভারতবাসীকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। কিন্তু কেন তার সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি। এ সম্বন্ধে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে চার্চিলের কথোপকথন নিম্নে দেওয়া হল :

সম্ভবতঃ ১৯৫২ সালে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকে যোগদান উপলক্ষে পিতা জওহরলালের সঙ্গে গিয়ে অভিষেক উৎসবে চার্চিলের পাশে বসেন ইন্দিরা গান্ধী।

আর ইন্দিরা গান্ধীর দিকে ফিরে উইনষ্টন চার্চিল বলেন, "এটা ভাবতে অবাক লাগে আমরা কিছুদিন আগেও পরস্পরকে ঘৃণা করতাম।"

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী বিনীতভাবে উত্তর দেন, "আমরা কিন্তু আপনাদের ঘৃণা করি না।"

চার্চিল বললেন, "আমি করি, কিন্তু কেন তা জানি না।"

রক্ষণশীল দলের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের পরিবর্তে লেবার পার্টির জয়লাভ হলে এই সময়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হলেন ক্লেমেণ্ট এটলী। এটলী প্রধানমন্ত্রী হয়েই ঘোষণা করলেন—"ভারতবর্ষকে সংবিধান গঠনের দ্বারা স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।"

এই ক্ষমতা হস্তান্তরের মূল কারণ ছিল একদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান, ১৯৪১ সালে বহির্দেশে গিয়ে আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন ও ইংরেজ সৈনিকদের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধ, অন্যদিকে ১৯৪৬ সালে বোম্বাইয়ে নৌ-সেনাদের বিদ্রোহ ঘোষণা। উল্লিখিত সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণাই বাধ্য করল ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণে।

অন্যদিকে ক্রমাগত দেশব্যাপী সহিংস-অহিংস আন্দোলন ইংরেজ সরকারকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিল—ভারতে আর তাদের রাজত্ব চালান সম্ভব নয়। ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেই হবে। যত শীঘ্র করা যায় ততই মঙ্গল। তবু শেষ চেষ্টা চালালেন তাঁরা হিন্দু-মুসলমান তিক্ততা সৃষ্টি করে যদি আরও কিছুদিন এ দেশকে শাসনের নামে শোষণ করা যায়। আগেই সে পথ তাঁরা প্রশস্ত করে রেখেছিলেন মুসলমানদের পৃথক রাজ্য প্রদানের প্রলোভন দেখিয়ে।

ডাইরেক্ট এ্যাকশন

তারই ফলস্বরূপ মুসলীম লীগ ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট 'ডাইরেক্ট এ্যাকশনের' দিন ধার্য করলেন। তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মিঃ হাসান সোহরাওয়ার্দি। তাঁরই সক্রিয় অংশ গ্রহণে কলকাতা মহানগরীর বুকেই বীভৎস 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' আরম্ভ হয়ে গেল। কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশ

সর্বাধিক প্রগতিশীল ছিল এবং কি রাজনৈতিক আন্দোলন কি চিন্তাধারা সর্বব্যাপারে পুরোভাগে ছিল বাঙালীই। এই বাঙালীকে কূটনৈতিক জালে ফেলে কাজ হাসিল করতে হবে এই উদ্দেশ্যেই তারা এই পন্থা নিয়েছিলেন। ফলে হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমান, মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু ভাই-ভাই ভুলে দাঁড়িয়ে গেল আর পৈশাচিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখম, মারামারি-কাটাকাটি, লুঠতরাজ-নারীনির্যাতন প্রভৃতি শুরু হয়ে গেল। একনাগাড়ে কয়েকদিন ধরে বীভৎস এই 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' চলতে থাকল। ভয়াবহ লোমহর্ষক সে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কত মানুষ যে নিহত হয়ে প্রকাশ্য রাজপথে পড়ে রইল তার ইয়ত্তা নেই। স্তূপীকৃত মৃত দেহের দুর্গন্ধে কলকাতা সহর কুরুক্ষেত্রের শ্মশানে পরিণত হল। প্রতিমুহূর্তে প্রাণনাশের আশঙ্কায় কেউ ঘরের বাইরে যেতে সাহস পায় না। আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু রইল না। কলকাতার আইন জঙ্গলের আইনে পরিণত হল।

দেখতে দেখতে ভারতবর্ষের সর্বত্র এই আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িকতার নাগিনীনিঃশ্বাসের বিষবাষ্পে ভরে গেল। ভাই হয়ে ভায়ের প্রাণনাশের চণ্ডনীতির ফলে জাতীয়তাবাদী শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ—গান্ধীজী থেকে জওহরলাল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রভৃতি আর স্থির থাকতে পারলেন না। নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে তাঁরা এই হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন নিবেদন করতে লাগলেন। গান্ধীজী অনশন শুরু করলেন। কলকাতায় এসে মুসলমান-অধ্যুষিত বেলেঘাটায় কিছুদিন থাকলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়—এই সময়ে গান্ধীজী কলকাতায় মহিলাদের নিয়ে এক প্রার্থনা সভা করেন। এই প্রার্থনা সভায় তিনি মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে এই সর্বনাশা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাদের সর্ব শক্তি প্রয়োগ করতে উপদেশ দেন। গান্ধীজী মেয়েদের শক্তির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং এজন্যে তিনি তাঁর

অসহযোগ আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ পর্য্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে যোগদানের জন্যে মেয়েদের আহ্বান করতেন। এখন এই সাম্প্রদায়িক ভেদবৈষম্য দূরীকরণেও তিনি মেয়েদের আহ্বান করলেন।

গান্ধীজীর এই প্রার্থনা সভায় শ্যামমোহিনী গুটিকয়েক মেয়ে সঙ্গে নিয়ে এসে যোগদান করেন। স্বয়ং লেখিকাও এই সভায় উপস্থিত থেকে গান্ধীজীর প্রার্থনার বাণী শোনার এবং তাঁকে দেখার পরম সৌভাগ্যলাভ করেছিল।

হলটির কথা এতদিনে মনে পড়ে না, তবে খুব সম্ভবতঃ ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট হলই হবে। গান্ধীজী একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বাণী দিচ্ছিলেন। ঐ বিপদসংকুল অবস্থায়ও মেয়েদের দ্বারা হলটি সেদিন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

তারপর তিনি ছুটে গেলেন নোয়াখালিতে। সঙ্গে গেলেন হাসান সোহরাওয়ার্দি ও আরো নেতৃবৃন্দ।

তখন নোয়াখালিতে ছিলেন সুচেতা কৃপালনী। তিনি প্রথমে নোয়াখালির দত্তপুকুরে মেয়েদের ক্যাম্প খুলে গান্ধীজীকে একাজে সাহায্য করেন। ডঃ ফুলরেণু গুহও নোয়াখালির চাঁদপুরে গিয়ে মেয়েদের জন্য ক্যাম্প খোলেন। এটি হল মেয়েদের জন্য দ্বিতীয় ক্যাম্প। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও গান্ধীজীর নির্দেশে দাঙ্গাবিধ্বস্ত কয়েকটি অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়ে কয়েকটি মুসলমান পরিবারের লোকজনদের তুলে এনে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দেন। একই রক্তস্রোত যখন সকলের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে তখন এ সাম্প্রদায়িকতার ভেদনীতি কেন, কেন ভায়ের রক্তে হাত রাঙা করা—এর সার্থকতা কি—দুর্জয় সাহস বক্ষে নিয়ে তিনি মুসলমান এলাকায় গিয়ে তাদেরও একথা বুঝাতে থাকেন। তিনি বলেন, বিভেদের মধ্যে ঐক্যই তো ভারতের মূল সুর। অযথা নিরীহ, মানুষ মেরে কি লাভ হবে

কলকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামায় কত লোক যে খুনজখম হল তার সীমা নেই। স্কুল কলেজ আর সরকারী অফিস আদালত সবই বন্ধ রইল কয়দিন ধরে। শত শত ভীত স্বতন্ত্র মানুষ প্রাণ হাতে করে ছুটে চলেছে যেখানে তাদের স্বধর্মী মানুষ আছে। হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি এবংবিধ বর্বরতার পৈশাচিক কত ঘটনা ঘটতে থাকল ক্রমাগত কয়েকদিন ধরে।

'ডাইরেক্ট এ্যাকশনের মুখে' বাণীপীঠ

কলকাতায় যখন এই মারাত্মক হিন্দুমুসলমান দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছিল তখন শ্যামমোহিনীর বাণীপীঠ স্কুল ও হোষ্টেল ছিল ৫৭।৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে মুসলমান-অধ্যুষিত রাজাবাজারের সন্নিকটে।

বস্তুত কলকাতায় প্রথম 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' আরম্ভ হয়েছিল ঐ রাজাবাজার অঞ্চল থেকেই। রাজাবাজারের এই মুসলমান দাঙ্গাকারীরা শ্যামমোহিনীর মেয়েদের হোষ্টেল ও স্কুল আক্রমণ করতে আসে। কিন্তু শ্যামমোহিনী তাঁর প্রাণাধিক স্কুল ও হোষ্টেল ছেড়ে যাবেন না কোথাও। 'আর কেনই বা যাব—' কথাটা তিনি ভাবতে থাকেন—হিন্দু মুসমলানের এ বিবাদ থাকবে না —সাময়িক এই বর্বরতার কাছে তিনি নতি স্বীকার করবেন না। রুদ্রমূর্তিতে তিনি রুখে দাঁড়ালেন। স্কুল ও হোষ্টেল রক্ষার্থে তিনি হোষ্টেলের নীচুতলায় পাড়ার ছেলেদের নিয়ে রক্ষীবাহিনীর সেণ্টার খুললেন। হিন্দু ছেলেরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে তাঁকে একাজে সহায়তা করেন। তারা মুসলমানদের আক্রমণ থেকে মেয়েদের ঐ হোষ্টেল রক্ষার ভার নিয়ে মুসলমানদের বাধা দিতে থাকে আর হোষ্টেলের মেয়েরাও মিলিতভাবে শ্যামমোহিনীর নির্দেশে এই দাঙ্গা হাঙ্গামার মোকাবিলা করতে ঐ রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র-ইটপাটকেল এগিয়ে দেওয়া, খাওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করে।

শ্যামমোহিনী সর্বদা সচেতন থাকেন। আর মেয়েদের অভয় দিতে থাকেন—আমি আছি, তোদের ভয় নেই। সাহস রাখ্ বুকে তোদের।

মিলিটারী প্রহরা

বাণীপীঠ স্কুল ও হোষ্টেলে রক্ষীবাহিনীর পাহারা চলছিল কয়েকদিন ধরে। কিন্তু পরে শ্যামমোহিনীর আবেদনক্রমে সরকার পুলিশ ও মিলিটারী মোতায়েন করেন। মিলিটারীরা হোষ্টেলের নীচের ঘরে থাকে আর পাহারা দেয়।

একদিন ঐ মিলিটারীদের মধ্যে জনা তিনেক প্রচুর মদ খেয়ে চুর হয়ে এসে অকস্মাৎ হোষ্টেলের অফিস ঘরে ঢুকে পড়ে। মিলিটারী তিনজনের ঐ বেসামাল অবস্থা দেখে শ্যামমোহিনী প্রমাদ গুণলেন। তিনি ঘাবড়ে গেলেও অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা তাদের ঘর থেকে বের করে দিতে সক্ষম হন এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে মেয়েদের মিলিটারীর হাতে বেইজ্জতি থেকে রক্ষা করেন। শ্যামমোহিনী বলতে থাকেন, এটা মেয়েদের স্কুল আমার। এখানে কোন তল্লাসীর প্রয়োজন নেই। এখানে ঢুকতে নেই। তিনি আধা ইংরেজী আধা হিন্দীতে ঐসব অপ্রকৃতিস্থ মিলিটারীদের ক্ষান্ত করেন। ঘুণাক্ষরে একবারও প্রকাশ করলেন না তিনি এটা তাঁর মেয়েদের হোষ্টেল, পাছে তারা জোর করে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতকারীরা ঐখানে লুকিয়ে আছে কিনা দেখার অছিলায় বা পাছে তারা অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারকল্পে খানাতল্লাসীর নামে মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট করে।

মিলিটারী শুনে মেয়েরা তো ভয়ে আধমরা। কিন্তু শ্যামমোহিনীর বিপদে কি অগাধ মনের জোর! না হলে সেদিন কি না হতে পারত মেয়েদের উপর। বিপদে বিভ্রান্ত বা দিশেহারা না হয়ে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে তিনি ঐ পানাসক্ত মাতাল গোরা সৈনিকদের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা করলেন, নিজেও রক্ষা পেলেন। সে পরিস্থিতিতে সাধারণতঃ একটা মহা দুর্ঘটনা ঘটতে পারত, কিন্তু তাৎক্ষণিক বুদ্ধি

প্রয়োগে শ্যামমোহিনী তা ঘটতে দেননি। শ্যামমোহিনীর ধীর সংযত অথচ বজ্রকঠিন নির্দেশে মিলিটারীগণ বের হয়ে গেলে তিনি ঘরে শিকল তুলে দিয়ে মেয়েদের রক্ষা করলেন, পরোক্ষে নিজেও রক্ষা পেলেন।

বাংলাদেশের জন্ম

এই ঘটনার কিছুদিনের পরই দাঙ্গাহাঙ্গামা থেমে গেল। কিন্তু চরম মূল্য দিতে হল ভারতবাসীকে। ভারতমাতাকে দুই ভাগে ভাগ করে এই সর্বনাশা "ডাইরেক্ট এ্যাকশন" থামাতে হল দেশের নেতৃবৃন্দকে। ১৯৪৭ সাল, ১৪ই-১৫ই আগষ্টের মধ্যরাত্রি। গভীর উৎকণ্ঠায় ভারতবাসী জেগে আছে। জহরলাল নেহেরু আবেগকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—ভারতবর্ষ পরাধীনতার নাগপাশ হতে এই মুহূর্তে স্বাধীন হল কিন্তু দ্বিধাখণ্ডিত হয়ে। ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের জন্ম হল একই ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ করে। পাঞ্জাবকে দুই ভাগে ভাগ করে তার এক্সচেঞ্জ অব পপুলেশন (লোকবিনিময়) স্বীকৃত হল। কিন্তু বাংলাদেশ ভাগ হলেও তার এক্সচেঞ্জ অব পপুলেশন (লোকবিনিময়) হল না। এক ভাগ পশ্চিম বাংলা আর এক ভাগ পূর্ব পাকিস্তান বলে অভিহিত হল। কিন্তু এইখানেই সর্বনাশের জের মিটল না।

১৯৪৭ সাল, ১৫ই আগষ্ট ইংরেজ সরকারের কূটনৈতিক চালে এভাবে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করল বটে কিন্তু বাঙালীকে সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান শাসকসম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির দ্বারাও পরাস্ত করতে পারেন নি। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা থেকে অধিক সাড়ে সাত কোটি। তার মধ্যে ছয় কোটির বেশী মুসলমান। এদের মাতৃভাষা বাংলা। সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের উপর অর্থনৈতিক,

প্রশাসনিক ও সামরিক সর্ববিষয়ে কর্তৃত্ব চালাতে লাগল। এমন কি, সংখ্যালঘুদের উর্দু ভাষাকেও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালাভাষাভাষীদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে লাগল। তাদের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এটাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেবার মতলব করে। ১৯৫০ সালে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে দিল। কিন্তু তাদের এ অপকৌশল কার্যকরী হল না। ১৯৫১ সালের ১১ই মার্চ বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করলেন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা। পরিস্থিতি চরমে উঠল। ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫১) বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে নিরস্ত্র ছাত্রদের মিছিলের উপর গুলি চলল। মাতৃভাষার জন্যে প্রাণ দিল সেদিন সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বর। প্রাণ দিয়ে তারা বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করে গেল। সেই থেকে ওপার বাংলা এপার বাংলার মানুষ ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখটিকে শহীদ দিবসরূপে পালন করে আসছে এই বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে ঃ

"আমার ভাইয়ের রক্তরাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি।
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি।
আমার সোনার দেশের রক্তে গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি।"

উদ্বাস্তুদের সেবায় শ্যামমোহিনী

কিন্তু এখানেই ঘটল না এর পরিসমাপ্তি। পশ্চিম পাকিস্তানী খান-সেনাদের দাপটে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ চলল নারকীয় অত্যাচার। নিরপরাধ কত মানুষকে যে নির্মমভাবে হত্যা করা হল তার সীমাসংখ্যা নেই। পূর্ববঙ্গের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল।

মুজিবর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে খান-ফৌজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানালেন। ছাত্রদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল—'স্বাধীনতা চাই।' আর তার ফলে যে তাণ্ডব নৃশংস গণহত্যা চলল হালফিল সে ঘটনার কথা প্রত্যেকেই প্রায় অবহিত আছেন। এক কোটি দুর্গত মানুষ ভারতে এসে যেভাবে আশ্রয় নিয়েছিল ভারতবাসীমাত্রই সে বেদনাদায়ক অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত। শ্যামমোহিনীও এইসব দুর্গত মা-বোন-ভাইদের পার্শ্বে গিয়ে যেমন সাধ্যমত দানধ্যান করেছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন তেমনি তার "কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে" তাদের অনেককে আশ্রয় দিয়ে তাদের সেবা করেছেন। সমাদর করে বলেছেন, 'আপনারা আমাদের মাননীয় অতিথি, আপনাদের সেবাযত্ন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য'। এইভাবে তাদের তিনি সান্ত্বনা দিয়েছেন। নিজহাতে কম্বল বিতরণ করেছেন, যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করেছেন। তাদের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। লবণহ্রদে তিন লক্ষ নর-নারীর উদ্বাস্তু ক্যাম্পে গিয়ে অনবরত তাদের সেবাযত্ন করেছেন।

শ্যামমোহিনী তাঁর দীর্ঘ জীবনে যখনই ভারতরাষ্ট্রে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে তার ভিতরই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং যতটুকু পেরেছেন সক্রিয় সাহায্যসহায়তা করেছেন। ১৯৭১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চোদ্দদিনের পাকভারত যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদ হয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা অন্তে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে গেল ভারতে আশ্রিত তার প্রায় এককোটি নর-নারী। অনেককিছু হারিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে তারা অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। শ্যামমোহিনীও কিছুটা আস্বস্ত হলেন। কিন্তু পূর্ব বাংলায় তাঁর জন্ম ; প্রায় এই এক কোটি মানুষের অমানুষিক, অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা দেখে তাঁরও মনটা বেদনায় আর্তনাদ করে উঠে। সমগ্র বাংলাদেশেই শিক্ষাবিস্তার করব এই ছিল শ্যামমোহিনীর জীবনে ঐকান্তিক একমাত্র

কামনা। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে তাঁর সে আশা পূরণ হল না—স্বীয় জন্মভূমিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হল তাঁর।

লেডী কেসি অনুমোদিত টাকা পাওয়া গেল না

আর এই দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলেই, লেডী কেসী যে টাকা তাঁর পরিষদের জন্য মঞ্জুর করেছিলেন তা আর পেলেন না শ্যামমোহিনী। কারণ প্রশ্ন উঠল কোন্ সরকার দেবেন, ভারত সরকার, না, পূর্ব পাকিস্তান?

পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষমতামদমত্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের ভয়াল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যে সাহস, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, ইয়াহিয়া সরকারের বর্বরতার হাত থেকে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বাঁচিয়েছেন, নারী যে শক্তিময়ী এতে আর কোন সন্দেহ নাই।

একবিংশ অধ্যায়

পরিষদের নিজস্ব জমি সংগ্রহ

যাহোক্ শ্যামমোহিনী এখন পরিষদের নিজস্ব বাড়ী তৈরীর দিকে একান্ত মনোযোগী হলেন। এ উদ্দেশ্যে জমিসংগ্রহের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। জমি সংগ্রহ হলেই তার উপর পরিষদের নিজস্ব বাড়ী তৈরী করতে পারবেন। নিজস্ব বাড়ী হলে এই যে এত টাকা ভাড়া গুণে দিচ্ছেন প্রতিমাসে এতগুলি ভাড়া বাড়ীর জন্যে, তা থেকে নিশ্চিত রেহাই পাবেন এবং ঐ টাকা দিয়ে পরিষদের অন্যান্য শাখা বাড়িয়ে তার শ্রীবৃদ্ধি করতে পারবেন।

সরকারের খাসমহল থেকে জমি সংগ্রহ

জমিসংগ্রহের কাজে হাত দিয়ে শ্যামমোহিনী সরকারের খাসমহল থেকে জমি বন্দোবস্ত নেবার ব্যবস্থা করলেন। এটা ছিল ১৯৪৭ সালের শেষ দিকের ঘটনা। স্বাধীনতা পাবার পরই তিনি সরকারী খাস-মহল থেকে প্রথমে ৫১ কাঠা জমি বন্দোবস্ত নিলেন। পরে আরও ৪ কাঠা নিলেন।

তখন খাসমহলের অফিসার ছিলেন শচীন্দ্রনাথ মিত্র। ইনি ছিলেন একজন হৃদয়বান ব্যক্তি। শ্যামমোহিনীর পরিষদের কার্যকলাপ দেখে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হন এবং তিনি সরকারের তরফ থেকে শ্যামমোহিনীকে জমি নেবার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে দেন, উপরন্তু নানাভাবে তাঁর পরিষদের কাজে সাহায্য করেন।

নিজস্ব টাকায় জমিসংগ্রহ

ব্যক্তিগত সম্পত্তির টাকার বিনিময়ে শ্যামমোহিনী ঐ জমি স্বীয় নামে সরকারী খাসমহল থেকে সর্ট টার্মে লিজ নিলেন। নিয়েই সেই বৎসরই (১৯৪৭) বিদ্যালয়গৃহের নির্মাণ আরম্ভ করে দিলেন

২০/২এ, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোডে। বর্তমানে এই ঠিকানায়ই পরিষদের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে।

সর্ট টার্ম লিজ থেকে লঙ টার্ম লিজ

আইনতঃ সর্ট টার্ম লিজে পাকা বাড়ী নির্মাণ করা যায় না। কিন্তু কাঁচা বাড়ী তৈরী করলে ভবিষ্যতে ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হবে না। এই অসুবিধের কথা চিন্তা করে শ্যামমোহিনী সরকারের নিকট লঙ টার্ম লিজের আবেদন করলেন।

উত্তরে সরকার বললেন, আপনি স্কুলের জন্য যখন বাড়ী নির্মাণ করছেন তখন স্কুলের নামে অর্থাৎ নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের নামে ঐ জমি ও বাড়ী রেজিষ্টারী করে দিন।

সরকারের কথামত শ্যামমোহিনী কাজ করবেন ঠিক করলেন কিন্তু তার পূর্বে তাঁর পরিষদকে রেজিস্টার্ড করে নিতে হবে। তিনি ১৮৬০ সালের ২১ নম্বর আইন অনুযায়ী ১৯৫০ সালে তাঁর পরিষদকে প্রথমে রেজিষ্টারী করে নিলেন। তারপর তাঁর নিজের নামে সর্ট-টার্ম লিজের ঐ ৫১ কাঠা জমি লঙ টার্মে লিজ নিয়ে তার উপরে নির্মিত বাড়ী যা কিছু সবই পরিষদের নামে রেজিস্টারীভুক্ত করে পরিষদকে দান করে দিলেন।

নর-কঙ্কালে ভরা জমি

এই ২০/২এ, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোডের জায়গাটা ছিল জনবসতিহীন খাস জায়গা। বাড়ী করার সময় মাটি খুঁড়তেই কেবল কঙ্কাল আর কঙ্কাল—অসংখ্য নর-কঙ্কাল বের হতে থাকল। মিস্ত্রিরা সব মুহূর্তে কাজ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে রইল।

তারা বলতে থাকল, —বাপরে বাপ, —এত নরকঙ্কাল, আমরা কাজ করতে পারব না। এত মরা মানুষের মাথার খুলি হাড়গোড়, আমরা এসব কিছুতেই স্পর্শও করব না—কাজও করব না।

মিস্ত্রীদের একথা শুনে মুহূর্তে শ্যামমোহিনী কি চিন্তা করলেন, তারপর তাদের বললেন, 'আচ্ছা তবে তোরা দাঁড়া', —বলে তিনি নিজেই সেই হাড়গোড় নির্দ্বিধায় ঝুড়িতে তুলতে লাগলেন। আর বলতে থাকলেন, —মানুষের হাড় হচ্ছে পবিত্র জিনিস তা জানিস? এই ত্যাখ আমি তুলছি, ব'লে হাড়গোড় তুলে সব ঝুড়ি ভর্তি করতে লাগলেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা শ্যামমোহিনী কিন্তু মরামানুষের হাড়গোড় স্পর্শ করতে এতটুকু দ্বিধা করলেন না, এ দেখে মিস্ত্রিরা তো অবাক। তারা বলতে থাকল, সে কী মা, নিজেই তুলছেন যখন তখন আর আমাদের তুলতে দোষ কি?

কাল বিলম্ব না করে মিস্ত্রীরা কাজে হাত লাগায়। অজস্র মরা মানুষের হাড়। মেয়েদের হাতের নোয়া এবং শাঁখাও পাওয়া গেল প্রচুর। এ থেকে অনেকে অনুমান করল ১৯৪৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় যে মৃত মানুষের দেহগুলি এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল—এসব তাদেরই কঙ্কাল। আবার এও শোনা গেল— ১৮৯৯ সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারী রূপে দেখা দিলে যে অগণিত মানুষ মারা যায়—এইগুলি সেইসব হতভাগ্য নারী-পুরুষেরই কঙ্কাল। কারণ প্লেগ-মহামারীর ভয়ে আতঙ্কে অধিকাংশ মানুষ কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে এইসব মৃত মানুষের সৎকার করার লোকের অভাব দেখা দেয়। তখন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে এই মৃতদেহগুলি লরী বোঝাই করে এনে এইস্থানে গোর দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এগুলি হল সেইসব হতভাগ্য মৃত মানুষেরই কঙ্কাল।

এ তথ্য পাওয়া গিয়েছিল ২৪ পরগণা জেলার সরকারী খাস-মহলের পুরাতন রিপোর্ট থেকে এবং এই তথ্য পরিবেশন করেছিলেন কলকাতা খাসমহলের তৎকালীন অফিসার শচীন্দ্রনাথ মিত্র।

প্রসঙ্গক্রমে তৎকালীন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নাম পরিবর্তন

করে কলকাতা করপোরেশন নাম সৃষ্টি হওয়ার কথা পাঠকপাঠিকাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

১৯২৪ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন করে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নাম পরিবর্তন করে এর নাম রাখা হয় কলকাতা করপোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদের পরিবর্তে মেয়রের পদ সৃষ্টি করা হয়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায়ই এই পদের সৃষ্টি হয়।

১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার মেনে নিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বাংলার স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী হন। মন্ত্রী হয়ে তিনি তাঁর অনেক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেন। কলকাতা মিউনিসি-প্যালিটিকে কলকাতা করপোরেশনে উন্নীত করলেন এবং চেয়ারম্যানের পরিবর্তে মেয়রের পদ সৃষ্টি করলেন। ১৯২৪ সালের ১৬ই এপ্রিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নবগঠিত কলকাতা করপোরেশনের প্রথম মেয়রের পদে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে বিদেশী সরকারের অধীনে মন্ত্রীত্ব নেওয়ায় দেশবাসীর নিকট অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। সুরেন্দ্রনাথের এ সিদ্ধান্তের ১৮ বৎসর পর ১৯৩৭ সালে গান্ধীজীও দেশের নেতৃবৃন্দকে ঐ ব্রিটিশ সরকারের অধীনেই মন্ত্রীত্ব নিতে পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রগুরুর সেদিনকার সিদ্ধান্ত মন্ত্রীত্ব গ্রহণ যে সঠিক হয়েছিল দেশবাসী তা পরে উপলব্ধি করলেন। ঠিক হল মহামতি গোখেলের সেই কথা—What Bengal thinks today, the rest of India thinks to-morrow—বাঙালী আজ যা চিন্তা করে অন্যান্য ভারতবাসী পরদিন তাহা চিন্তা করে। যাক—আমরা আমাদের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

লোকমাতা নিবেদিতা ও প্লেগ মহামারী

কলকাতার প্লেগ মহামারীর কথা মনে পড়লে স্বতঃই আর এক মানবদরদী মহীয়সী বিদেশিনী কন্যার কথা মনে পড়ে। তিনি

হলেন স্বামী বিবেকানন্দের মানস দুহিতা সিস্টার নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লোকমাতা নিবেদিতা নাম দিয়েছিলেন। সেই লোকমাতা নিবেদিতা প্লেগরোগাক্রান্ত এইসব হতভাগ্য মানুষের সেবার ভার স্বহস্তে নিয়েছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে সভাপতি করে 'প্লেগ ও ছাত্রদের কর্তব্য' নামে এক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করেন এবং নিজের জীবন তুচ্ছ করেও আর্তের পার্শ্বে গিয়ে তাদের সেবায় নিযুক্ত হন। স্বয়ং ঝাড়ু হাতে রাস্তাঘাটের জঞ্জাল পরিষ্কার করেছিলেন লোকমাতা নিবেদিতা। এমন সেবার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

প্লেগ রোগে মৃত লোকদের কঙ্কালের কথা শুনে সিস্টার নিবেদিতার আদর্শের কথাই শ্যামমোহিনীর মনে পড়ল। "এই আইরিশ দুহিতা কলকাতাবাসীকে প্লেগ থেকে বাঁচাবার জন্য স্বয়ং প্রকাশ্যে ঝাড়ু হাতে রাস্তা পরিষ্কার করেছেন এবং তাদের সেবা করেছেন—আর আমিই বা এই কঙ্কালগুলি সরিয়ে এতগুলি নিরাশ্রয় মেয়েদের থাকার আস্তানা করার জন্য এই পবিত্র স্থানকে সিস্টার নিবেদিতার স্পর্শধন্য ততোধিক পবিত্র মানুষের কঙ্কালমুক্ত করতে পারব না কেন?"

শ্যামমোহিনী নিজেই তৎক্ষণাৎ কঙ্কাল সরাবার কাজে হাত লাগালেন আর তাঁর দেখাদেখি মিস্ত্রিরাও লেগে গেল। একটু আগেই সে ঘটনা উল্লেখ করছি।

এভাবে বাড়ী তৈরীর কাজ হতে থাকল। এই বাড়ীর জমি কেনার টাকা ও বাড়ী তৈরীর টাকা শ্যামমোহিনী তাঁর শ্বশুরবাড়ী থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি দেশবিভাগ হওয়ার পর বিক্রি করে সংগ্রহ করেন। এ ছাড়া স্বীয় গহনা বিক্রির অর্থ ও চাকরীর উপার্জিত সমগ্র অর্থ দিয়ে তিনি একাজে হাত দেন।

ঐ ৫৫ কাঠা জমির জন্যে সরকারকে এককালীন মোট ৫২,০০০ টাকা দিতে হয়। কিন্তু এত টাকা একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব নয়, এজন্যে সরকারের নিকট লেখালেখি করে ২০ বৎসরে ঐ টাকা পরিশোধ

করার কিস্তিবন্দি করে নিলেন। তারপর একের পর এক বাড়ী তৈরী করতে লাগলেন ঐ জমির উপর।

আরও জমি সংগ্রহ

১৯৫০ সালে এই ৫৫ কাঠা জমি ছাড়াও এই জমিসংলগ্ন আরও ২৮ কাঠা জমি পুনরায় সরকারের নিকট হতে বন্দোবস্ত করে নিলেন শ্যামমোহিনী এবং ঐ জমির উপর বাড়ী নির্মাণ সুরু করলেন।

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ

এই ২৮ কাঠা জমির কিছু অংশের উপরে স্থাপন করলেন বিরাট হল সহ এক বিল্ডিং। বিল্ডিং নির্মাণ শেষ হলেই তার নাম দিলেন প্রেয়ার হল্ বা প্রার্থনাগৃহ। পরে এটাকেই 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ' নাম দেন। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক নাটকাদির অভিনয়, সভাসমিতির অধিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া আশেপাশের পাড়াপড়শী, বিভিন্ন অফিস-কাছারীর কর্মীবৃন্দ এখানে নাটকাদি অভিনয় করার সুযোগ লাভ করে থাকেন।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

নাট্যানুরাগী শ্যামমোহিনী

শ্যামমোহিনীর ভারতীয় কৃষ্টি-সভ্যতা, শিল্প ও চারুকলার প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগ আছে তার প্রমাণ 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ' নির্মাণের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই। এই মঞ্চ নির্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্য হল ঃ

১। জনমানসে সমাজসেবার প্রেরণা দান ও বিদ্যানুশীলনের উৎসাহ দান করা,

২। নানাবিধ শিক্ষামূলক ও গঠনমূলক কাজের সঙ্গে শিল্প ও চারুকলার প্রতি বিভিন্ন নাট্যসংস্থাকে প্রেরণা দান করা,

৩। এই মঞ্চ থেকে যে আয় হবে তা দিয়ে পরিষদ ও তার অন্তর্গত দুঃস্থা মেয়েদের সাহায্য করা এবং ভবিষ্যতে যাতে অর্থের অভাবে পরিষদ বন্ধ হয়ে না যায় সে ব্যবস্থাও কিছুটা করে রাখা।

কিন্তু আরম্ভের মুখে বহু নাট্যসংস্থাকে এই মঞ্চে নাটক অভিনয়ে উৎসাহ দিতে গিয়ে শ্যামমোহিনী নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তবু তিনি একাজে পশ্চাৎপদ হন নি।

নাটকদর্শনে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

বর্তমানে কলকাতায় যে কতিপয় বৃহৎ থিয়েটার হল আছে 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ' তাদের মধ্যে অন্যতম। পশ্চিম বাংলা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে'র নাম ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশবিদেশের বহু নাট্যামোদী এই মঞ্চে এসে থিয়েটার দেখে গেছেন এবং এখনও দেখে যান। এখানে যে সব নাটক অভিনীত হয় সচরাচর সেগুলি হয় উচ্চমানের।

১৯৬৯ সাল, ১২ই সেপ্টেম্বর প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শ্যাম-মোহিনীর আমন্ত্রণে উপস্থিত থেকে শ্যামমোহিনীর সংগে একত্র বসে

'অ্যাণ্টনী কবিয়াল' নাটকটির অভিনয় দেখেন। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়। তৎকালীন বিরূপ পরিস্থিতি হেতু নাটকটি কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের পরিবর্তে অন্যত্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 'অ্যাণ্টনী কবিয়াল' নাটকটি দেখে প্রধান মন্ত্রী অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন এবং শ্যামমোহিনীর গঠনমূলক কাজের প্রশংসা করে তাঁকে উৎসাহ দেন।

পশ্চিম বাংলার বর্তমান গভর্ণর এ. এল. ডায়াসও সস্ত্রীক কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে এসে 'মল্লিকা' নাটকের অভিনয় দর্শন করেন।

মঞ্চে প্রথম নাটকাভিনয়

'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে' সর্বপ্রথম যে নাটকটির অভিনয় হয় সে নাটকটি হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'। নাটকটি অভিনয় করে শ্যামমোহিনীর পরিষদের 'সঙ্গীত সঙ্ঘে'র মেয়েরা। পরিষদের বর্তমান য়্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী অমলকুমার চৌধুরী, পরিষদের একনিষ্ঠ বিশিষ্ট কর্মী ভবতোষ ভট্টাচার্য ও চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ও সহযোগিতায় ঐ নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এবং দর্শকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

এ ছাড়াও এই হলে শ্যামমোহিনীর পরিষদের সঙ্গীত সঙ্ঘের মেয়েরা উৎসবে দু'তিনবার বিভিন্ন লেখকের শিক্ষামূলক নাটক ও নৃত্যনাটকাদি অভিনয় করে থাকে বিভিন্ন দক্ষ পরিচালকের পরিচালনায়। সাধারণতঃ তারা এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে শ্যামমোহিনীর জন্মদিন উপলক্ষে (প্রতি বৎসর ১০ই ফেব্রুয়ারী) ক্রমাগত দু'তিনদিন থেকে সপ্তাহ পর্যন্ত। এদের সে সুনিপুণ অভিনয় উপস্থিত দর্শকবৃন্দের অত্যন্ত উপভোগ্য হয়।

এই বৎসর (১৯৭৫) শ্যামমোহিনীর ৮৭তম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁর সঙ্গীত সঙ্ঘের মেয়েরা প্রথম দিন যে নাটকটি অভিনয় করে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করেন সেটি এই গ্রন্থের লেখিকার লেখা

"রাম গোয়ালার স্বর্গলাভ" নামে ছোট গল্প। এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন সুরজিত রায়। এই অনুষ্ঠানে শ্যামমোহিনী আগাগোড়া উপস্থিত থেকে তাঁর পরিষদের ছাত্রীদের ও কর্মীদের যে উৎসাহ দিলেন তা দেখে তিনি যে তারুণ্যের প্রতীক একথা বলতেই হয়। জরা দেহকে আক্রমণ করলেও মন তাঁর সজীব, সতেজ তারুণ্যে ভরা। না হলে এত দীর্ঘ সময়ে এভাবে এমন উৎসাহ নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে মঞ্চে বসে থেকে দেখা সম্ভব হত না। এ থেকেই তাঁর এই কথার যথার্থতা মেলে 'ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছাড়া কোন কাজেই সাফল্য লাভ করা যায় না।'

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

১৯৫৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী এই Prayer Hall বা কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন পশ্চিম বাংলার ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

কাশী বিশ্বনাথ শিবমন্দির

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের সম্মুখ ভাগে প্রবেশের মুখে একটু লক্ষ্য করলেই যে কেউ দেখতে পাবেন একটি শিবমন্দির। এই শিব-মন্দিরের প্রবেশপথ স্বতন্ত্র। মঞ্চের ডানদিকে। এই শিবমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন তৎকালীন ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র।

প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে পরিষদের মন্দির বিভাগের মেয়েরা ছাড়াও প্রতিবেশী ধর্মপিপাসু মহিলারা এসে এখানে বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালেন এবং ফুলবেলপাতায় আরাধনা করেন। পূজান্তে কেউ কেউ এখানে বসে ধর্মগ্রন্থও পাঠ করেন।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

মন্দির বিভাগ

'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ' হলটির নামকরণের সার্থকতা শ্যামমোহিনী এভাবেই প্রতিপন্ন করেছেন। এর বাস্তব দিকগুলি সম্পন্ন করার ব্যবস্থাদিও তিনি এভাবে করেছেন:

১। 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ' ও তার যাবতীয় সম্পত্তি শ্যামমোহিনী দেবতার নামে দান করে একখানি দানপত্র দেবতার নামেই রেজিস্টারী করে দিয়েছেন।

২। এই দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকে তার একাংশ যে-সকল সেবায়েতগণ মন্দিরে পূজা ও মঞ্চের হল ও পরিচালনা করবেন তাঁরা পাবেন।

৩। এই হলসংলগ্ন ধর্মপ্রাণা মহিলাদের ধর্মচর্চার সুবিধের জন্যে একটি মন্দির স্থাপন করেছেন শ্যামমোহিনী। এই মন্দিরে কাশী বিশ্বনাথ মহাদেব, শ্রীশ্রীকালীমাতা, মঙ্গলচণ্ডী, লক্ষ্মীনারায়ণ, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখানে নিত্যপূজা, ভোগারতি ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত আছে। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত প্রভৃতি বিবিধ ধর্মগ্রন্থ নিত্য পাঠ করা হয়। এজন্যে পুরোহিত আছেন। তবে পরিষদের মহিলাদের (বিশেষতঃ ফর্সাদির) দ্বারা এই মন্দির বিভাগটি পরিচালিত হয়।

প্রতি অমাবস্যায় জাঁকজমকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিশুতি রাতে শ্রীশ্রীকালীমায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের ছাত্রী-কর্মী থেকে আশেপাশের পল্লীর ভক্তিপরায়ণ নরনারী পর্যন্ত সকলে এসে এই পূজায় যোগদান করেন। শ্যামমোহিনী স্বয়ং উপস্থিত থেকে নিয়মনিষ্ঠা সহকারে মায়ের আরাধনা হচ্ছে কি না দেখেন এবং ভক্তিনম্রচিত্তে সকলের সঙ্গে মায়ের পূজায় অংশ গ্রহণ করেন। পরিষদের অসংখ্য কাজের মধ্যে এই কাজটিকেও তিনি তাঁর কাজের

অঙ্গ হিসাবে ধরে নিয়ে সেই মত নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করেন। শিব চতুর্দশীতে শিবমন্দিরে উপস্থিত থেকে তিনি প্রথমেই শিবের মাথায় জল ঢালেন এবং ফুলবেলপাতা দিয়ে পূজা দেন। স্থানীয় মহিলা ও পরিষদের ছাত্রীকর্মীবৃন্দ মিলে স্থানটিকে যেন রীতিমত একটা মহামেলার মহামিলন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেন।

শ্যামমোহিনীর মনোগত বাসনা হল, এইসব দেবার্চনা উপলক্ষে যে ভোগ দেওয়া হবে তা খেয়ে অন্ততঃ কয়েকটি গরীব দুঃখী মেয়ে জীবন ধারণ করতে পারবে, ধর্মচর্চার মধ্য দিয়ে সৎভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। ইতিমধ্যে সমাজের কয়েকটি দুঃস্থা মহিলা এভাবে সাহায্য পেয়ে জীবন ধারণ করার সুযোগ লাভ করে আসছে। শ্রীমতী গায়েন ও আরো কয়েকটি দুঃস্থা মহিলা এভাবে নিয়মিত ধর্মচর্চার মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে।

শ্যামমোহিনী শীঘ্রই পরিষদের হাতার মধ্যে উপযুক্ত প্রাঙ্গণে একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করে সেখানে ঐ সমুদয় দেবদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করবেন এবং ধর্মপিপাসু সেবাপরায়ণ নরনারী বিশেষ করে মহিলাদের জন্য বিরাট সাধনক্ষেত্র তৈরী করবেন। তাঁর এই পরিকল্পনা যত সত্বর পারবেন তিনি বাস্তবে রূপদান করবেন। তাহলেই ধর্মপিপাসু, নিঃস্বার্থ সেবিকা ও আরো অধিকসংখ্যক দুঃস্থা নিরাশ্রয় নিরালম্ব মহিলার ধর্মসাধনার মধ্য দিয়ে সৎভাবে জীবন ধারণের ব্যবস্থাদি করতে পারবেন। শ্যামমোহিনীর পূর্বাপর সংগঠনশক্তি ও মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করা দেখে কেন যেন আমার পণ্ডীচেরীর শ্রীশ্রীমায়ের কথা মনে পড়ে। কি অসামান্য সংগঠনশক্তি, কি অসামান্য উদ্ভাবনীশক্তি, কি অপূর্ব শৃঙ্খলাবোধ, কি অসামান্য পরিচালনা দক্ষতা! মায়ের এই অসামান্য পরিচালনা দক্ষতাগুণে পণ্ডীচেরী আশ্রমে কম করে যে পঞ্চাশটি বিভাগ আছে —যার মাসিক খরচ লক্ষাধিক টাকা—সেগুলির যাবতীয় সামগ্রী আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগেই উৎপন্ন হয়। এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান

সচরাচর দুর্লভ। শ্রীমায়ের তত্ত্বাবধানে এর সব বিভাগগুলিই সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে চলে।

১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দ দেহত্যাগ করলে অনেকে ভেবেছিলেন যে, টাকাপয়সা ও পরিচালনার অভাবে আশ্রমের ক্ষতি হবে। কিন্তু শ্রীমায়ের অভূতপূর্ব পরিচালনাক্ষমতায় আশ্রমের সর্ব বিভাগই তাঁর নির্দেশে সুষ্ঠুভাবে চলেছে। দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। মাতৃশক্তি যে কত বড় শক্তি শ্রীমা তার প্রমাণ দিয়ে গেলেন। এই অপার মাতৃশক্তির মহান আবির্ভাবের সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন তাঁর 'সাবিত্রী' কাব্য। আজ শ্যামমোহিনীর কথা লিখতে বসে আর এক মাতৃশক্তির অবিনশ্বর কীর্তির চলমান ইতিহাসের কথাই লিখছি এ আমার দৃঢ় প্রত্যয়।

শ্যামমোহিনীর পরিষদের অন্তর্গত যতগুলি প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির মাসিক খরচও কম পক্ষে ৫০।৬০ হাজার টাকা। কিন্তু তাই বলে অর্থের অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়নি। এখন প্রশ্ন হতে পারে এত টাকা তিনি কোথা থেকে পান বা তাঁর আয়ের পন্থা কি।

তদুত্তরে পরম গর্বে নির্ভাবনায় বলা যায় এগুলির পশ্চাতে আছে শ্যামমোহিনীর অপূর্ব পরিচালনাশক্তি যার ফলে তিনি এতগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ত গৌরবের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন।

আসল কথা আয় বুঝে ব্যয় করতে তিনি জানেন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আয় দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার যথাসাধ্য বহন করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা তাঁর।

এ থেকে স্বতঃই মনে হয় টাকা থাকলেই তার সদ্ব্যবহার সকলে করতে পারেন না। শ্যামমোহিনী মিতব্যয়িতা জানেন। কথায় বলে টাকায় টাকা আনে। তিনি কখনও মিলটনের "On His Blindness" এর এক পেনিওয়ালা শিষ্যের মত টাকা মাটিতে পুঁতে রাখেন নি, টাকার যথাযথ সদ্ব্যবহার করে তাকে কম্পাউণ্ড ইণ্টারেষ্ট সহ বর্ধিত করেছেন—তাই বলে ব্যাঙ্ক ব্যাল্যান্স নয়, একটির পর একটি প্রতিষ্ঠান

করে সেই টাকার সুদ-আসলে মিলে প্রতিষ্ঠানের মহীরুহ গড়ে তুলেছেন—যার ডালপালা ফলে ফুলে বর্ধিত হয়ে মাটি থেকে রস আহরণ করে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। কত নারী জীবনে ধন্য হয়ে চলেছেন। এইখানেই পণ্ডীচেরীর শ্রীমার আশ্রম পরিচালনার সঙ্গে শ্যামমোহিনীর পরিচালনার কিছুটা সৌসাদৃশ্য আছে একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু তিনি প্রচারবিমুখ। তাই তাঁর এ কীর্তির কথা অনেকেরই জানা নেই।

বর্তমানে শ্যামমোহিনীর পরিষদের অন্তর্গত যে মন্দির আছে, বহু দেবদেবী বিগ্রহযুক্ত এই মন্দিরে মাসান্তে একবার করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী কীর্তনীয়া দলকে দিয়ে হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করেন শ্যামমোহিনী। এত বিশাল কাজের মধ্যেও স্বয়ং উপস্থিত থেকে ভক্তিনম্রচিত্তে তা শ্রবণ করতে কখনই তাঁর ভুল হয় না। তাঁর পরিষদের মেয়ে ও কর্মী ছাড়াও পড়শীরা সেখানে উপস্থিত থেকে কীর্তনাদি শ্রবণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্যামমোহিনী নিজ হাতে প্রসাদ বিতরণ করে স্বয়ং তৃপ্ত হন এবং উপস্থিত প্রত্যেককে আনন্দ দান করেন।

শ্যামমোহিনীর ধর্মসাধনার বৈশিষ্ট্য

শ্যামমোহিনীর ধর্মচর্চার ভিত্তি হল সমাজসেবার মনোভাব। তিনি যে ধর্মানুষ্ঠান করেন তা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সেই ধর্মের অনুষ্ঠানের দিকে অধিকতর মনঃসংযোগ করেছেন যাতে বৃহত্তম মানুষের মহত্তর কল্যাণ হয়—তাঁর পরিষদের অন্তর্গত সমস্ত বিভাগই এই মানবকল্যাণকর কাজে নিযুক্ত আছে। একদিকে মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে, স্বাবলম্বী করার কল্যাণকর কার্য্যের মধ্য দিয়ে, তাদের চরিত্র গঠনের দিকে, শঙ্কাহীন জীবন গঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন, অন্যদিকে ভারতীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য—কেবল আত্মসুখপরায়ণ না হয়ে প্রত্যেকে আমরা পরের তরে—সে শিক্ষাও

তিনি তাঁর পরিষদের ছাত্রী থেকে কর্মীদিগকে দিয়ে চলেছেন কিন্তু এজন্যে মুখে তাঁর কোন প্রচার নেই, তাঁর প্রতিটি কর্মের মধ্যেই তিনি তা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন।

জোর করে কাউকে স্বমতে আনার কোন প্রচেষ্টাই কখনও করেন না শ্যামমোহিনী। তবু তাঁর জীবনচর্যা এমনই যে, তাঁকে অনুসরণ না করে যেন উপায় নেই। সেই দিক থেকে শ্যামমোহিনী অনেক উর্দ্ধের মানুষ। চিরাচরিত রীতিনীতি ছাড়িয়ে তাঁর ধর্মচর্চাও তাই স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। এমন সহজ অনুপ্রবেশ আর কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সচরাচর দেখা যায় না।

মহাপুরুষের সেই কথা—"মন্দির মসজিদে পূজা উপাসনা ধর্ম নয়, ধর্ম মানুষের সেবায়।" সেই মানুষের সেবাই হচ্ছে শ্যামমোহিনীর মন্দিরের দেববিগ্রহের সেবার মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পূজার অধিকার স্বীকৃত নয়। যে কোন নিষ্ঠাবান, নিষ্ঠাবতী উদারনৈতিক ধর্মপরায়ণ হিন্দু নরনারী এখানে পূজার অধিকারী। জাতিভেদ তিনি মানেন না। আমাদের বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় বলেন, তাঁর বাড়ীর গৃহ-দেবতার পূজা করেন তাঁর বাড়ীর আশ্রিত সকলে মিলে, কারণ তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদ বা জাতিভেদ মানেন না। তিনি বলেন, যে কেউ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতির পুরোহিত দিয়ে পূজা করাবেন তিনি তাদের তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য করবেন। কিন্তু শ্যামমোহিনীর প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরে এ প্রথা আগেই প্রচলিত আছে। এ মন্দিরে সর্ব শ্রেণীর হিন্দুই পূজা করার অধিকারী। এই দিক থেকে চিত্তের ঔদার্য্যে, ও সৃজনশীল চিন্তাবিদ হিসাবে তাঁর ধর্মচর্চা সর্বদাই দেদীপ্যমান একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

উৎসাহ-উদ্দীপনার খনি শ্যামমোহিনী

আসলে শ্যামমোহিনীকে উৎসাহ-উদ্দীপনার খনি বলা যায়। কারণ যে কেউ তাঁর নিকট কোন সমস্যা বা বেদনা বা হতাশা নিয়ে আসেন তিনি তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে তাদের মনের সে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা দূর করে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে ফিরিয়ে দেন। পরিষদের কর্মীদের, ছাত্রীদের ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগেও সমান দরদী তিনি। তাঁর পরিষদের দ্বার সকলের জন্যে উন্মুক্ত।

কত দুঃস্থা অনাথিনী মেয়েকে তিনি নিজ ব্যয়ে বিবাহ দিয়ে তাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তাঁর পরিষদের প্রাঙ্গনে কন্যাপক্ষ সেজে তিনি তাদের বিবাহ দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে এমনি একটি বিবাহ দিয়েছেন শ্যামমোহিনী। এই বিবাহে বহুলোক নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেনও তিনি। যৌতুক দেওয়া থেকে যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি যথারীতি সম্পন্ন করেছেন। বিবাহে তাঁর কোন গোঁড়ামী নেই। অসবর্ণ বিবাহও দিয়েছেন। মানুষকে একান্ত আপন করে কাছে টেনে নেবার অদ্ভুত ঐশ্বরিকশক্তি ধরেন তিনি। নাহলে তাঁর পরিষদের গোড়া থেকে অর্থাৎ ১৯৩৫ সাল থেকে বালবিধবা কুসুম বসু আজও তাঁর পরিষদে তাঁকে ঘিরে জীবন কাটিয়ে দিতেন না; জীবন কাটিয়ে দিত না পাচক ঠাকুর হলধর ত্রিপাঠি। মাত্র ২০/২১ বৎসর বয়সে এসেছিল, আজ সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে, তবু শ্যামমোহিনীকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে পারে না সে। দীর্ঘজীবন স্ত্রী ছেলে মেয়ে ছেড়ে পরিষদের সেবায় কাটিয়ে দিল। শেষদিন পর্যন্ত থাকবে বলে মনস্থ করেছে সে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পরিষদ গ্রন্থাগার ও পত্রিকা বিভাগ

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন : "জ্ঞান হচ্ছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ঐক্য।.........জ্ঞানের সূত্রই হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের পরিচয় লাভের একমাত্র সূত্র। একের চিন্তার সঙ্গে অপরের চিন্তার যোগসাধনা। একের ভাব অনুভূতির সঙ্গে অপরের ভাব অনুভূতির বিনিময়। একের সাধনা গবেষণার সঙ্গে দশের পরিচয় একমাত্র শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়েই সম্ভব। একে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের সত্যিকারের ঐক্য গড়ে উঠে। এবং এই ঐক্য ও পরিচয় সাধনের তীর্থভূমি হচ্ছে গ্রন্থাগার।"

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন : "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের দুঃখদুর্দ্দশার মূল কারণ অশিক্ষা,......আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যাপারে বাধা খাওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, চরে খাওয়ার অর্থাৎ যেমন ইচ্ছা জ্ঞান আহরণের সুযোগ নাই।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'জ্ঞানার্জনের জন্য বাজে বই অর্থাৎ পাঠ্য তালিকাভুক্ত পুস্তক ভিন্ন অন্য বই পড়' বলে পরামর্শ দিয়ে বলতেন, "যারা আপন চেষ্টার বলে মানুষ হয় তারাই মানুষ। পুরুষকার আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আমার মনে দৃঢ়তা, আমার একনিষ্ঠতা আমার অধ্যবসায়, উদ্যোগ ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আমার সফলতা বা নিস্ফলতার জন্য অপর কেহই দায়ী নহে, আমি নিজেই দায়ী।"

জ্ঞানতপস্বিনী শ্যামমোহিনীও আশৈশব অনেক অনেক বই পড়েছেন। বই থেকেই তিনি তাঁর এই বিপুল কর্ম করার অধিকাংশ

প্রেরণা লাভ করেছেন। পূর্বেই আমরা সেসব ঘটনা উল্লেখ করেছি। তিনি তাঁর পরিষদের মেয়েদেরও এভাবে পাঠ্য-পুস্তক ছাড়াও অন্য বই পড়ে জ্ঞানার্জন করার সুযোগ লাভ করার সুবিধা করে দেবার জন্য একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা বহুপূর্বেই নিয়েছেন।

বর্তমানে প্রাসাদোপম ত্রিতলবিশিষ্ট কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের দ্বিতলের সম্মুখভাগে একটি সুবৃহৎ হল কক্ষ আছে। ঐ কক্ষে কেবল মাত্র মহিলাদের জন্য রিডিংরুমসহ বৃহৎ ঐ গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা করবেন বলে মনস্থ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে কয়েক হাজার বইও ইতিমধ্যে সংগ্রহ করে রেখেছেন তিনি। বর্তমানে পরিষদের আড়াই হাজার মেয়ে ঐ গ্রন্থাগারের জন্য সংগৃহীত পুস্তকাদি পাঠ করে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করার সুবিধা লাভ করে চলেছে। তাঁর পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে হস্তলিখিত পত্রিকা ও প্রাচীর পত্র প্রকাশ করে থাকে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এবং লেখিকাদের লিখন-শক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্য এই গ্রন্থাগার বিভাগের তরফ থেকে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনাও রয়েছে শ্যামমোহিনীর। এই বৎসরই তার শুভ সূচনা করবেন বলে আমাকে জানালেন তিনি।

পরিষদের মেয়ে ছাড়াও বাইরের মেয়েরাও যাতে এই গ্রন্থাগারে এসে পড়াশুনার সুযোগ পায় মূল এই উদ্দেশ্য নিয়েই শ্যামমোহিনী গ্রন্থাগারটি পাবলিক গ্রন্থাগারে পরিণত করার ব্যবস্থাদি সব করে রেখেছেন। বৃহত্তম সংখ্যক নারীর বৃহত্তর কল্যাণের জন্য সদাসর্বদা তাঁর প্রতিটি পরিকল্পনা ক্রিয়াশীল। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তার ত্রুটি করেন নি তিনি।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নারী কল্যাণ আশ্রমের ভার

২২।৪ এ, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোডে নারী কল্যাণ আশ্রম নামে একটি আশ্রম ছিল। সেখানে অনেক দুঃস্থা অনাথিনী সমাজপরিত্যক্তা নারী থাকত। সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী নামে জনৈক পরোপকারী শিক্ষাব্রতী ঐ আশ্রম পরিচালনা করতেন।

প্রসঙ্গক্রমে নারী কল্যাণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা কিছু না বললে কি অসামান্য মহানুভবতা নিয়ে কত বাধাবিঘ্ন কলঙ্ক নিন্দা গ্লানি-অপযশ, অনাদর প্রভৃতি শিরোধার্য করে সবপ্রথম সমাজের পতিতা নারীদের উদ্ধার করে এনে তাদের মানসিক সর্বরকম অধিকার দেবার জন্যে নারী কল্যাণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সে-যুগের কতিপয় নারীকল্যাণকামী মহান ব্যক্তি, তা সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না। এই আশ্রমের নাম ছিল তখন নারী কল্যাণ সমিতি।

ব্রাহ্মবান্ধব কেশব সেনের কতিপয় অনুগামী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন মূলতঃ নারীর কল্যাণের জন্য। এঁদের অসামান্য প্রচেষ্টা তুলনাহীন। এঁদের মধ্যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (যাকে অবলা বান্ধব বলা হত) ও কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন। এই সব নারীহিতৈষী ব্যক্তি সমাজের পতিতা মেয়েদের পতিতালয় থেকে উদ্ধার করে এনে তাদের সমাজে স্থান দেন। তাঁদের এ দুঃসাহসিক কল্যাণ কার্যে সর্বান্তঃকরণে সক্রিয় সাহায্য ও সহায়তা করেন শিবনাথ শাস্ত্রী ও দুর্গামোহন দাশ (লেডী অবলা বসুর পিতা) প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী উদার মহান ব্যক্তি।

দুর্গামোহন দাশ তাঁর স্বীয় বাসস্থানে এইসব পতিতা মেয়েদের স্থান দেন। আর তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মময়ী দেবী স্বামীর একাজে প্রভূত সহায়তা করেন এই সব সমাজপরিত্যক্তা মেয়েদের কন্যাজ্ঞানে স্থান

দিয়েও তাদের শিক্ষা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা ক'রে। এজন্যে সমাজের কাছে তাঁদের কম লাঞ্ছনা-অবজ্ঞা সহ্য করতে হয়নি।

আজ নারীপ্রগতির যুগ। কিন্তু সেই অশিক্ষা এবং কুসংস্কারের অন্ধকার যুগে নারীপ্রগতির হোতা এইসব মহান ও মহীয়সীদের শ্রদ্ধার অতুলনীয় অবদানই যে নারীকে গৌরবদান করেছে তা একদিকে যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

১৯২৪ সাল। মহাপ্রাণ কৃষ্ণকুমার মিত্র নারী রক্ষা সমিতি (Women's Protection League or Nari Raksha Samiti) গঠন করেন পতিতা অত্যাচারিতা নারীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্যে।

এই সংস্থার ১৯২৬ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই ধরণের অত্যাচারিতা মেয়েদের সংখ্যা ছিল তখন ৭০১২। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীর উপর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে যে অত্যাচার করত নিম্নের বিবরণ থেকে তার একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাবে :

অত্যাচারিতা নারীর সংখ্যা :

হিন্দু কর্তৃক হিন্দু নারীর উপর অত্যাচারের সংখ্যা	৩৫১৩
হিন্দু কর্তৃক মুসলমান নারীর উপর অত্যাচারের সংখ্যা	৩৯
মুসলমান কর্তৃক মুসলমান নারীর উপর অত্যাচারের সংখ্যা	৩২৯৯
মুসলমান কর্তৃক হিন্দু নারীর উপর অত্যাচারের সংখ্যা	৬৮৬
হিন্দু-মুসলমান ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের নারীর উপর অত্যাচারের সংখ্যা	১৭২৮
কিন্তু এ ছাড়াও হিন্দু কর্তৃক হিন্দু নারীর উপর অত্যাচারের সংখ্যা ছিল	১৩১
মুসলমান কর্তৃক মুসলমান নারীর উপর অত্যাচারের সংখ্যা ছিল	৩৩৭
উভয় মিলে	৫৪

এর মধ্যে আইনের সাহায্য নেওয়া হয় ৭৫টি কেসে।

১৯৩৫-৩৭ সালের রিপোর্টে ২০টি চাঞ্চল্যকর কেস ছিল। ক্রমাগত লেগে থাকার ফলে নারীর উপর এ ধরণের অত্যাচার অনেক কমে যায় —লীগের ১৯৩৬-৩৭ সালের রিপোর্ট থেকে এই তথ্য আমরা জানতে পারি। দুর্গত ঐ সমস্ত নারীদের রক্ষার জন্যে নারী কল্যাণ আশ্রম গঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের মৃত্যুর পর এর শক্তি কমে গেলেও এই আশ্রম তখনও ছিল। পরবর্তীকালে এই আশ্রম উপযুক্ত পরিচালনা ও অর্থাভাবে গুরুতর বিপন্ন অবস্থায় পড়ে। গভর্ণমেণ্ট তখন এই আশ্রমের ভার শ্যামমোহিনীকে অর্পণ করেন।

বহু ব্যক্তি এই আশ্রমের ভার নেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট শ্যামমোহিনীর পরিচালনা ও কর্মশক্তির দক্ষতার সঙ্গে পূর্বেই পরিচিত থাকায় শ্যামমোহিনীকেই এই আশ্রমের ভার দিলেন। নারীকল্যাণ আশ্রমের পুরাতন মেয়েদের গভর্ণমেণ্ট ভ্যাগ্রাণ্ট হোমে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের পরিবর্তে অভিভাবক-সম্পন্না দুঃস্থা নতুন মেয়েদের পাঠালেন।

১৯৫৫ সালে শ্যামমোহিনীর তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় আশ্রমটি সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে। এর নতুন নাম হল নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদ ওয়েলফেয়ার হোম। এই সমস্ত মেয়েদের শিক্ষার জন্যে দুটি স্কুল স্থাপন করলেন শ্যামমোহিনী। একটি পরিষদ গার্লস প্রাইমারী স্কুল। অন্যটি পরিষদ গার্লস জুনিয়র হাই স্কুল। এবং এই সঙ্গে পরিষদ শিল্প বিদ্যালয়ও স্থাপন করলেন তিনি।

এই সময় শ্যামমোহিনী ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটার পর একটা মেয়েদের স্কুল স্থাপন করতে লাগলেন। পরিষদ গার্ল্‌স প্রাইমারী স্কুল ও পরিষদ জুনিয়র গার্ল্‌স হাই স্কুলে স্থানীয় পল্লীবাসীর নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের গরীব দুঃস্থা মেয়েরাই লেখাপড়ার সুযোগ বেশী পায়।

এখানকার অধিকাংশ মেয়েরাই ফ্রি ও হাফ ফ্রিতে পড়াশুনা

করে। কিন্তু স্কুলের আয় সীমিত। এ দিয়ে স্কুল চালানো যায় না। এজন্যে বাদবাকী যাবতীয় খরচ শ্যামমোহিনী বহন করেন। ওয়েল-ফেয়ার হোমের জন্য গভর্নমেন্ট কিছু গ্র্যান্ট দেন। কিন্তু যে যৎসামান্য গ্র্যান্ট পাওয়া যায় তা দিয়ে মেয়েদের কয়েক দিনও চলে না। ফলে বাকী খরচখরচা যা লাগে তা শ্যামমোহিনী নিজেই বহন করেন। এই সব দুঃস্থা বিপন্ন মেয়েদের মুখ চেয়ে তিনি এ ভারও আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন।

১৯৫৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পরিষদ জুনিয়র গার্লস হাইস্কুলটি ২২।৪এ, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোডের ঐ বাড়ীতেই চলছিল। কিন্তু ছাত্রী সংখ্যা কমে যাওয়ায় ২০।২এ, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোডে পরিষদ স্কুল ফাইনাল সেকশানের অন্তর্ভুক্ত করলেন শ্যামমোহিনী। এখানে বয়স্কাদের সর্টকোর্সে স্কুল ফাইনাল কোর্স পড়ানো হয়।

কিন্তু পরিষদ গার্লস প্রাইমারী স্কুলটি ও পরিষদ ওয়েলফেয়ার হোম (চিলড্রেন) এই দুটি প্রতিষ্ঠানই ২২/৪এ, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোডে অবস্থিত। এই হোমে প্রায় দুই শতাধিক মেয়ে থেকে পড়াশুনা করে।

ষড়বিংশ অধ্যায়

বাণীপীঠ স্কুল-কলেজ ও ছাত্রীনিবাস

বাণীপীঠ গার্লস স্কুল হায়ার সেকেণ্ডারীতে উন্নীত

১৯৫২ সালে বাণীপীঠ গার্লস হাইস্কুল ও বোর্ডিং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট থেকে ২০/২এ, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোডে নবনির্মিত বাড়ীতে উঠে আসে। শিক্ষাবিভাগের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী স্কুলটি ১৯৫৭ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নীত হয়। এতে বিজ্ঞান, হিউম্যানিটিজ ও হোম সায়েন্স পড়ানো হয়। উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষকগণ কর্তৃক ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং প্রতি বৎসরই পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। বাণীপীঠ গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা অন্যূন এক হাজার। অন্যান্য স্কুল ও বিভাগ সমেত সব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীসংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

নিম্নলিখিত সদস্যা-সদস্য নিয়ে পরিষদের বর্তমান কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে ঃ

১। ডাঃ অশোক কুমার চৌধুরী—সভাপতি

২। পূর্ণিমা ব্রহ্মচারী—সহ-সভানেত্রী

৩। শ্যামমোহিনী দেবী—প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা

৪। অমল কুমার চৌধুরী—সহ-সম্পাদক

৫। সুপ্রীতি সান্যাল—সদস্য

৬। ধীরেন্দ্র কুমার গুহ—সদস্য

৭। ভবতোষ ভট্টাচার্য—সদস্য

৮। শিবদাস ব্যানার্জী—সদস্য

৯। শোভনা চৌধুরী—সদস্যা

এ ছাড়া ২০/২এ ও ২২/৪এ, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোডেও পরিষদ হোমের বয়স্কা ও শিশু মেয়েরা থাকে। উভয় ঠিকানায় হোমের মোট ছাত্রীসংখ্যা বর্তমানে ৪৮০। এদের তত্ত্বাবধানের জন্য বিভিন্ন

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আছেন। ২২/৪এ, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোডের জমির পরিমাণ ৪০ কাঠা এবং ২০/২এ, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোডের জমির পরিমাণ ১০০ কাঠা। বর্তমানে পরিষদের অন্তর্গত সমস্ত জমির পরিমাণ ১৪০ কাঠা।

পরিষদ ছাত্রীনিবাস

পরিষদ ছাত্রীনিবাস ভবনটি দ্বিতল। এখানে দেড় শতাধিক মেয়ের নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা আছে। এখানকার বিশেষত্ব হল স্কুলকলেজে পড়াশুনা করা ছাড়াও অতিরিক্ত বিষয়, যেমন—ফার্ষ্ট এড, সেলাই, সঙ্গীত, নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত, হোম নার্সিং, রন্ধন, শিবপূজা, স্তোত্র পাঠ প্রভৃতি ইচ্ছাধীন বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিতর্ক সভা, নাটকানুষ্ঠান, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, পত্রিকা সম্পাদন প্রভৃতি পাঠ্যসূচীবহির্ভূত ব্যবস্থা দ্বারা ছাত্রীগণের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা হয়।

শ্যামমোহিনী দেবী গার্লস কলেজ

শিক্ষা বিস্তারই যাঁর একান্ত কাম্য সেই শ্যামমোহিনী শুধু স্কুল পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষাকে সীমিত করে রেখে তৃপ্তি পান না। অদম্য জ্ঞানপিপাসু শ্যামমোহিনী ১৯৬৮ সালে একটি গার্লস কলেজ স্থাপন করেন। পরিষদ কর্তৃপক্ষ কলেজটির নাম দেন শ্যানমোহিনী গার্লস কলেজ। প্রি-ইউনিভারসিটি ও বি. এ. কলা বিভাগ নিয়ে প্রথমে কলেজটি আরম্ভ করা হয়। দক্ষ অধ্যাপিকাদের সুনিপুণ শিক্ষা-পদ্ধতিগুণে কলেজের সেণ্ট পারসেণ্ট মেয়ে পাশ করে। ১৯৬৮ সালে আরম্ভ হয়ে কলেজটি ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে চলছিল। কিন্তু অনিবার্যকারণ বশতঃ ঐ বৎসরই কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। ভবিষ্যতে পুনরায় পরিষদ এই মহিলা কলেজ স্থাপন করবেন বলে পরিকল্পনা করে রেখেছেন।

এই সঙ্গে মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের প্ল্যানও শ্যামমোহিনীর মাথায় রয়েছে। এভাবে একটার পর একটা প্রতিষ্ঠান বাড়িয়েই চলেছেন শ্যামমোহিনী। এই বৎসরই নাট্যশিক্ষা, নৃত্য, সঙ্গীতের ডিপ্লোমা কোর্সের স্বতন্ত্র বিভাগ খুলছেন তিনি। এজন্যে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী ইতিমধ্যে নিযুক্ত করেছেন। তিনি এই সব প্রতিষ্ঠান গঠন করতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্নানাহার ভুলে একাকী যেভাবে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন কোন কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা হয় না। তাঁর সে অক্লান্ত প্রচেষ্টা যে-কোন প্রতিষ্ঠান গঠনে অনুসরণীয়।

গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন

পরিষদের অন্তর্গত কলকাতায় উল্লিখিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছাড়াও গ্রামে গ্রামে কয়েকটি স্কুল স্থাপন করেন শ্যামমোহিনী। এগুলি হল কুচবিহারের নিউটাউনে, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ও ২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গায়। এগুলিকে পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার জন্যে এর পরিষদের কর্মীদের সহযোগিতা আহ্বান করেন তিনি।

পরিষদ মহিলা শিল্প প্রদর্শনী

প্রতি বৎসর শ্যামমোহিনীর জন্মজয়ন্তী পালন উপলক্ষে পরিষদের তরফ থেকে শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর জিনিস-পত্রের সব কিছু পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের মেয়েদের হাতের কাজ, মডেল তৈরী, বিজ্ঞান-বিষয়ক দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি। বিগত ১৯৬৭ সাল, ৩০শে জানুয়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এক সপ্তাহকাল ধরে পরিষদ এক বিরাট শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই শিল্প প্রদর্শনীতে শ্যামমোহিনীর পরিষদের মহিলা শিল্পী ছাড়াও বিভিন্ন

উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, উদ্বাস্তু আশ্রম, অরফ্যানেজ মহিলা সমিতিসমূহ ও স্বতন্ত্র মহিলা শিল্পীগণও এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। প্রদর্শনীতে একমাত্র মহিলাদের স্বহস্তনির্মিত শিল্প ও কারুকার্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। সেগুলির উৎকর্ষ অনুযায়ী পুরস্কারও বিতরণ করা হয়। প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্তাদের তালিকায় ছিলেন মহিলা শিল্পাশ্রম, বাণীপীঠ শিল্পবিদ্যালয়, বাণীপীঠ শর্ট ম্যাট্রিক স্কুল, নিউ ব্যারাকপুর কলোনি সনাতন ভবন প্রভৃতি। এছাড়া ব্যক্তিগত উৎকর্ষের জন্য বহু মহিলা বিশেষ পুরস্কার অর্জন করেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী পুণ্য দিবস

১০ই ফেব্রুয়ারী দিবসটি আমাদের নিকট বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ এই দিনে পুণ্যবতী শ্যামমোহিনী এই ধরাধামে আবির্ভূত হন। পুণ্যকামী মানুষ যেমন বৎসরান্তে একবার গঙ্গাস্নান করে পুণ্য সঞ্চয় করেন তেমনি প্রতি বৎসর তাৎপর্যপূর্ণ ১০ই ফেব্রুয়ারী দিনটিতে শ্যামমোহিনীর জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্য করে তাঁর পরিষদের কর্মীবৃন্দ ও ছাত্রীগণ এই পুণ্যদিবস রূপে পালন করেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁরা সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন উৎসব, যথা, নৃত্যনাট্য, সঙ্গীত, নাটক, শিল্প-প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্যামমোহিনীর ত্যাগপূত জীবনের প্রতি এই বলে তাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন:

"শিক্ষাযজ্ঞের সার্থক ঋত্বিক তুমি, চরিত্রাদর্শে তুমি প্রাচীন ভারতের নারীসমাজের সুমহান ঐতিহ্যের যোগ্যা উত্তরাধিকারিণী, তুমি মহীয়সী, তুমি আমাদের জীবন ধন্য করেছ, আমরা তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

"আজ তোমার জন্মদিনের পুণ্যলগ্নে তোমার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী আমরা সমবেত হয়ে তোমাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। শিক্ষা-জগতে তোমার অবিস্মরণীয় কীর্তি কৃতিত্বের বেদীমূলে

স্বীকৃতির অর্ঘ্যদান করতে আমরা আগ্রহী। প্রাণের শ্রদ্ধারসে সম্পৃক্ত আমাদের এই দীন অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর।

"তোমার ঋণ অপরিশোধ্য, তথাপি তোমাকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুযোগ দান করে তুমি আমাদিগকে ধন্য কর।"

মহীয়সী শ্যামমোহিনীর জন্মজয়ন্তী পালন উপলক্ষে তাঁর পরিষদ কর্মীবৃন্দ, গুণগ্রাহী, শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ ও ছাত্রীরাই কেবল তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন না,—এই উপলক্ষ্যে সমাজের উচ্চপদস্থ ও বহু গণ্যমান্য শিক্ষাব্রতীগণও উপস্থিত থেকে নারীজাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে উৎসর্গীকৃত শ্যামমোহিনীর জীবনের বিশেষ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারকল্পে দীর্ঘজীবনব্যাপী অসামান্য তাঁর সেবা ও সুমহান ত্যাগাদর্শে কেবল নারীজাতি নয়, সমগ্র দেশবাসীকে আত্মনিয়োগ করতে তাঁরা আহ্বান জানান এবং শ্যামমোহিনীর প্রতি তাঁদের অন্তরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তিনম্র প্রণাম জানান।

শ্যামমোহিনীর পরিষদের বিভাগগুলিতে মেয়েদের হাতের তৈরী শিল্পসামগ্রী, কুটির শিল্প, তাঁত মেসিন, মোমবাতি, চরকায় সুতো কাটা প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে চারুকলা, কারুকলা ও হাতেকলমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মত দুরূহ বিষয়গুলি এবং পুঁথিগত পাঠ্য-বিষয়গুলিও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা-জগৎ সম্বন্ধে ইদানিং আমাদের মনে যে নৈরাশ্যের চিত্র ভেসে ওঠে, শিক্ষাজগৎ সম্বন্ধে অবক্ষয়ের যত নৈরাশ্যের ছবি আমাদের অন্তরকে নিয়ত পীড়া দেয়, ঐ শিক্ষাব্যবস্থা দেখে সে নৈরাশ্য থেকে মন মুক্তি পায়। শিক্ষা-জগতের সর্বত্রই যে অপহ্নব ঘটেনি নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়।

শিক্ষাজগতের দূষিত আবহাওয়া থেকে শ্যামমোহিনী তাঁর শিক্ষায়তন বাঁচিয়ে দেশের এক কোণে বসে নিঃশব্দে নীরবে নিভৃতে শিক্ষার্থিনীদের নালন্দাতক্ষশীলার আদর্শে শিক্ষাদানের অতন্দ্র সাধনা করে চলেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পরিষদের শিক্ষাপদ্ধতি প্রমাণ করে যে, তিনি শিক্ষাজগতের একজন বিশিষ্ট কর্ণধার।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্যে

শ্যামমোহিনী যাঁদের সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হ'ল।

দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে

১৯২১ সাল। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাস, গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন।

মহিলা নেতৃ মোহিনীদেবী ছাড়াও মহিলা ডেলিগেট হিসাবে পাবনা থেকে শ্যামমোহিনী কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোগদান করেন। এখানেই চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে শ্যামমোহিনীর আলাপ হয়।

এই অধিবেশনে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুমুসলমান একত্রে মিলেমিশে কাজ করার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হয়। হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট হয়। পাবনায় থাকা কালে শ্যামমোহিনী কংগ্রেসের যত মিটিং হয়েছে সেখানে যোগদান করেন। কলকাতায়ও যত মিটিং হয়েছে তিনি সেখানেও যোগদান করতেন।

মোহিনীদেবী শ্যামমোহিনীর নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশন থেকে ফিরে এসে দেশবন্ধু তাঁর ৫০।৬০ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করেন এবং সেই সঙ্গে রসারোডে অবস্থিত আপন বসতবাটীও জাতির সেবায় দান করেন। পরে এই বাড়ীতে যখন চিত্তরঞ্জন সেবা সদন নাম দিয়ে এক মহৎ কার্যের জন্য এক বিরাট হাসপাতাল করা হয়, তখন এর উদ্বোধন করতে উপস্থিত ছিলেন জননায়ক জওহরলাল
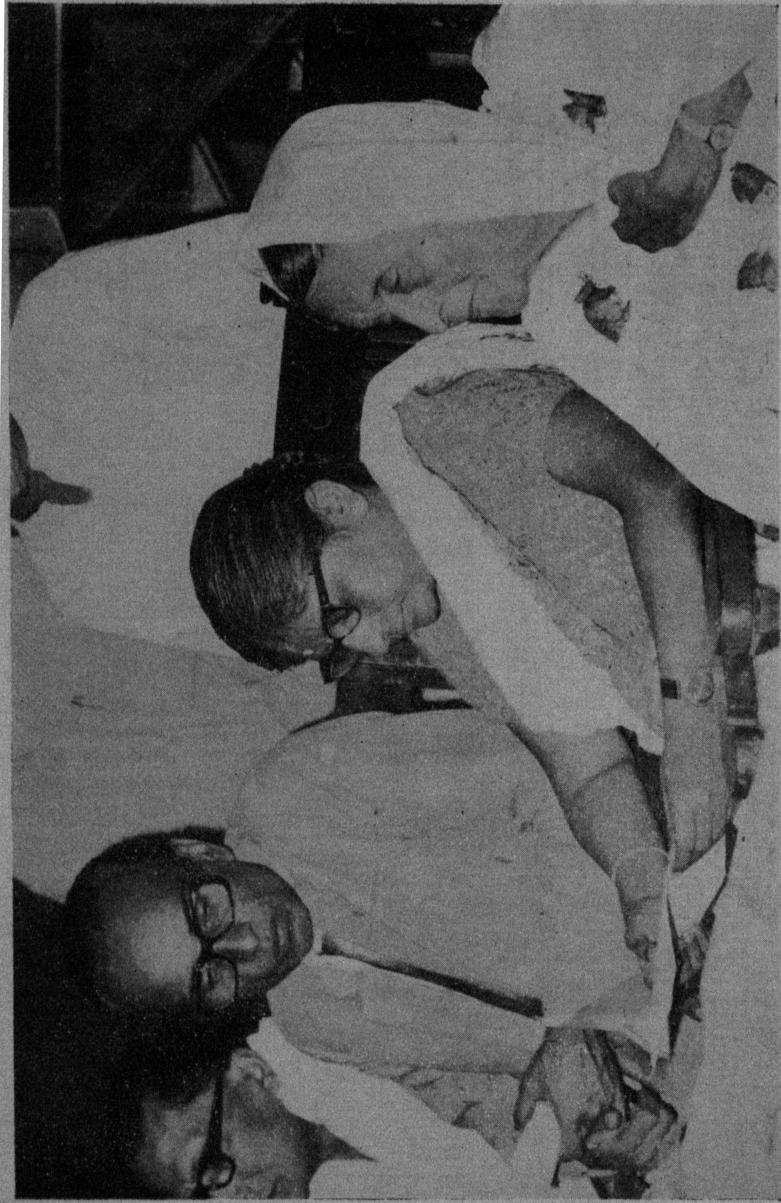
সেক্রেটারীর জন্মদিনে সমাজসেবক শ্রীগণেশ প্রসাদ সরফ, শ্রীনির্মলকুমার রায় (ডি. ডি. পি. আই. সেকেণ্ডারী এডুকেশন), শ্রীমতী অশোকা চ্যাটার্জী (ডি. আই. অব স্কুলস, সেকেণ্ডারী এডুকেশন), শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবী (একেবারে ডাইনে)
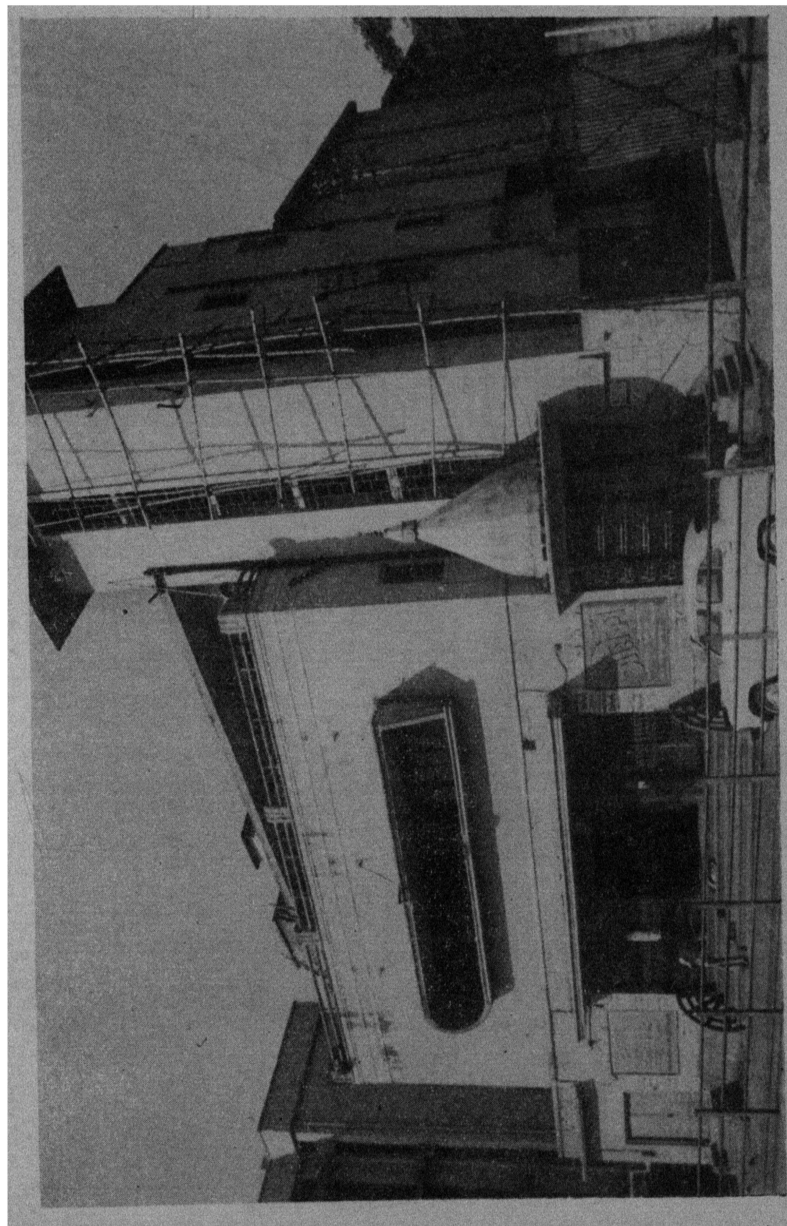
কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্রবধূ স্বর্গীয়া সুজাতা দেবী; ১৯৩৫ সাল থেকে পরিষদের সদস্যা ছিলেন।

পরিষদের পৃষ্ঠপোষক এবং প্রাক্তন ডি. ডি. পি. আই. (সোশ্যাল ওয়েল-ফেয়ার) শ্রীসুধীর কুমার ধর
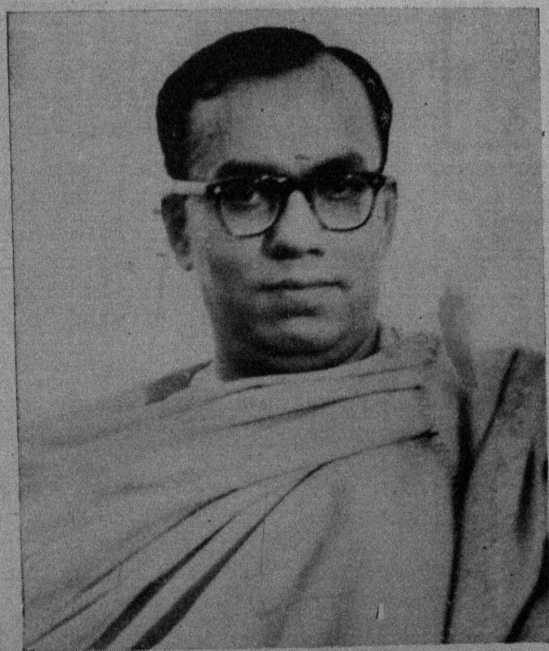
সাংবাদিক (পরিষদের পৃষ্ঠপোষক) শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

নেহেরুর পিতা এবং দানবীর দেশপ্রেমিক মতিলাল নেহেরু। শ্যামমোহিনীও এই শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সেদিন উপস্থিত ছিলেন। সেদিনটির কথা আজও তিনি শ্রদ্ধায় স্মরণ করলেন। এই সব মহান ব্যক্তিদের সান্নিধ্য তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেও খুব কাছে থেকে দেখার ও তাঁর কথা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে শ্যামমোহিনীর।

সমাজসংস্কারক, দেশব্রতী শিক্ষাবিদ এই মানুষটি কথা বলতে গিয়ে শ্যামমোহিনী অভিভূত হন।

'প্রবাসী' বের করার পূর্বে তিনি 'প্রদীপ' নামে এক পত্রিকা বের করেছিলেন। শ্যামমোহিনী প্রবাসী অফিসে গিয়ে প্রবাসী পত্রিকার গ্রাহক হন। এই উপলক্ষে মাঝে মাঝে তিনি প্রবাসী অফিসে যেতেন। অফিসটি শ্যামমোহিনীর পরিষদের খুব কাছেই ছিল।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সু-সাহিত্যিক কন্যাদ্বয় সীতাদেবী ও শান্তাদেবীর সঙ্গে এখানে শ্যামমোহিনীর পরিচয় হয়েছে এবং তাঁদের বহু লেখা তিনি অভিনিবেশ সহকারে পড়েছেন।

শ্যামাপ্রসাদ ও জাষ্টিস রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কংগ্রেসের বিভিন্ন মিটিং-এ শ্যামমোহিনীর সাক্ষাৎ হয়। তারপর তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জাষ্টিস রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ীতে যেতেন। কারণ তাঁর কাছে শ্যামমোহিনীকে পরিষদের স্কুল সংক্রান্ত যাবতীয় আইনের খুঁটিনাটির পরামর্শ নিতে হ'ত। রমাপ্রসাদবাবু বিনা পয়সায় আইনের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে শ্যামমোহিনীর পরিষদকে অনেক সাহায্য করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

মাননীয় এ. কে. ফজলুল হক থেকে তৎকালীন সব মুখ্যমন্ত্রীই শ্যামমোহিনীর পরিষদে এসেছেন এবং শ্যামমোহিনীও যখনই দেশে খরা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি বিপর্যয় হয়েছে, তখনই তিনি মুক্তহস্তে যথাসাধ্য দান করেছেন। এর অধিকাংশ দান তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীদের হাতেই দিয়েছেন। এই দানের মধ্যে ছিল খাদ্য ও অর্থ।

দুর্গাপূজা করতেন শ্যামমোহিনী। তার উদ্বোধন করতে কয়েকবারই বিজয়সিং নাহার এসেছেন।

বাসন্তী দেবী

বিদ্যাসাগর বাণীভবনে সুপারিনটেণ্ডেন্ট থাকাকালে বাসন্তী দেবীর সঙ্গে শ্যামমোহিনীর সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎ পরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

বাসন্তী দেবী বহুবার এখানে এসেছেন। তিনি লেডী বসুর নারী শিক্ষা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাসন্তী দেবী লেডী বসুর ভ্রাতৃবধূ ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন লেডী বসুর জ্যেঠতুত ভাই। বয়সে তিনি লেডী বসুর চাইতে ছোট ছিলেন।

এখানে এসে শ্যামমোহিনীর কর্মদক্ষতা দেখে বাসন্তী দেবী মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে আন্তরিক কথাবার্তা বলতেন। নারী শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতেন। এখানেই শ্যামমোহিনীর সাক্ষাৎ হয় দেশবন্ধু-ভগ্নী উর্মিলা দেবীর সঙ্গে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এঁদের অসামান্য অবদানের কথা আগেই বলেছি।

সুজাতা দেবী

চিত্তরঞ্জন দাশ ও বাসন্তী দেবীর পুত্র বধূ সুজাতা দাশ শ্যামমোহিনীর পরিষদের সঙ্গে প্রায় গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রায়ই পরিষদে আসতেন এবং এর কার্যকলাপ দেখে প্রেরণা লাভ করেন।

তিনি নিজে দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয় ও তার বিভিন্ন বিভাগ স্থাপন করেন এবং একটি গ্রামে প্রসূতি সদন স্থাপন করেন। তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে আমৃত্যু ব্যাপৃত ছিলেন।

সুপ্রভা রায়চৌধুরী

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর স্ত্রী সুপ্রভা রায়চৌধুরীর সঙ্গে শ্যামমোহিনীর বন্ধুত্ব ছিল। শ্যামমোহিনী যখন (১৯৩০) বিদ্যাসাগর বাণী ভবনে শিক্ষকতা করতেন, সেই সময় সুপ্রভা রায়চৌধুরীও নারী শিক্ষা সমিতির মেয়েদের সঙ্গীত ও সেলাই শেখাতেন এবং পড়াতেনও।

সুপ্রভা রায়চৌধুরীর পুত্র সত্যজিৎ রায় সিনেমা জগতে একটি সার্থক নাম।

শ্যামমোহিনী সুপ্রভা রায়চৌধুরীর কথা বলতে গিয়ে বললেন, "নিজে এত গুণের অধিকারিণী ছিলেন বলে পুত্র সত্যজিৎ রায় এত গুণের অধিকারী হয়েছেন।"

বীরাঙ্গনা জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ নির্মাণের পূর্বে শ্যামমোহিনীর জন্মদিন পালিত হত সাধারণতঃ ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউট হলে। সেবার তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে যে নাটকটি তাঁর পরিষদের সঙ্গীত সঙ্ঘের মেয়েরা অভিনয় করে সেটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'। এই নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন বীরাঙ্গনা জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়। জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের সুনিপুণ পরিচালনায় নাটকটি সুঅভিনীত হয় এবং দর্শকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। সম্ভবতঃ ১৯২৭/২৮ সালে পাবনার মহিলা সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে কলকাতা থেকে জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়কে সভানেত্রী রূপে আমন্ত্রণ করে নিয়েগিয়েছিলেন শ্যামমোহিনী। সেই থেকে তাঁদের মধ্যে হৃদ্যতা জন্মে।

এই অনুষ্ঠানে বাংলার তৎকালীন গভর্ণর রাজাগোপালাচারী উপস্থিত ছিলেন।

এই উপলক্ষে যে বিচিত্রানুষ্ঠান হয়েছিল তাতে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের স্ত্রী নৃত্যশিল্পী অমলা শংকর। তখন অবশ্য তাঁর বিবাহ হয়নি। অমলা শংকরের মা-বাবার সঙ্গে শ্যামমোহিনীর বাণীভবনে থাকাকালে আলাপ ছিল।

কস্তুরবা গান্ধী

১৯৪৬ সালে গান্ধীজী যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা গান্ধীও এসেছিলেন। শ্যামমোহিনী অতি কাছ থেকে তখন কস্তুরবাকে দেখেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রর্দশন করেন।

রাজাগোপালাচারী

পশ্চিমবাংলার গভর্ণর রাজাগোপালাচারী কয়েক বারই শ্যামমোহিনীর পরিষদ পরিদর্শনে আসেন, পরিষদের কার্যাবলী দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং পরিষদকে সাহায্য করেন। তাঁর সময় শ্যামমোহিনী অনেকবারই রাজভবনে গিয়েছেন।

কৈলাসনাথ কাটজু

পশ্চিম বাংলার গভর্ণর (১৯৫১) কৈলাসনাথ কাটজুর সঙ্গে শ্যামমোহিনীর হৃদ্যতা ছিল। তিনি বহুবার পরিষদ পরিদর্শন করেন এবং শ্যামমোহিনীকেও রাজভবনের বিভিন্ন মিটিং-এ নিমন্ত্রণ করেন। শ্যামমোহিনীও সেখানে উপস্থিত থেকে প্রচুর উপকৃত হন।

১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পরিষদের প্রসপেকটাস থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের অভিমত সন্নিবিষ্ট করা গেল। এরূপরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এখানে এসেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মন্তব্য পুস্তক হারিয়ে যাওয়ায় তাঁদের সে মন্তব্য এখানে উপস্থাপন করা সম্ভব হল না। সেজন্য আমরা দুঃখিত।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী

শ্যামমোহিনীর পরিষদে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে তা দেখে দেশপ্রেমিক, শিক্ষাব্রতী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর কথা মনে পড়ে। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে এই দেশব্রতী মানুষটি কতভাবে না তৎকালীন পরাধীন দেশের মানুষকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দেশপ্রেম, সাহস, বীর্য, জাতীয়তাবোধ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করে তোলার অসামান্য প্রচেষ্টা চালিয়ে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করে গেছেন।

শ্যামমোহিনীর সঙ্গে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ভবনে (কলেজ ষ্ট্রীট) প্রায়ই ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বিভিন্ন স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দেশপ্রেম, বিজ্ঞান, জাতীয়তাবোধ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। শ্যামমোহিনী স্বয়ং তাঁর পরিষদের ছাত্রীদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে বহুবারই তা শুনেছেন। শ্যামমোহিনীর আমন্ত্রণে তাঁর পরিষদে এসেও কয়েকবারই জ্ঞানাঞ্জনবাবু বক্তৃতা করে গেছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শ্যামমোহিনী যথার্থই বলেছেন, কতলোকের নিকট কত উপকার পেয়েছি, কত মহান ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেছি, তাঁদের কার্যকলাপ দেখে প্রেরণা পেয়েছি সে কী আর সব বলা যায়। আমার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আচার্য পি. সি. রায়, স্বনামধন্য বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের কন্যা অমিয়া দেব প্রভৃতি। অভীঃ মন্ত্রের উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আমার উপাস্য দেবতা। তাঁর মানস দুহিতা সিস্টার নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত বাগবাজার বালিকা বিদ্যালয়ে কতবার গিয়েছি, তার পরিচালনা ও শিক্ষাপদ্ধতি দেখে প্রেরণা লাভ করেছি। এখানকার কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করে বিস্মিত হয়েছি। একজন বিদেশিনী মহিলা ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা, ধ্যানধারণার প্রতি সুগভীর

শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং একাত্ম হয়ে এ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিবেদন করেন। তাঁর সে আদর্শ আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। শুধু আধ্যাত্মিকতায় নয়—পরাধীন ভারতবাসীর স্বাধীনতাসংগ্রামে·নেতৃত্ব দিয়ে যেভাবে তিনি এদেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাতে ভারতবাসীমাত্রই নিবেদিতার কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

নেতাজী

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকেও ঘরোয়া পরিবেশে খুব কাছ থেকে দেখার ও তাঁর কথা শোনার সুযোগ হয়েছিল শ্যামমোহিনীর। কি করে সম্ভব হয়েছিল তা বলতে গিয়ে শ্যামমোহিনী বললেন:

"সম্ভবতঃ ১৯২৯ সাল। সুভাষচন্দ্র বসু পাবনায় এসেছেন একটি মিটিং উপলক্ষ্যে। তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে শীতলাইয়ের জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়ীতে। শীতলাইয়ের জমিদারপত্নী সরলা দেবী তখন আমার পাবনা মহিলা সমিতির একজন সক্রিয় সদস্যা। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি গিয়ে সরলা দেবীর সঙ্গে একত্র রান্না-বান্না করি এবং সুভাষচন্দ্রের আহারের সময় উপস্থিত থেকে আমরা নিজহাতে পরিবেশন করে তাঁকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাই এবং তাঁর সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ পাই। এরপর পাবনার টাউনহলে পাবনার মহিলা সমিতির মহিলাদের নিয়ে গিয়ে তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হই। পরে কলকাতায় কয়েকবারই তাঁর অন্তর্ধান হবার আগে বক্তৃতা শুনেছি। তাঁর সেদিনের তাজা প্রাণের সে উদাত্ত আহ্বান, দেশের মানুষকে দেশপ্রেমে জীবন বলিদান করার আহ্বান আজও প্রাণে ঝঙ্কার তোলে। দেশপ্রেমিক এই মানুষের পক্ষেই দেশের স্বাধীনতার জন্যে জীবনবলিদান সম্ভব। দেশে তাঁর মত মানুষের আজ বড়ই অভাব দেখা দিয়েছে

কথায় কথায় শ্যামমোহিনী কিছুটা উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। তাঁকে অন্যমনস্ক করতে আমি বলি, আপনি পাবনায় তখন কি করতেন ?

"কেন, আমি তখন শিক্ষকতা করতাম। কিন্তু সব কিছু কি আর মনে আছে ? তবে এই সব মহান ও মহীয়সীদের মহৎ জীবনের আদর্শ ও সান্নিধ্য আমাকে সর্বদা শিক্ষাবিস্তার করার প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করে মানুষ গঠন করব এই ছিল আমার একমাত্র ধ্যানধারণা। একাজে যেখানে যার যা কিছু ভাল দেখেছি তাকে একান্তভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছি আর যা বর্জনীয় মনে করেছি বর্জনও করেছি নিঃসঙ্কোচে।"

শ্যামমোহিনীর এসব কথার যথার্থতার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি। তৎকালীন বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি তাঁর প্রাণের একান্ত আকুতি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।

শ্যামমোহিনীর পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষাপ্রণালী যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকরণীয়। এখানকার শিক্ষার একটি অভিনবত্ব আছে, একটি সার্বজনীনতা আছে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ধারা অনুসরণ করে শ্যামমোহিনী তাঁর পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রীদের সেইমত শিক্ষা দেন। সে শিক্ষা ধারার মর্মার্থ হ'ল :

"নিজে জ্ঞান অর্জন করবে, সেই জ্ঞান অপরকে বিতরণ করে সেবার দ্বারা অপরের দুঃখ ও অভাব যতক্ষণ তুমি না দূর করবে ততক্ষণ তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ সার্থক হবে না।" শিক্ষার এই মূলমন্ত্রটি শ্যামমোহিনী বীজমন্ত্রের মত প্রারম্ভেই তাঁর ছাত্রীদের ও অধীনস্থ কর্মীবৃন্দের কানের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছে দেন। গুরুর সেই বীজমন্ত্র শিষ্যেরা অর্থাৎ কর্মী ও ছাত্রীবৃন্দ পালন করছে কিনা সেদিকে সদা জাগ্রত প্রহরীর ন্যায় তাঁর দৃষ্টি সজাগ থাকে। নিজে তৎপর বলে তাঁর পরিষদের কর্মীবৃন্দও সর্ববিষয়ে সমান তৎপর। স্বয়ং পরিষদের কর্মী ও ছাত্রীবৃন্দের সঙ্গে একত্রে থেকে পরিষদের খুঁটিনাটি

বিষয়েও যে জাগ্রত দৃষ্টি দেন আর কোন মহিলা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রীর এমন দৃষ্টি আছে বলে আমাদের জানা নেই।

শ্যামমোহিনীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল—শিক্ষাকে শুধু পুঁথিগত না করে হাতেকলমে ও শিল্পসংস্কৃতি, যথা—নৃত্য, সঙ্গীত, নাটকাদির অভিনয়, অঙ্কন প্রভৃতির মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন তিনি।

শিল্প ও সংস্কৃতির অর্থ হল একে অন্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কের উপলব্ধি। এই উপলব্ধিকে বাস্তবরূপ দিতে যে সাধনা, যে উদ্যম ও বিচিত্র কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজন, সেসবগুলিই শ্যামমোহিনীর পরিষদে পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করা হয়। এই শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার কাজ ও উদ্যমের মধ্য দিয়ে একটি অপরিমেয় শান্তির পরিমণ্ডল এখানে বিরাজিত। গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর পরিষদের শিক্ষাপ্রণালী যে-কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় বিশিষ্টতার দাবী রাখে।

দাতব্য চিকিৎসালয়

বর্তমানে পরিষদের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। পূর্বে এই দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে পরিষদের ছাত্রী ও কর্মী ছাড়াও স্থানীয় ও বাইরের দরিদ্র মানুষ চিকিৎসার সুযোগ লাভ করত কিন্তু এখন কেবলমাত্র পরিষদের ছাত্রীরা ও কর্মীরা সে সুযোগ পাচ্ছে। প্রবীণ অভিজ্ঞ ডাক্তার সারদাপ্রসাদ দাস, এম. বি. ও ডাক্তার রথীন্দ্রনাথ দে, এম. বি. বি. এস. এখানকার চিকিৎসক। এঁদের সাহায্য করেন গোপেন্দ্রনাথ মিত্র ও সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

পুনরায় এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে সর্বস্তরের মহিলাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন শ্যামমোহিনী। তদুদ্দেশ্যে মহিলাদের বেডযুক্ত একটি বড় হাসপাতালের জন্য দশ কাঠা জমিও কিনে রেখেছেন তিনি। এই বৎসরই (১৯৭৫) তার শুভ উদ্বোধন হবে একথা পূর্বেই বলেছি

এবং পরিষদ কর্তৃপক্ষ এর নাম দেবেন 'শ্যামমোহিনী মহিলা দাতব্য চিকিৎসালয়' বলে আমাকে জানালেন। এজন্যে গৃহনির্মাণ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও শ্যামমোহিনীর আরো নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অদম্য আগ্রহ রয়েছে। এখন তাঁর বয়স ৮৭ বৎসর। তবুও তাঁর মানসিক বল ৪০।৫০ বৎসর আগের মতই রয়েছে। তাঁর নিজের যেমন কর্মোৎসাহ আছে তেমনি অপরের মধ্যে কর্মোদ্যম জাগিয়ে তাদিগকে কর্মে মাতিয়ে রাখার অসামান্য ক্ষমতা আছে। তাঁর উৎসাহবাণী এবং আন্তরিক স্নেহপূর্ণ অনুরোধ শুনলে যে কোন লোকের পক্ষে তা পরিহার করা সম্ভব হয় না। তাঁর এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক বলা চলে। এদিক দিয়ে শ্যামমোহিনী সৌভাগ্যবতী। কারণ এ বৈশিষ্ট্য সকলের থাকে না। বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি নির্বিকারভাবে যেরূপে অনেকের কুমতলবকে নস্যাৎ করে আপন পরিকল্পনা ও অভিলাষকে তিনি বাস্তবে রূপদান করেন তাতে তাঁর সে আত্মিক শক্তির কাছে স্বাভাবিকভাবেই যে কেহ মাথা নত করতে বাধ্য হন। তাঁকে দেখলে মনেই হয় না তিনি এত শক্তির অধিকারিণী। তিনি সব সময় কোন না কোন ভাবঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন মনে হয় অথচ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন।

মৃদু ও স্বল্পভাষিণী শ্যামমোহিনীর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সর্বব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি অথচ বিরক্তির কারণ থাকা সত্ত্বেও কোনপ্রকার বিরক্তিবোধ না করা, বিরক্তি প্রকাশ না করা। ভালমন্দ সকল জিনিষকেই সমানভাবে গ্রহণ করা। তিনি প্রত্যেকের প্রত্যেক কথা শুনে তাঁর সিদ্ধান্ত স্থির করেন; সে সিদ্ধান্ত এমন হয়ে দাঁড়ায় যে তা সকলেরই মনঃপূত না হয়েই যায় না। এটা যেন অনেকটা যাদুমন্ত্র উচ্চারণের পরিণতির মত।

বৈদিক ভারত জগৎসভায় ঘোষণা করেছিল: 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলেই তোমার মিত্র। শ্যামমোহিনী

প্রত্যেককেই মিত্র মনে করেন। কেউ তাঁর শত্রু নেই। তাঁর এই জীবন-দর্শন তাঁর বিরাটত্বের প্রমাণ বহন করে। তিনি কর্মী থেকে ছাত্রী পর্য্যন্ত সকলকেই তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে গড়ে তুলেছেন।

বয়স হলেও শ্যামমোহিনী স্থাণু নন। তিনি চলমান। তাঁর দর্শন মানুষকে চলতে বাধ্য করে, শক্তি যোগায়। নিত্য-নতুন সৃজনশীল চিন্তাবিদ হিসাবে শ্যামমোহিনীর চিন্তারাজি সর্বদাই দেদীপ্যমান হয়ে আছে।

শ্যামমোহিনী দীর্ঘকাল ধরে দেশে শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভারতীয় কৃষ্টিসভ্যতার মহিমান্বিত রূপটি সগৌরবে তুলে ধরেছেন, ভারতীয় কৃষ্টি-সভ্যতার বিজয়কেতন উড্ডীন করে চলেছেন। প্রচারবিমুখ তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর প্রতিষ্ঠিত পরিষদকে যেমন গৌরবদান করেছে তেমনি জাতিকেও অশেষ গৌরবদান করে চলেছে। জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে নারীজাতিকে শিক্ষাদানের মহান ব্রত নিয়ে এমন অসামান্য আত্মদান অতুলনীয়।

পরিশিষ্ট (ক)

শ্যামমোহিনীর প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদ সম্পর্কে বিশিষ্ট ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত অভিমত :

লেডি প্রতিমা মিত্র ৩০।৮।৪০

—যে সমস্ত বালিকা নিজেদের জীবিকার্জনের জন্য কার্য্যকরী কোন কিছু শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক, 'বাণীপীঠ' তাহাদের পক্ষে উত্তম শিক্ষা কেন্দ্র।

গভর্ণর-পত্নী লেডি কেসি ১৭।৮।৪৫

—পরিষদ ১২ বৎসর যাবৎ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে উত্তম ও অতীব প্রয়োজনীয় কাজ করিতেছে।

মিষ্টার এ, করিম, ডিরেক্টর অব ইনডাষ্ট্রীজ ৩।৪।৪৬

—গভর্ণমেণ্ট এই বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানটিকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে উৎসাহিত ও সাহায্য করিলে ভাল হয়।

শ্রীজগলাল চৌধুরী, মন্ত্রী, বিহার ২২।৭।৪৭

—তাহাদের সঙ্গীত, তাহাদের নৃত্য এবং তাহাদের হাতে প্রস্তুত শিল্পকার্য আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে।

শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়, মন্ত্রী, পশ্চিমবাংলা ২০।১০।৪৮

—আর্থিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়টিতে সুশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছে এবং ছাত্রীদের বেতনের হারও পরিমিত।

শ্রীএম. কে. সেন, অ্যাডিঃ কালেক্টর, ২৪ পরগণা ২৮।৩।৫১

—আমি শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবীকে তাঁহার মহান কাজের জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি। এই প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যমত কোন সাহায্য করিবার সুযোগ লাভ করিলে আনন্দিত হইব।

ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু, রাজ্যপাল, পশ্চিমবাংলা ৩।৫।৫১

—পরিষদের বিভিন্নপ্রকার কার্য্য প্রশংসনীয় এবং প্রতিষ্ঠানটি সম্পাদিকার নিকট বহুলাংশে ঋণী।

লেডি অবলা বসু ২।৩।৫০

পরিষদের সম্পাদিকা শ্যামমোহিনী দেবীর স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আমি ইহার আরও উন্নতি কামনা করি।

পান্নালাল বসু, শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ ৩০।১।৫৪

—সাধারণ শিক্ষার সহিত বিবিধ অর্থকরী শিল্প ও সঙ্গীতাদি শিক্ষা দান করিয়া সম্পাদিকা বাস্তুহারা ও অন্যান্য মেয়েদের স্বাবলম্বিনী করিবার ব্যবস্থা করিয়া নারীজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, ভূমি, ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ ৩১।১।৫৪

শ্যামমোহিনী দেবীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীগণের শিক্ষা ও শিল্পে উন্নতি প্রশংসনীয়।

বি. কে. সেন, কমিশনার, কলিকাতা কর্পোরেশন ২।২।৫৪

নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদ মহিলা শিল্প প্রদর্শনীতে এখানকার ছাত্রীগণের স্বহস্তপ্রস্তুত সুন্দর সুন্দর সূক্ষ্ম সূচিশিল্প, কাঁথা, তাঁতে প্রস্তুত সাড়ী, বেড কভার ও খেস, চিত্রাঙ্কণ ও আলপনা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

জে. কে. রায়, এ. ডি. এম. ২৪ পরগণা ৩।২।৫৪

দেশে ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদের সম্পাদিকার প্রচেষ্টা সকলের অনুকরণীয়।

হরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, রাজ্যপাল; পশ্চিমবঙ্গ ৪।২।৫৪

শ্যামমোহিনী দেবীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রীগণের নানাবিষয়িনী শিক্ষা, শিল্প ও সঙ্গীত নৈপুণ্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

বিধানচন্দ্র রায়, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ ৫।৩।৫৫

পরিষদের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা শ্যামমোহিনী দেবীর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের মহান প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

ভ্রাম্যমান গভর্ণমেণ্ট অডিটর (১৯৫৩)

"আমি ভারতবর্ষের বহু প্রতিষ্ঠান এ-যাবৎ অডিট করেছি। কিন্তু আর কোন প্রতিষ্ঠানে একত্রে এতগুলি বিভাগও দেখিনি যেমন, তেমনি প্রতিটি বিভাগে এরূপ পৃথক পৃথক নির্ভুল হিসাবও দেখতে পাইনি।"

বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শিকা

আমাদের আণ্ডারে অনেক অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু এত প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে আপনার (শ্যামমোহিনীর) মত আর কোন মহিলা করেননি—আপনি বিভিন্ন বিষয়ে এত অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান করেছেন যা অন্য মহিলা এখনও করতে পারেননি। এবং এটা আমাদের গৌরব যে আমাদেরই একজন মহিলা এগুলি করেছেন।

যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

এত বিরাট প্রতিষ্ঠান হয়েছে, এখানে এত বিভাগ হয়েছে, আর এত বিপুল কাজ হয়েছে! বাপরে, আমরা তো এর বিশেষ কিছু জানি না। এর প্রচার হওয়া দরকার।

শক্তিকুমার সরকার, এম. পি.

শ্যামমোহিনী দেবীর জীবনী পর্যালোচনা আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালনের মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দী নানা কারণে বাঙালীর ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। আর সেই যুগের আর এক অসামান্য বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ এই শ্যামমোহিনী দেবী। আর সেই স্বর্ণযুগ রচনায় তাঁর ভূমিকাও অনন্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এক চলমান ইতিহাস—বাঙালী মায়ের মমতা, ব্রত, আদর্শ ও নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল ইস্পাতকঠিন কীর্তি।

মায়া বসু—শান্তিনিকেতনের ছাত্রী (ভূতপূর্ব)
বর্তমানে সরকারী চাকুরে (১৯৭৫)

লোকমাতা বলা চলে। যেমন সাহসী। তেমনি কাজ করার অসীম শক্তি ধরেন। যেমন দয়ালু তেমনি কঠোর, আজীবন কত মেয়ের জীবন আলোয় ভরে তুলেছেন। গরীব দুঃখী মেয়েদের জন্যে এমন সর্বস্ব বিলিয়ে আর কেউ আজ পর্যন্ত শ্যামমোহিনী দেবীর মত করেনি। এই মহীয়সীকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

পরিশিষ্ট (খ)

আলোচিতগ্রন্থপঞ্জী

১। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা : যোগেশচন্দ্র বাগল।

২। বেথুন স্কুল এবং কলেজ শত বার্ষিকী সংখ্যা : ডঃ কালিদাস নাগ ও লতিকা ঘোষ সম্পাদিত।

৩। নারী উন্নয়ন : যোগেশচন্দ্র বাগল।

৪। স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত।

৫। আঙ্কল টমস্ কেবিন : হ্যারিয়েট্ বীচার স্টোঈ।

৬। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে নারীপ্রগতি : ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭। ভারতের মহীয়সী নারী : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৮। সঞ্চিতা : কাজি নজরুল ইসলাম।

৯। সঞ্চয়িতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০। অভাগীর স্বর্গ : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১। ইন্দিরা দূরদর্শিনী : নিখিল সেন।

১২। দেশপ্রাণ শাসমল : প্রমথনাথ পাল।

১৩। ভারতের নারী ; স্বামী বিবেকানন্দ।

১৪। ভগিনী নিবেদিতা : শ্রীমতী গুপ্ত।

১৫। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের লেডী অবলা বসু জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা।

১৬। মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার : প্রমথনাথ পাল।

১৭। শত বর্ষের বাংলা : সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল।

১৮। চিত্তরঞ্জন : ঋষি দাস।

১৯। নিগ্রো জাতির কর্মবীর : অনুবাদক বিনয়কুমার সরকার।

২০। চিত্তরঞ্জনের জীবনবেদ : হেনা চৌধুরী।

২১। বার্ষিক রিপোর্ট : নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদ, নারী শিক্ষা সমিতি ও সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন বার্ষিক বিবরণীসমূহ, শিক্ষাবার্ষিকী রিপোর্ট।

পত্র পত্রিকা : যুগান্তর, অমৃত, দৈনিক বসুমতী প্রভৃতি।

পরিশিষ্ট (গ)

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আজীবন জনসেবা,
আর কোথা আছে কেবা
এমন জননী ?

সে মোদের জানা নেই,
এ তো পূজা ঈশ্বরেই—
তুমি পূজারিণী।

নারীর অপার শক্তি,
কর্তব্য সাধনে ভক্তি ;
তোমার শিক্ষায় সৃষ্ট
লক্ষ গরবিনী ;

শাশ্বত ভারতভূমি,
তারই যে প্রতীক তুমি—
পরম শ্রদ্ধায় নমি
হে শ্যামমোহিনী

দক্ষিণারঞ্জন বসু